সংগঠন
সিরিজ-১

[■ পরিচিতি (আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ)
■ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?
■ আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ■ সমাজ বিপ্লবের ধারা
■ সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী
■ দাওয়াত ও জিহাদ ■ নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা ■ উদাত্ত আহ্বান]

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সংগঠন সিরিজ-১
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর),
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা - ১৬৮
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

سلسلة الرسائل الجمعية (١)

جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
যুলহিজ্জাহ ১৪৪৫ হি./ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ জুলাই ২০২৪ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
১৩০ (একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

Shongothon series-1 by **Ahlehadeeth Andolon Bangladesh.** Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Mob. 01770-800900, 01835-423410. E-mail: tahreek@ymail.com. Web: www.hadeethfoundationbd.com.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৭
১. পরিচিতি (আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ)	০৯
২. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	
▪ আহলেহাদীছের পরিচয়	১৮
▪ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত	২২
▪ 'নাজী' ফের্কা কোন্‌টি	২৬
▪ আহলেহাদীছের বাহ্যিক নিদর্শন	৩১
▪ আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়	৩২
▪ তাক্বলীদে শাখ্‌ছী	৩৩
▪ আহলেহাদীছের ইস্তিদলালী পদ্ধতি	৩৬
▪ হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতির কারণ	৩৭
▪ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নীতি	৩৮
▪ মুজতাহিদগণের বিভক্তি	৩৯
▪ জামা'আতে আহলেহাদীছ যুগে যুগে	৪১
▪ ফের্কাবন্দী বনাম আহলেহাদীছ	৪৩
▪ আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ	৪৬
▪ সকল মুসলমান কি আহলেহাদীছ?	৪৮
▪ তাক্বলীদের পরিণতি	৪৯
▪ আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য সমূহ	৫২
▪ ঐক্যের আন্দোলন	৫৭
▪ নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন	৬০
▪ আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন?	৬২
▪ আহলেহাদীছ : অন্যদের দৃষ্টিতে	৬৪
▪ প্রশ্নোত্তর	৬৫
▪ এক নযরে আহলেহাদীছ	৭১
▪ প্রশ্নমালা	৭২
৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?	
▪ আমরা কি চাই? ; আদমের পৃথিবীতে অবতরণ	৭৪
▪ ইবলীসের বিতাড়ন	৭৫

- আল্লাহ্র দাসত্বের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় ৭৬
- 'আহ্দে আলাস্ত্ত ৭৭
- কেন চাই? ; দু'টি দর্শনের সংঘাত ৭৮
- চারটি বাধা; প্রথম বাধা- পরিবার ৭৯
- দ্বিতীয় বাধা- সমাজ ৮০
- তৃতীয় বাধা- প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মনেতাগণ ৮০
- চতুর্থ বাধা- রাষ্ট্র ৮৪
- কিভাবে চাই? ৮৫
- চার ধরনের প্রচেষ্টা ৮৭
- প্রশ্নমালা ৯০

৪. সমাজ বিপ্লবের ধারা

- পরিস্থিতির মূল্যায়ন ৯৪
- ইসলামের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব ৯৮
- ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত ৯৮
- খেলাফতে রাশেদার আদর্শ পুনরায় কেন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি? ৯৯
- সমাজ বিপ্লবের ধারা ৯৯
- ধারাগুলির ব্যাখ্যা ১০০
- মুক্তির একই পথ- দাওয়াত ও জিহাদ ১০২
- জিহাদের প্রকৃতি ১০৩
- জিহাদের হাতিয়ার ১০৬
- আন্দোলন অথবা ধ্বংস ১০৭
- জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় ১০৮
- তিনটি হুঁশিয়ারী ১০৮
- মুমিনের জন্য পার্থিব বিজয় লাভ অপরিহার্য নয় ১০৯
- প্রশ্নমালা ১১০

৫. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

- ভূমিকা ১১২
- সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী ১১৩
- জাহেলী আরব সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর মন্তব্য ১১৪
- নবীদের সহচরগণ ১১৫
- **তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম সমূহ** ১১৭

(১) দাওয়াত ও তার পদ্ধতি ১১৭

(২) জিহাদ ও তার পদ্ধতি ১১৮

ফলাফল ১২৪

- **তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি সমূহ**

(১) তাওহীদের আহ্বানের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করা ১২৬
(২) আল্লাহ্র জন্য বিশুদ্ধচিত্তে কাজ করা ১২৭
(৩) তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞান ও আখেরাত ভিত্তিক দূরদর্শিতা অর্জন ১২৮
(৪) সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ও মিথ্যার সাথে আপোষ না করা ১৩২
(৫) আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে মার্জিত ভাষায় দাওয়াত দেওয়া ১৩৬
(৬) মানুষের হেদায়াতের প্রতি আকাঙ্ক্ষী থাকা ১৩৬
(৭) হক প্রকাশে ইতস্তত না করা এবং হক বিরোধীদের এড়িয়ে চলা ১৪১
(৮) সহনশীল হওয়া এবং দ্রুত ফল লাভের আশা না করা ১৪২
(৯) ঐসব কাজ হ'তে বিরত থাকা, যার কারণে দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয় ১৪৪
(১০) নিজেকে ও নিজ সাথীদেরকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা এবং যাবতীয় কপটতা হ'তে বিরত থাকা ১৪৫
(১১) যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের প্রতি দরদী হওয়া ১৪৭
(১২) সর্বাবস্থায় খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় দৃঢ় থাকা ১৪৭
(১৩) কথায় ও কাজে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া ১৪৮
(১৪) হক-এর উপর দৃঢ় থাকা ও আচরণ নম্র হওয়া ১৪৯
(১৫) ছোট-বড় সকল বিষয়ে সংস্কারের চেষ্টা করা ১৫০

- **তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র বৈশিষ্ট্য সমূহ**

(১) আল্লাহওয়ালা হওয়া ১৫৩
(২) মধ্যপন্থী হওয়া ; (৩) সালাফী পথের অনুসারী হওয়া ১৫৩
(৪) শরী'আতের নির্দেশ পালনে অগ্রণী হওয়া ১৫৬

- **তারবিয়াহ্র প্রকারভেদ**

(১) জ্ঞানগত পরিচর্যা ১৫৯
(২) চেতনা সৃষ্টির পরিচর্যা ; (৩) কর্মগত পরিচর্যা ১৫৯
(৪) ঈমানী পরিচর্যা ১৬০

- **তারবিয়াহ্র বাধা সমূহ** ১৬০
- উপসংহার ১৬১
- প্রশ্নমালা ১৬২

৬. দাওয়াত ও জিহাদ

- দাওয়াত ও জিহাদ ১৬৪
- আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ১৬৮
- বিপর্যয়ের কারণ ১৭০

- হাদীছের কিতাব সমূহের আগমন ১৭১
- তিনটি যুগ ১৭৫
- অন্ধকারে আলো ১৭৭
- নিকট অতীতের কয়েকজন স্মরণীয় মুজাহিদ ১৭৯
- মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ ১৮৪
- দাওয়াতের তিনটি স্তর ১৮৬
- দাঈ-র জন্য অপরিহার্য একটি দায়িত্ব ১৮৭
- হক ও বাতিল পন্থীদের চারটি স্তর ১৮৯
- দাওয়াত না বিজয় সাধন? ১৮৯
- জিহাদ ১৯১
- উপসংহার ১৯৯
- পরিশিষ্ট ২০২
- প্রশ্নমালা ২০৪

৭. নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা

- নৈতিক ভিত্তি ২০৬
- দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন : তুলনামূলক আলোচনা ২১১
- পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ২১৪
- প্রস্তাবনা ২১৬
- প্রশ্নমালা ২১৮

৮. উদাত্ত আহ্বান

- প্রেক্ষিত পর্যালোচনা ২২০
- স্বাধীনতার ভিত্তি ২২২
- প্রতিবেশী দেশে মুসলমানদের অবস্থা ২২৩
- দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট ২২৪
- আন্দোলনের ধারা ২২৫
- আন্দোলনের লক্ষ্য ২২৮
- লক্ষ্যে উত্তরণের উপায় ২২৯
- কর্মীদের গুণাবলী ২৩০
- বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য ২৩১
- ফলাফল ; রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা ২৩২
- উদাত্ত আহ্বান ২৩৫
- প্রশ্নমালা ২৩৬

প্রকাশকের নিবেদন

বিশ্বে যতগুলি ইসলামী আন্দোলন রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নির্ভেজাল হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নামই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ।

যেকোন সংগঠনের প্রাণ হ'ল তার কর্মীরা। কর্মীরা যদি প্রকৃতপক্ষে আদর্শবান হয়, সৎ ও আমানতদার হয়, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়, সর্বোপরি বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চেতনার অধিকারী হয়, তবেই তাদের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের ময়দানে কাংখিত ভূমিকা রাখা সম্ভব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সংগঠনের কর্মীদের নিয়মিত তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে নির্দিষ্ট সিলেবাস অধ্যয়নকে বাধ্যতামূলক করেছে, যাতে তারা নিজেদেরকে ঈমানে ও জ্ঞানে বলিয়ান, প্রজ্ঞায় দক্ষ এবং আদর্শ চেতনায় উজ্জীবিত করতে পারে। যাদের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

সিলেবাসের উক্ত বইসমূহ যাতে সহজে একই স্থান পাওয়া যায় এবং ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করা যায়, সেজন্য বইগুলোকে একত্রিত করে 'সংগঠন সিরিজ-১' বইটি সংকলন করা হয়েছে। আশাকরি এতে মানোন্নায়ন প্রার্থী কর্মীদের নিয়মিত অধ্যয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ সহজসাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ এবং এর সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে স্ব স্ব ইখলাছ অনুযায়ী উত্তম জাযা দান করুন! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সংকলনটি প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْآ إِلَى اللهِ عَلٰى
بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ
وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই'।

-সূরা ইউসুফ ১২/১০৮

পরিচিতি

আহলেহাদীছ
আন্দোলন
বাংলাদেশ

৯ম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২ খৃ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আল্লাহ বলেন, قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْآ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ উচ্চারণ : ‘ক্বুল হা-যিহী সাবীলী আদ্‌‘ঊ ইলাল্লা-হি ‘আলা বাছীরাতিন্ আনা ওয়া মানিত্ তাবা‘আনী; ওয়া সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন’।

অর্থ : ‘তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ *(ইউসুফ-মাক্কী ১২/১০৮)*।

ফার্সী সম্বন্ধ পদে ‘আহলেহাদীছ’ এবং আরবী সম্বন্ধ পদে ‘আহলুল হাদীছ’-এর আভিধানিক অর্থ : হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থ : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

ছাহাবায়ে কেরাম হ’লেন জামা‘আতে আহলেহাদীছের প্রথম সম্মানিত দল, যাঁরা এ নামে অভিহিত হ’তেন *(খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ ১২ পৃ.)*। ‘বড়পীর’ বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ‘আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অন্য কোন নাম নেই ‘আহলেহাদীছ’ ব্যতীত’ *(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসরী ছাপা) ১/৯০ পৃ.)*।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, ‘হিজরী চতুর্থ শতকের আগ পর্যন্ত কোন মুসলিম নির্দিষ্টভাবে কোন একটি মাযহাবের অনুসারী ছিল না’ *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১/২৬০ পৃ.)*। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় নিন্দিত ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে ‘তাক্বলীদে শাখছী’ বা ইমামদের অন্ধ অনুকরণের বিদ‘আত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কে‘ঈন ২/১৪৫ পৃ.)*। ফলে অখণ্ড মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হ’তে শুরু করে। ইসলামের নামে চার মাযহাব মান্য করা ফরয (?) ঘোষণা করা হয়।

অতঃপর তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়। অতঃপর ৮০১ হিজরীতে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক কা'বাগৃহের চারপাশে চার মাযহাবের চার মুছাল্লা কায়েম হয় *('আহলেহাদীছ আন্দোলন' থিসিস ৮৯ পৃ.)*। যা ১৩৪৩ হিজরী পর্যন্ত ৫৪২ বছর যাবৎ স্থায়ী ছিল। যারা এই অনৈক্যের বিরোধী ছিলেন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, তারা 'আহলেহাদীছ' নামে কথিত হন। ভারত উপমহাদেশে বিরোধীরা তাদেরকে 'লা-মাযহাবী' 'গায়ের মুক্বাল্লিদ' 'ওয়াহ্হাবী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে দুর্নাম করে *(এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, লণ্ডন ১/২৫৯ পৃ.)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল, 'তাক্বলীদে শাখছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। তাক্বলীদপন্থী ইসলামী দলগুলি কেবল ঐ সকল হাদীছ মান্য করে, যেগুলি তাদের ইমাম কর্তৃক স্বীকৃত বা মাযহাব কর্তৃক গৃহীত। মাযহাবী ফৎওয়াবিরোধী কোন ছহীহ হাদীছ তারা মানতে প্রস্তুত থাকেন না।

পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ সকল প্রকার মাযহাবী সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করেন। তারা যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বদা আপোষহীন থাকেন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তাই প্রচলিত কোন মাযহাব বা মতবাদের নাম নয়; এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এ পথেই মওজুদ রয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এ পথেই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। এ আন্দোলন তাই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র আন্দোলন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষকে সর্বদা সে পথেই আহ্বান জানিয়ে থাকে।

সংগঠনের নাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

(জমঈয়াতু তাহ্রীকে আহ্লিল হাদীছ বাংলাদেশ)

AHLEHADEETH ANDOLON BANGLADESH

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খৃ., শুক্রবার।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

পাঁচটি মূলনীতি

১. কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা :

এর অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। তাকে নিঃশর্তভাবে ও বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া এবং সে আনুযায়ী আমল করা।

২. তাক্বলীদে শাখ্ছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন :

'তাক্বলীদ' অর্থ- শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারো কোন কথা চোখ বুঁজে মেনে নেওয়া। 'তাক্বলীদ' দু'প্রকারের- জাতীয় তাক্বলীদ ও বিজাতীয় তাক্বলীদ। জাতীয় তাক্বলীদ বলতে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। আর বিজাতীয় তাক্বলীদ বলতে বৈষয়িক ব্যাপারের নামে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুসরণ বুঝায়।

৩. ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ :

'ইজতিহাদ' অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এই অধিকার ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের হাদীছপন্থী যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমের জন্য খোলা রাখা।

৪. সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ :

এর অর্থ- ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা।

৫. মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ :

এর অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ ও নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা এবং মুসলিম উম্মাহ্র সার্বিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

চার দফা কর্মসূচী

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চার দফা কর্মসূচী হ'ল- তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও তাজদীদে মিল্লাত। অর্থাৎ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজ সংস্কার। এর মধ্যে সমাজ সংস্কারই হ'ল মুখ্য।

১ম দফা : তাবলীগ বা প্রচার

এ দফার করণীয় হ'ল, (ক) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে জনগণের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। (খ) প্রতিদিন বাদ এশা মুছল্লীদের সম্মুখে অর্থসহ একটি করে হাদীছ শুনানো। (গ) প্রতিদিন বাদ ফজর মুছল্লীদের সম্মুখে সংগঠনের তাফসীর বা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে পাঠ করা। (ঘ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও পারিবারিক তা'লীম। (ঙ) তাবলীগী সফর ও মাসিক ইজতেমা। (ছ) যেলা সম্মেলন ও বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা। এতদ্ব্যতীত জুম'আর খুৎবা, সুধী সমাবেশ, কর্মী সম্মেলন ও সংগঠনের প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা ইত্যাদি।

২য় দফা : তানযীম বা সংগঠন

(ক) কর্মীদের স্তর তিনটি : প্রাথমিক সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য।

(খ) সাংগঠনিক স্তর পাঁচটি : শাখা, এলাকা, উপযেলা, যেলা ও কেন্দ্র। যে সকল মানুষ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজে যথার্থরূপে ইসলামী বিধান কায়েমে প্রস্তুত হন, তাদেরকে 'ইমারত'-এর অধীনে সংঘবদ্ধ করা। কোন স্থানে কমপক্ষে ৩ জন 'প্রাথমিক সদস্য' থাকলে সেখানে একজনকে সভাপতি, একজনকে সাধারণ সম্পাদক ও

একজনকে সদস্য করে একটি শাখা গঠন করা যাবে। যেলা না থাকলে উক্ত শাখা কেন্দ্র কর্তৃক সরাসরি অনুমোদিত হ'তে হবে ('গঠনতন্ত্র' দ্রষ্টব্য)।

৩য় দফা : তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ

এ দফার করণীয় হ'ল, (ক) প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কুরআন, হাদীছ ও সাংগঠনিক বই-পত্রিকা অধ্যয়ন করা (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগদান করা (গ) প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করা (ঘ) নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল ছালাত আদায় করা এবং সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বা মাসে তিন দিন আইয়ামে বীয-এর নফল ছিয়াম পালন করা (ঙ) সুন্নাতী দাড়ি রাখা, ঢিলাঢালা তাক্বওয়ার লেবাস পরিধান করা ও বাড়ীতে ইসলামী পর্দা রক্ষা করা (চ) নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে কর্মীদের গড়ে তোলা এবং ধর্ম ও প্রগতির নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্য ও সচেতন কর্মী তৈরীর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪র্থ দফা : তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার

এ দফার করণীয় হ'ল, আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' ভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' নীতির আলোকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। সেই সাথে সংগঠনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

অতঃপর সমাজের আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে আমরা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে চাই।-

১. শিক্ষা সংস্কার :

উক্ত লক্ষ্যে আমাদের কর্মসূচী হ'ল,

(ক) দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। সেই সাথে সরকারী ও বেসরকারী তথা কিণ্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, ও-লেভেল, এ-লেভেল ইত্যাদি নামে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে বৈষম্যহীন ও সহজলভ্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

(খ) ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ করা এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

(ঘ) আক্বীদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্জন করা এবং তদস্থলে ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করা।

২. অর্থনৈতিক সংস্কার :

হালাল রূযী ইবাদত কবুলের অন্যতম পূর্বশর্ত। অথচ সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী ইত্যাদির পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে চালু রয়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে দেশী ও বিদেশী সূদখোর এনজিও সমূহের অপতৎপরতা। যার ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দারিদ্র্য স্থায়ী হচ্ছে। তাদের অনেকে সাধারণ জনগণের ঈমান ও নৈতিকতা হরণ করছে। যা আন্তর্জাতিক সূদীচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের সুদূরপ্রসারী নীল নকশারই অংশ।

এক্ষণে অর্থনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে আমাদের কর্মসূচী হ'ল,

(ক) সকল প্রকারের হারাম উপার্জন হ'তে বিরত থাকা।

(খ) সর্বদা হালাল রূযী গ্রহণে সচেষ্ট থাকা।

(গ) যাবতীয় অলসতা, বিলাসিতা ও অপচয় পরিহার করা এবং 'অল্পে তুষ্ট থাকার' ইসলামী নীতির অনুশীলন করা।

(ঘ) নির্দিষ্ট ইমারত-এর অধীনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা মোতাবেক 'বায়তুল মালে'র সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(ঙ) সমাজকল্যাণমূলক ইসলামী প্রকল্পসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

(চ) অনৈসলামী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা এবং সরকারের নিকট ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুর জোর দাবী পেশ করা।

৩. নেতৃত্বের সংস্কার :

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসৎ নেতৃত্ব আজ সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। শান্তি প্রিয় সৎ নেতৃত্ব সর্বত্র মুখ লুকাচ্ছে। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য পূর্বে বর্ণিত শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক কারণ সমূহ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে আমরা মৌলিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।-

(ক) সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিলের হিংসাত্মক প্রথা।

(খ) দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা।

(গ) দলীয় প্রশাসন, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র ও দীর্ঘসূত্রী বিচার ব্যবস্থা।

এক্ষণে নেতৃত্ব সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সর্বত্র দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতি অনুসরণ করা এবং 'ইমারত' ও 'শূরা' পদ্ধতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা।

(খ) আল্লাহ্কে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা।

(গ) স্বাধীন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করা।

আমাদের দাওয়াত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও বাস্ত বায়ন দেখতে চায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে পূর্ণ ইখলাছের সাথে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারে'র কর্মসূচী নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে চায়। অতএব কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাসী সকল মুমিন ভাই-বোনকে আমরা এই মধ্যপন্থী কাফেলায় শামিল হয়ে জান ও মালের কুরবানী পেশ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই!

আমাদের আহ্বান

সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর
আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

মুসলিম ঐক্য

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষকে মানুষের রচিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলি, মাযহাবী ফের্কাবন্দী ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগি ভুলে গিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশ মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য কামনা করে।

অতএব আসুন! উক্ত মহতী লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পতাকা তলে সমবেত হই এবং সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করি!

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম প্রকাশ : ১৯৭৯ খৃ.
৯ম প্রকাশ : জুলাই ২০২৩ খৃ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আহলেহাদীছের পরিচয়

(تعارف أهل الحديث)

ফারসী সম্বন্ধ পদে 'আহলেহাদীছ' এবং আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুল হাদীছ'-এর আভিধানিক অর্থ : হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থ : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন জামা'আতে আহলেহাদীছের প্রথম সম্মানিত দল, যাঁরা এ নামে অভিহিত হ'তেন। যেমন- (১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃ. ৭৪ হি.) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا-

'রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ

বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'।[১]

(২) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হি.) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। যেমন একদা তিনি বলেন,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ-

'এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে 'আহলুল হাদীছগণ' অর্থাৎ ছাহাবীগণ একমত হয়েছেন'।[২]

(৩) ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন সকলে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃ. ৩৮৪ হি.) তাঁর 'কিতাবুল ফিহ্রিস্ত' গ্রন্থে, ইমাম খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) স্বীয় 'তারীখু বাগদাদ' দ্বাদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে এবং ইমাম হেবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃ. ৪১৮ হি.) স্বীয় 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ ...' গ্রন্থে ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে শুরু করে তাঁর যুগ পর্যন্ত তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের নামের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত 'আহলেহাদীছ-এর মর্যাদা' শীর্ষক 'শারফু আছহাবিল হাদীছ' নামে ইমাম খত্বীব বাগদাদীর একটি পৃথক বইও রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.), ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। স্বীয় যুগে হাদীছ তেমন সংগৃহীত না হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অধিকহারে রায় ও ক্বিয়াসের আশ্রয়

---

১. বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান হা/১৭৪১; আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন), পৃ. ১২; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০। তবে বর্ণনাটির فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا 'কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'- অংশটুকুর দু'জন রাবী 'খুবই দুর্বল'। কিন্তু মর্ম ছহীহ। কারণ তখন ছাহাবী ও তাবেঈগণই ছিলেন পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলুল হাদীছ *(দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী ১৮/১০ সংখ্যা, জুলাই ২০১৫)*। যারা হাদীছটি বলবেন, তারা সনদ সম্পর্কে নিচের অংশটুকু সহ বলবেন।

২. শামসুদ্দীন যাহাবী দামেশক্বী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃ.।

নিয়েছিলেন বলে তাঁকে إِمَامُ أَهْلِ الرَّأْىِ বা 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কেতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'ইযা ছাহ্হাল হাদীছু ফাহুয়া মাযহাবী' অর্থাৎ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব'।[৩]

(৫) একবার তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ-কে বলেন, لاَ تَرْوِ عَنِّي شَيْئًا فَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَدْرِىْ مُخْطِئٌ أَنَا أَمْ مُصِيْبٌ؟ 'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না নিজ সিদ্ধান্তে আমি বেঠিক না সঠিক'।[৪]

(৬) আরেকবার তাঁর বক্তব্য লিখতে দেখে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন,

وَيْكَ يَا يَعْقُوْبُ! لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّى فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَ أَرَى الرَّأْىَ غَدًا وَ أَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শোন, তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি; কালকে যে রায় দেই, পরদিন তা প্রত্যাহার করি'।[৫]

চার ইমামের সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ তথা দ্বীনী বিষয়ে তাদের রায়-এর অন্ধ অনুসরণ বর্জন করে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৬] এ জন্য তাঁরা সবাই নিঃসন্দেহে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারী মুক্বাল্লিদগণ ইমামদের নির্দেশ উপেক্ষা করে পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে গেছেন এবং স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রায় ও তাঁদের রচিত ফিক্বহ ও ফৎওয়াসমূহের অন্ধ অনুসারী হয়েছেন। ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে তারা এক ইমামের নামে অসংখ্য আলেমের

৩. মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আবেদীন দামেশক্বী (১১৯৮-১২৫২ হি.), রাদ্দুল মুহতার (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭ পৃ.; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হি.) ১/৩০ পৃ.।
৪. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃ.।
৫. প্রাগুক্ত; থিসিস পৃ. ১৭৯, টীকা ৪৮।
৬. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী: ১২৮৬ হি.) ১/৬০।

রায়পন্থী 'আহলুর রায়' বনে গেছেন। এ জন্য অনুসারীগণ দায়ী হ'লেও ইমামগণ দায়ী নন। সেকারণ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন,فَالْإِمَامُ مَعْذُوْرٌ وَ أَتْبَاعُهُ غَيْرُ مَعْذُوْرِيْنَ 'ইমামের ওযর আছে, কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই'।[৭]

ইমামদের ওযর আছে এজন্য যে, তাঁরা যে অনেক হাদীছ জানতেন না, সেকথা খোলাখুলিভাবে বলে গেছেন ও পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পেলে তা অনুসরণের জন্য সবাইকে তাকীদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই এজন্য যে, তারা ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেননি ও তার উপরে আমল করেননি। বরং তাদের মধ্যে এই অন্ধ বিশ্বাস দানা বেঁধে আছে যে, তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা পীর সবকিছু জানেন। তাঁর ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এমনকি তাঁর ভুল হ'তে পারে, এমনটি চিন্তা করাও বে-আদবী। সেকারণ তাঁরা যেকোন মূল্যে ইমামের রায় বা মাযহাবী ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এমনকি এজন্য ছহীহ হাদীছকে বাদ দিতে হ'লেও কুছ পরওয়া নেই। তাদের সকল গবেষণা ও তাদের পরিচালিত মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

অথচ ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য সম্পর্কে স্বীয় 'কিতাবুল মানখূলে' বলেন যে, أَنَّهُمَا خالَفا أَبا حَنِيفَةَ فِى ثُلُثَى مَذهَبِهِ– 'আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ও মুহাম্মাদ (১৩১-১৮৯ হি.) আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবের দুই-তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছেন'।[৮] এতদ্ব্যতীত চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়াসমূহ ও বিশেষ করে হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ক্বিয়াসী ফৎওয়াসমূহের সবটুকু অথবা অধিকাংশ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নয় বলে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী সহ বহু বিদ্বান মন্তব্য করেছেন।[৯] শুধু ফিক্বহী বা ব্যবহারিক বিষয়েই নয় বরং উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইন সূত্রসমূহেও উক্ত শিষ্যদ্বয় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর

---

৭. মীযানুল কুবরা ১/৭৩ পৃ.।

৮. শরহ বেকায়াহ-এর মুক্বাদ্দামাহ (দিল্লী ছাপা ১৩২৭ হি.) পৃ. ২৮, শেষ লাইন; ঐ, দেউবন্দ ছাপা, তাবি, পৃ. ৮।

৯. শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রো: ১৩৫৫ হি.) ১/১৬০; ছালেহ ফুল্লানী, ঈক্বায়ু হিমাম পৃ. ৯৯; 'তালবীহ'-এর বরাতে মোল্লা মুঈন সিন্ধী, দিরাসাতুল লাবীব (লাহোর: ১২৮৪ হি.) পৃ. ১৮৩, ২৯০, ২৯১; আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, নাফে' কাবীর পৃ. ১৩ প্রভৃতি; দ্রঃ থিসিস পৃ. ১৮০, টীকা ৫৯, ৬০।

বিরোধিতা করেছেন।[১০] অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামদের যেসব মাযহাব বর্তমানে চালু আছে, তার অধিকাংশ পরবর্তী যুগে দলীয় আলেমদের সৃষ্টি।

নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুসরণের কারণে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হি.), ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হি.), ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হি.), ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.), ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৩ হি.), ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.), ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ (১৬৬-২৩৮ হি.), ইমাম আবুবকর ইবনু আবী শায়বাহ (মৃ. ২৩৫ হি.), ইমাম দারেমী (১৮১-২৫৫ হি.), ইমাম আবু যুর'আ রাযী (মৃ. ২৬৪ হি.), ইমাম ইবনু খুযায়মা (২২৩-৩১১ হি.), ইমাম দারাকুৎনী (৩০৫-৩৮৫ হি.), ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫ হি.), ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হি.), ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হি.) প্রমুখ হাদীছ শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ এবং তাঁদের শিষ্যবর্গ ও অনুসারীগণ সকলেই 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের জামা'আতের অনুসারীদেরকে 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলা হয়। এই জামা'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিশ্ববিখ্যাত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন,

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِى شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ-

১০. (فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُوْلَ صَاحِبِهِمَا) সুবকী, 'ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা' (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/২৪৩ পৃ.।

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন![১১]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহগণই কেবল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন না, বরং তাঁদের অনুসারী 'আম জনসাধারণও 'আহলুল হাদীছ' নামে সকল যুগে অভিহিত ছিলেন এবং আজও হয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُوْنَ– 'আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে) একটি দল রয়েছে, যারা সত্য পথে চলে ও সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে' *(আ'রাফ ৭/১৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ– 'আমার কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম' *(সাবা ৩৪/১৩)*।

এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে হকপন্থী একদল উম্মত চিরদিন ছিলেন, আজও আছেন; যদিও তারা সংখ্যায় কম হবেন। এমনকি কোন কোন নবীকে তার উম্মতের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন।[১২] কোন কোন নবী উম্মত ছাড়াই ক্বিয়ামতের দিন উঠবেন *(বুখারী হা/৫৭০৫)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* নিজের উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

১১. আলী ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত: মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩ পৃ.; কিতাবুল ফিছাল (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃ. 'ইসলামী ফের্কাসমূহ' অধ্যায়।

১২. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় 'নবীকুল শিরোমণি (ছাঃ)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

(লা তাযা-লু ত্ব-য়েফাতুম মিন উম্মাতী য-হিরীনা 'আলাল হাক্বক্বে, লা ইয়াযুররুহুম মান খাযালাহুম, হাত্তা ইয়া'তিয়া আমরুল্লা-হি ওয়াহুম কাযা-লিক')

অর্থ : 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[১৩] অর্থাৎ নিতান্ত অল্প সংখ্যক হ'লেও ক্বিয়ামত প্রাক্কাল অবধি হকপন্থী দলের অস্তিত্ব থাকবে এবং তাঁরাই হবেন সত্যিকারের বিজয়ী দল। উল্লেখ্য যে, হাদীছে বিজয়ী দল বা ত্ব-য়েফাহ মানছূরাহ বলতে আখেরাতে বিজয়ী দলকে বুঝানো হয়েছে, দুনিয়াবী বিজয় নয়। নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা *('আলাইহিমুস সালাম)* প্রমুখ নবীগণ কেউই দুনিয়াবী দিক দিয়ে বিজয়ী ছিলেন না। তথাপি তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী ও বিশ্ব মানবতার আদর্শ পুরুষ।

এক্ষণে 'হক' কোথায় পাওয়া যাবে? এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا– (হে নবী!) 'তুমি বলে দাও যে, 'হক' তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে আসে। অতঃপর যে চায় সেটা বিশ্বাস করুক, যে চায় সেটা অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি...' *(কাহ্ফ ১৮/২৯)*।

উক্ত আয়াতের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের চিন্তাপ্রসূত কোন ইযম, মাযহাব, মতবাদ বা তরীকা কখনই চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। এ সত্য পাওয়া যাবে কেবলমাত্র আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র মধ্যে, যা সংরক্ষিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহের মধ্যে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.) বলেন, فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ حُكْمٌ فِى حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَ قُبْحِهَا 'কোন বস্তুর চূড়ান্ত ভাল ও মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা 'জ্ঞান'-এর নেই'।[১৪] তাই সবকিছুর বিনিময়ে যারা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী থাকবেন, রাসূলুল্লাহ

১৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায় ৩৩, অনুচ্ছেদ ৫৩; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র. মুসলিম, দেউবন্দ ছাপা শরহ নববী ২/১৪৩ পৃ.; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১ 'ইল্ম' অধ্যায় ও হা/৭৩১১-এর ভাষ্য 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা।

১৪. শাহ অলিউল্লাহ, আল-'আক্বীদাতুল হাসানাহ (দিল্লী ছাপা: ১৩০৪ হি./১৮৮৪ খৃঃ) পৃ. ৫; থিসিস পৃ. ১১৩ টীকা ১১ (ক)।

(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেবল তারাই হবেন উম্মতের 'নাজী' ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যারা শুরুতেই জান্নাতী হবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* এরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِى مَا أَتَى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ... وَإِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً؛ قَالُوا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ فِىْ رِوَايَةٍ لِّلْحَاكِمِ فِىْ مُسْتَدْرَكِهِ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَ أَصْحَابِىْ، وَحَسَّنَهُمَا الْأَلْبَانِىُّ-

'বনু ইস্রাঈলদের (ইহূদী-নাছারাদের) যেমন অবস্থা হয়েছিল, আমার উম্মতেরও তেমন অবস্থা হবে, এক জোড়া জুতার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ন্যায়। ... বনু ইস্রাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সব দলই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, সে দল কোন্‌টি হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে যে দল থাকবে'। হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপরে আছি'।[১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَهِىَ الْجَمَاعَةُ 'সেটি হ'ল জামা'আত'।[১৬] উক্ত জামা'আত বলতে কী বুঝায়, এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'হক'-এর অনুসারী দলই হ'ল জামা'আত, যদিও তুমি একাকী হও'।[১৭] এক্ষণে সেই হকপন্থী জামা'আত বা 'নাজী' ফের্কা কোন্‌টি, সে বিষয়ে আমরা বিগত ওলামায়ে দ্বীন ও সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য শ্রবণ করব।-

---

১৫. হাকেম হা/৪৪৪, ১/১২৯ পৃ., সনদ হাসান; তিরমিযী হা/২৬৪১; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮; ইবনু কাছীর, আন-নিহাইয়াতু ফিল ফিতান ওয়াল মালাহেম (বৈরূত : ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.) ১/৩৫ পৃ.; আলবানী, মিশকাত হা/১৭১ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

১৬. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; মিশকাত হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায়।

১৭. ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, সনদ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা-৫ দ্রষ্টব্য।

‘নাজী’ ফের্কা কোন্‌টি?

১. ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْنَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ وَ يَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ، وَ لَوْلاَ هُمْ لَمْ نَجِدْ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْىِ شَيْئًا مِّنَ السُّنَنِ، فَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُوْرَةَ حُرَّاسَ الدِّيْنِ وَ صَرَفَ عَنْهُمْ كَيْدَ الْمُعَانِدِيْنَ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالشَّرْعِ الْمَتِيْنِ وَاقْتِفَائِهِمْ آثَارَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ... أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

‘উক্ত দল হ’ল ‘আহলুল হাদীছ জামা‘আত’। যারা রাসূলের বিধানসমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইল্‌ম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। যদি তারা না থাকত, তাহ’লে মু‘তাযিলা, রাফেযী (শী‘আ), জাহমিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না। বিশ্বপ্রভু এই বিজয়ী দলকে দ্বীনের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। আর মযবুত শরী‘আতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী এবং ছাহাবা ও তাবেঈনের সনিষ্ঠ অনুসারী হবার কারণে তাদেরকে হঠকারীদের চক্রান্তসমূহ হ’তে রক্ষা করেছেন। .. এরাই হ’লেন আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনীই হ’ল সফলকাম’।[১৮]

২. ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হি.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟ ‘তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা’। ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন’।[১৯] ক্বাযী ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেন, أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَمَنْ يَّعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ- ‘ইমাম আহমাদ (রহঃ) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীছ-এর

১৮. শারফ ৫; هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩।

১৯. ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা; শারফ ১৫ পৃ.।

মাযহাব অনুসরণ করে, তাদেরকে বুঝিয়েছেন'।[২০] ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরও বলেন, لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِىْ خَيْراً مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، لاَ يَعْرِفُوْنَ إِلاَّ الْحَدِيْثَ– 'আহলেহাদীছের চেয়ে উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই। তারা হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু চেনে না'।[২১]

৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا– 'যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-কে জীবন্ত দেখি' *(শারফ ২৬)*।

৪. প্রখ্যাত মুজতাহিদ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন, هُمْ عِنْدِىْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ... وَ قَالَ : أَنْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ– 'নাজী দল হ'ল আমার নিকটে আহলেহাদীছ জামা'আত'।... লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়' *(শারফ ১৫, ৩৩)*।

৫. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ একদা তাঁর দরবারের সম্মুখে কতিপয় আহলেহাদীছকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, مَا عَلَى الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْكُمْ 'ভূপৃষ্ঠে আপনাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই' *(শারফ ২৮)*।

৬. প্রখ্যাত ফক্বীহ আহমাদ ইবনু সুরাইজ (২৪৯-৩০৬ হি.) বলতেন, أَهْلُ الْحَدِيْثِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الْفُقَهَاءِ لِاعْتِنَائِهِمْ بِضَبْطِ الْأُصُوْلِ– 'দলীলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলেহাদীছগণের মর্যাদা ফক্বীহগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে'।[২২]

৭. ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হি.) বলেন, لَوْلاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِىْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ– 'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত' *(শারফ ২৯ পৃ.)*।

৮. ওছমান ইবনু আবী শায়বা (১৬০-২৩৯ হি.) একদা কয়েকজন আহলেহাদীছকে হয়রান অবস্থায় দেখে মন্তব্য করেন, إِنَّ فَاسِقَهُمْ خَيْرٌ مِنْ عَابِدِ

২০. ফাৎহুল বারী 'ইলম' অধ্যায় হা/৭১-এর আলোচনা ১/১৯৮ পৃ.।
২১. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ ২৭ পৃ.।
২২. আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী: ১২৮৬ হি.) ১/৬২ পৃ.।

غَيْرِهِمْ ‘আহলেহাদীছের একজন ফাসিক ব্যক্তি অন্য দলের একজন আবেদের চাইতে উত্তম’ *(শারফ ২৭ পৃ.)*।

৯. খলীফা হারূনুর রশীদ (১৪৯-১৯৩ হি.) বলেন,

طَلَبْتُ أَرْبَعَةً فَوَجَدْتُهَا فِيْ أَرْبَعَةٍ: طَلَبْتُ الْكُفْرَ فَوَجَدْتُّهُ فِى الْجَهْمِيَّةِ وَ طَلَبْتُ الْكَلاَمَ وَ الشَّغَبَ فَوَجَدْتُّهُ فِى الْمُعْتَزِلَةِ وَطَلَبْتُ الْكِذْبَ فَوَجَدْتُّهُ عِنْدَ الرَّافِضَةِ وَ طَلَبْتُ الْحَقَّ فَوَجَدْتُّهُ مَعَ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ –

‘আমি মুসলমানদের চারটি দলের মধ্যে চারটি বস্তু পেয়েছি : (ক) আমি কুফরী সন্ধান করেছি। অতঃপর তা পেয়েছি ‘জাহমিয়া’ (অদৃষ্টবাদী)-দের মধ্যে (খ) কূটতর্ক ও ঝগড়া পেয়েছি মু‘তাযিলাদের মধ্যে (গ) মিথ্যা খুঁজেছি ও সেটি পেয়েছি ‘রাফেযী’ (শী‘আ)-দের মধ্যে। আর (ঘ) আমি ‘হক’ খুঁজেছি এবং তা পেয়েছি ‘আহলেহাদীছ’দের মধ্যে’ *(শারফ ৩১ পৃ.)*।

১০. ‘বড় পীর’ বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জীলানী আল-বাগদাদী (৪৭০-৫৬১ হি.) ‘নাজী’ ফের্কা হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ‘আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلاَمَاتٌ يُعْرَفُوْنَ بِهَا، فَعَلاَمَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيْعَةُ فِيْ أَهْلِ الْأَثَرِ. وعلامةُ الزَّنادقةِ تسميتُهم أهلَ الأَثَرِ بالْحَشْوِيَة، ويُريدون إبطالَ الآثار. وعلامةُ القَدَريةِ تسميتُهم أهلَ الأثر مُجْبِرةً. وعلامةُ الْجَهْمِيةِ تسميتُهم أهلَ السنة مُشَبِّهَة. وعلامةُ الرافضةِ تسميتُهم أهلَ الأثر ناصِبَةً. وَ كُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَّغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَلاَ إِسْمَ لَهُم إِلاَّ إِسمٌ وَّاحِدٌ وَ هُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. ولا يُلْتصَقُ بهم ما لَقَّبهم به أهلُ البِدْع، كما لم يُلتصقْ بالنبي –صلى الله عليه وسلم– تَسميةُ كُفارِ مكةَ له ساحرًا وشاعرًا ومجنونًا ومفتونًا وكاهنًا–

‘জেনে রাখ যে, বিদ‘আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ‘আতীদের নিদর্শন হ’ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। যিন্দীক্বরা তাদেরকে ‘হাশভিয়াহ’ (বাজে লোকদের দল) বলে। এর দ্বারা তারা হাদীছকে বাতিল করতে চায়।

ক্বাদারিয়ারা তাদেরকে 'জাবরিয়া' (অদৃষ্টবাদী) বলে। জাহমিয়ারা (নির্গূণবাদীরা) তাদেরকে মুশাব্বিহাহ (স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যবাদী) বলে। রাফেযী (শী'আরা) তাদেরকে নাছেবাহ (আলী (রাঃ)-এর শত্রু দল) বলে। এগুলি আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। আর সেটি হ'ল 'আছহাবুল হাদীছ' (আহলুল হাদীছ)। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না'।[২৩]

১১. বিখ্যাত ফক্বীহ আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্বান বাগদাদী (মৃ. ৩৫৯ হি.) বলেন,

لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَ هُوَ يَبْغَضُ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نَزَعَتْ حَلاَوَةُ الْحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِهِ-

'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার হৃদয় থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়'।[২৪]

১২. ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দামেশক্বী (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন,

مِنَ الْمَعْلُوْمِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ بَحْثًا عَنْ أَقْوَالِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ طَلَبًا لِّعِلْمِهَا وَ أَرْغَبِ النَّاسِ فِى اِتِّبَاعِهَا وَ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوًى يُخَالِفُهَا ... فَهُمْ فِىْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ كَأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِىْ أَهْلِ الْمِلَلِ-

'যার কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার এটা জানা কথা যে, আহলেহাদীছগণ হ'লেন, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর

২৩. আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর: ১৩৪৬ হি.) ১/৯০ পৃ.; (বৈরূত : ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) ১/১৬৬ পৃ. ।

২৪. আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ (কুয়েত: দারুস সালাফিইয়াহ ১৪০৪ হি.), পৃ. ১০২।

বাণীসমূহের ও তাঁর ইল্‌মের অধিক সন্ধানী ও সে সবের অনুসরণের প্রতি অধিক আগ্রহশীল। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ হ'তে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী, যার বিরোধিতা সে করে থাকে।... মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের অবস্থান'।[২৫]

১৩. ছহীহ মুসলিম-এর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু শারফ নববী আশ-শামী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, 'এই ফের্কা মুমিনদের মধ্যকার মুজাহিদ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী আবেদ), নেকীর কাজের আদেশ দানকারী ও অন্যায় কাজের নিষেধকারী বিভিন্ন পর্যায়ের মুমিন হ'তে পারেন। যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে প্রতিষ্ঠা দান করে থাকেন। এদের সবাইকে একস্থানে মওজূদ থাকা আবশ্যিক নয়। বরং তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকতে পারেন'।[২৬]

১৪. হাফেয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর দামেশক্বী (৭০১-৭৭৪ হি.) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ 'যেদিন আমরা ডাকব প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ' *(ইসরা ১৭/৭১)* আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় জগদ্বিখ্যাত তাফসীরে একজন বিগত মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ 'আহলেহাদীছদের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হ'লেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*'।[২৭]

নিঃসন্দেহে এই উচ্চ মর্যাদা ক্বিয়ামতের দিন কেবল তাদের জন্যই হবে, যারা দুনিয়াবী জীবনে সকল দিক ও বিভাগে যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে কায়েম থেকেছেন এবং অন্য কোন মতবাদ বা রায়-ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দেননি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ছাহাবী ও তাবেঈগণের উপাধিধন্য সত্যিকারের 'আহলেহাদীছ' হওয়ার তাওফীক দান কর ও আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করে নাও- আমীন!!

---

২৫. আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ২/১৭৯ পৃ.।

২৬. মুসলিম শরহ নববী (দেউবন্দ ছাপা) ২/১৪৩ পৃ.; ফাৎহুল বারী ১/১৯৮ হা/৭১-এর ব্যাখ্যা, 'ইল্‌ম' অধ্যায়।

২৭. ইবনু কাছীর, তাফসীর (বৈরূত: ১৪০৮/১৯৮৮) সূরা বনু ইস্রাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩/৫৬ পৃ.।

আহলেহাদীছের বাহ্যিক নিদর্শন

আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী দামেশক্বী (৩৭২-৪৪৯ হি.) বলেন, (১) কম হউক বেশী হউক তারা সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার হ'তে বিরত থাকেন (২) ফরয ছালাতসমূহ আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য তারা সদা ব্যস্ত থাকেন (৩) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে তারা ওয়াজিব মনে করেন (৪) ছালাতের মধ্যে রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু'ঊদ ইত্যাদি আরকানকে ধীরে-সুস্থে আদায় করাকে তারা অপরিহার্য বলেন এবং এটা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না বলে মনে করেন (৫) তারা সকল কাজে নবী *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন (৬) বিদ'আতীদেরকে তারা ঘৃণা করেন। তারা বিদ'আতীদের সঙ্গে উঠাবসা করেন না বা তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ঝগড়া করেন না। তাদের থেকে সর্বদা কান বন্ধ রাখেন। যাতে তাদের বাতিল যুক্তিসমূহ অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করতে না পারে'।[২৮]

আমরা বলি, আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা হ'লেন আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। আর এখানে বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যেমন আহলেহাদীছ পিতা-মাতার সন্তান হওয়া শর্ত নয়। তেমনি রক্ত, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলেরও কোন শর্ত নেই। বরং যেকোন মুসলমান নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ও সেই অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হ'লেই কেবল তিনি 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত হবেন। নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ-এর প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-বিত্ত বা সামাজিক পদ মর্যাদার মধ্যে নয়।

আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়

'আহলুল হাদীছ' অর্থ হাদীছের অনুসারী। 'আহলুর রায়' অর্থ রায়-এর অনুসারী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার

২৮. আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ পৃ. ৯৯-১০০।

সমাধান তালাশ করেন, তাদেরকে 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে পূর্বসূরী কোন বিদ্বানের রচিত কোন ফিক্বহী উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার সমাধান নেন, শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর ভাষায় তাদেরকে 'আহলুর রায়' বলা হয়। আহলুর রায়গণ উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের 'আছারে'র মধ্যে তালাশ না করে পূর্ব যুগের কোন মুজতাহিদ ফক্বীহের গৃহীত কোন ফিক্বহী সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। অথবা কোন ফিক্বহী মূলনীতির সাথে সাদৃশ্য বিধানের চেষ্টা করেন। অতঃপর তার উপরে ক্বিয়াস বা উপমান পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের করে থাকেন।[২৯] এভাবে প্রায় সকল বিষয়ে তারা তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা ফক্বীহ-এর কল্পিত 'উছূলে ফিক্বহ' বা ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ছহীহ হাদীছের ঊর্ধ্বে ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে আহলুল হাদীছগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেন এবং যে কোন ব্যক্তির হাদীছ বিরোধী রায়কে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা রায়-এর ভিত্তিতে কুরআন-হাদীছ যাচাই করেন না। বরং কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে রায়কে যাচাই করেন। তাঁরা 'অহি'-কে 'রায়' বা লৌকিক জ্ঞান-এর উপরে স্থান দেন এবং 'রায়'-কে 'অহি'-র ব্যাখ্যাকারী বলে মনে করেন। কুরআন বা ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত নিজের বা নিজের অনুসরণীয় কোন ব্যক্তির রায় বা আইনসূত্রের পরিপন্থী হ'লে তাঁরা বিভিন্ন অজুহাতে হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন না; বরং হাদীছের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে গ্রহণ করেন। আহলেহাদীছগণ 'ইজতিহাদে' বিশ্বাসী এবং তা সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা ঐ ধরনের ইজতিহাদ বা রায় ও ক্বিয়াসে বিশ্বাসী, যা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবার উপরে ভিত্তিশীল।

এ কারণে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক, ইমাম বুখারী প্রমুখ উম্মতের সেরা ফক্বীহ ও মুজতাহিগণকে 'আহলুর রায়' না বলে বরং 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে হাদীছের সংগ্রহ কম থাকার কারণে নিজের রায় ও ক্বিয়াসের উপরে অধিক নির্ভরশীল হওয়ার ফলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। যেমন মরক্কোর জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী আব্দুর রহমান ইবনু খলদূন (৭৩২-৮০২ হি.) বলেন,

---

২৯. শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রো: ১৩২২ হি.)১/১২৯ পৃ.; বিস্তারিত জানার জন্য 'আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব: ঐ, ১১৮-১২২।

وَانْقَسَمَ الْفِقْهُ فِيْهِمْ إِلَى طَرِيْقَتَيْنِ، طَرِيْقَةُ أَهْلِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ وَ هُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَ طَرِيْقَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ وَ كَانَ الْحَدِيْثُ قَلِيْلاً فِىْ أَهْلِ الْعِرَاقِ... فَاسْتَكْثَرُوْا مِنَ الْقِيَاسِ وَ مَهَرُوْا فِيْهِ، فَلِذَالِكَ قِيْلَ أَهْلُ الرَّأْىِ وَمُقَدَّمُ جَمَاعَتِهِمُ الَّذِىْ اسْتَقَرَّ الْمَذْهَبُ فِيْهِ وَ فِىْ أَصْحَابِهِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ –

'*(আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যেও যুক্তিবাদের ঢেউ লাগে)* ফলে তাদের মধ্যে ফিক্বহ শাস্ত্র 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হ'ল, রায় ও ক্বিয়াসপন্থীদের তরীকা। তারা হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। দ্বিতীয়টি হ'ল, হাদীছপন্থীদের বা আহলুল হাদীছদের তরীকা। তারা হ'লেন হেজাযের (মক্কা-মদীনার) অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ খুবই কম ছিল।... ফলে তারা ক্বিয়াস বেশী করেন ও এতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর একারণেই তারা 'আহলুর রায়' বা রায়পন্থী নামে অভিহিত হয়েছেন। এই দলের নেতা ছিলেন আবু হানীফা, যাঁর নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে'।[৩০]

উল্লেখ্য যে, ইরাকেই সর্বপ্রথম হাদীছ জাল করা শুরু হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হি.) বলেন, 'আমাদের এখান থেকে এক বিঘত পরিমাণ একটি হাদীছ বের হয়ে ইরাক থেকে এক হাত পরিমাণ লম্বা হয়ে ফিরে আসে'। ইমাম মালেক ইরাককে 'হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা' (دَارُ الضَّرْبِ) নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ একটি ছহীহ হাদীছের মধ্যে অসংখ্য যোগ-বিয়োগ করে তাকে ভাঙ্গিয়ে প্রচার করা হয়।[৩১] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছিলেন, ইরাকের কুফা নগরীর অধিবাসী এবং তাঁর প্রধান শিষ্যগণ ছিলেন সেখানকার। এজন্য তাঁর অনুসারীদেরকে হানাফী, কূফী, আহলুর রায়, আহলুল কূফা, আহলুল ইরাক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

তাক্বলীদে শাখ্ছী (التقليد الشخصى) :

তাক্বলীদ (اَلتَّقْلِيْدُ) 'ক্বালাদাহ' (اَلقَلاَدَةُ) মাদ্দাহ হ'তে গৃহীত। যার অর্থ 'গলাবন্ধ'। তাক্বলীদ-এর আভিধানিক অর্থ : গলায় রশি বাঁধা। পারিভাষিক

৩০. আব্দুর রহমান ইবনু খালদূন, তারীখ (বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতুল আ'লামী, তাবি), মুক্বাদ্দামা ১/৪৪৬ পৃ.।

৩১. ড. মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ৭৯ পৃ.।

অর্থ : قُبولُ قَولِ الْغَيرِ مِن غَيرِ دَلِيلٍ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা বিনা দলীলে মেনে নেওয়া'। পক্ষান্তরে 'ইত্তেবা'র আভিধানিক অর্থ : পদাংক অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থ : قُبولُ قَولِ الْغَيرِ مَعَ دَلِيلٍ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া'। তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুরসণ এবং ইত্তেবা হ'ল দলীলের অনুসরণ। অতএব কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' নয়, বরং তা হ'ল 'ইত্তেবা'। অর্থাৎ দলীলের অনুসরণ। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগে তাক্বলীদের কোন নামগন্ধ ছিল না। অথচ তাঁদের দলীল ভিত্তিক কথার অনুসরণকে অনেকে 'তাক্বলীদ' বলে ভুল বুঝিয়ে থাকেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল 'তাক্বলীদে শাখ্ছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيرَ مُجْمَعِينَ عَلَى التَّقْلِيدِ الْخالِصِ لِمَذهَبٍ وَّاحِدٍ بِعَينِهِ– 'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। .. কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না।[৩২]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষদিকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এই সময় 'আহলুর রায়' (হানাফী) ফক্বীহদের নেতৃস্থানীয় অনেক আলেম, মু'তাযিলা, শী'আ ও কালাম শাস্ত্রবিদ (দার্শনিক) গণের স্তম্ভ বিশেষ বহু পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। যারা যুক্তিবাদের উপরে ভিত্তি করে চলতেন এবং নবীর হাদীছকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকায় সালাফে ছালেহীনের তরীকা এড়িয়ে চলতেন। এই সময় ফক্বীহদের মধ্যে তাক্বলীদ আত্মপ্রকাশ করে ও ইজতিহাদের অবক্ষয় শুরু হয়'।[৩৩]

---

৩২. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ পৃ. 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

৩৩. যাহাবী, তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরূত : তাবি) ২/২৬৭ পৃ.।

ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) বলেন, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফত এমন সব লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, যারা শারঈ বিধান সমূহে ছিলেন অনভিজ্ঞ। ফলে তারা সকল বিষয়ে ফক্বীহদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদে তলব করা হ'তে থাকে। তখন লোকেরা ইল্‌ম শিখতে লাগল সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের মাধ্যম হিসাবে। অথচ অন্য আলেমগণ পূর্বেকার স্বচ্ছ রীতির উপরে দৃঢ় থাকেন। তাদেরকে ডাকা হ'লে তারা পালিয়ে যেতেন। এসময় মুসলিম পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কালাম শাস্ত্রের উপরে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। সেখানে বহু কূটতর্কের অবতারণা করা হয়। এই সময় শাসকগণ হানাফী ও শাফেঈ ফিক্বহের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হ'লেন। ফলে আলেমগণ উক্ত দুই মাযহাবের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয়সমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন এবং বহু ঝগড়া ও অসংখ্য বই-পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। এভাবে স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্যসমূহ উদ্ধার করাকেই তারা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করেন। এই অবস্থা এখনও চলছে। আমরা জানিনা ভবিষ্যতের লিখন কী আছে? *(সংক্ষেপায়িত)*।[৩৪] অর্থাৎ তৎকালীন শাসনামলে 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' মন্দ রীতির অনুসরণে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্ব উসকে দিতেন। এখন সেই শাসক নেই, শাসনও নেই। কিন্তু মাযহাবের নামে দলাদলি রয়েছে। এমনকি চার মাযহাবকে ফরয বলা হচ্ছে।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, 'সালাফে ছালেহীন যে রায়-এর নিন্দা করেছেন এবং যেদিকে তাদের অনেক ফক্বীহকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য আমার নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছে। আর তা হ'ল '(হে পাঠক!) বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে তুমি মুসলমানদের দেখবে যে, তারা বিগত কোন একজন মুজতাহিদ বিদ্বানের মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, একটি মাসআলাতেও যদি ঐ বিদ্বানের তাক্বলীদ হ'তে সে বেরিয়ে আসে, তাহ'লে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে (كَأَنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ إِلَيْهِ) এবং যার অনুসরণ তার উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিল না।[৩৫]

---

৩৪. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫৩ পৃ.।

৩৫. শাহ অলিউল্লাহ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ (ইউ,পি, বিজনৌর, ভারত ১৩৫৫/১৯৩৬) ১/১৫১ পৃ.।

আহলেহাদীছের ইস্তিদলালী পদ্ধতি :

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ইসলামী বিধান প্রণয়নে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের অনুসৃত 'ইস্তিদলালী পদ্ধতি' বা দলীল গ্রহণের নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তাঁরা (১) কোন বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ পেলে সেটাই গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মুখ ফিরানোকে তাঁরা জায়েয মনে করেন না (২) কোন বিষয়ে কুরআনের কোন নির্দেশ অস্পষ্ট হ'লে সেক্ষেত্রে 'সুন্নাহ' ফায়ছালাকারী হবে। উক্ত হাদীছ সর্বত্র প্রচারিত থাকুক বা না থাকুক, তার উপরে ছাহাবীগণ বা ফক্বীহগণ আমল করুন বা না করুন। কোন বিষয়ে 'হাদীছ' পাওয়া গেলে তার বিপরীতে কোন ছাহাবীর 'আছার' কিংবা কোন মুজতাহিদের 'ইজতিহাদ' গ্রহণযোগ্য হবে না (৩) সার্বিক প্রচেষ্টার পরেও কোন বিষয়ে হাদীছ না পাওয়া গেলে আহলেহাদীছগণ ছাহাবী ও তাবেঈগণের যেকোন একটি জামা'আতের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোন একটি দল, শহর বা এলাকার অধিবাসীকে নির্দিষ্টভাবে অগ্রগণ্য মনে করেন না (৪) যদি কোন বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন ও ফক্বীহগণ একমত হন, তবে তাকেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন (৫) কিন্তু যদি সেখানে মতভেদ থাকে, তবে তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বিদ্বান, পরহেযগার ও স্মৃতিধর তাঁর কথা অথবা তাঁদের মধ্যকার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কথাটি গ্রহণ করেন (৬) যখন কোন বিষয়ে সমশ্রেণীভুক্ত দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায়, তখন সেক্ষেত্রে তাঁরা দু'টিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন (৭) কিন্তু যখন সেটিতেও ব্যর্থ হন, তখন তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের সাধারণ নির্দেশ ও ইঙ্গিতসমূহ এবং উদ্দেশ্যাবলী অনুধাবন করেন।

আত-তাফহীমাতুল ইলাহিইয়াহ কিতাবটি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর একটি সিদ্ধান্তকারী গ্রন্থ। এখানে তিনি ঐসব কথা বলেছেন, যেগুলি তাঁর নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাফহীম করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ বুঝ দান করা হয়েছে। তাঁর ধারণামতে যখন যে ভাষায় তাঁকে বুঝ দেওয়া হ'ত, তখন সেই ভাষায় তিনি সেটা লিখতেন। ফলে উক্ত কিতাবে আরবী ও ফার্সী পৃথক ভাষায় 'তাফহীম' শিরোনামে বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে। এটি দু'খণ্ডে কয়েকশ' পৃষ্ঠার এক দুর্লভ গ্রন্থ। যা লেখক স্টাডি ট্যুরে লাহোরে গিয়ে দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ নামক বিখ্যাত আহলেহাদীছ লাইব্রেরীতে পেয়েছিলেন ও সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অংশ ফটোকপি করে এনেছিলেন (তাং ২.১.১৯৮৯ খৃ.)। সেখান থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি হুবহু উৎকলিত হ'ল।-

وكشف لى عن حقيقة الرأى الذى نطق بذمها السلف ونسبوا إليه رجالا من فقهاءهم...

وترى العامة سيما اليوم فى كل قُطْر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين يرون خروج الإنسان من مذهب من قلّده ولو فى مسئلة كالخروج من الملة، كأنه نبى بعث اليه وافترضت طاعته عليه وكان اوائل الأمة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد- (تفهيمات ١/١٥١)-

উক্ত বিষয়ে তাঁরা প্রচলিত কোন উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের অনুসরণ করেন না। বরং যে কথাটি তাঁরা উত্তমরূপে বুঝতে পারেন ও যা তাঁদের হৃদয়কে শীতল করে, তারই অনুসরণ করেন'।[৩৬]

হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতির কারণ :

হানাফী মাযহাব সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। আব্বাসীয় খলীফা হারূনুর রশীদের আমলে (১৭০-১৯৩ হি.) ইমাম আবু হানীফার প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে প্রথম নিযুক্ত 'ক্বাযিউল কুযাত' বা প্রধান বিচারপতি হওয়ার সুবাদে ইরাক, ইরান ও মধ্য তুর্কিস্তান সহ খেলাফতের সর্বত্র হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, فَكَانَ سَبَبًا لِظُهُوْرِ مَذْهَبِهِ 'এটাই ছিল তাঁর মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ'।[৩৭] ভারতের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-৮৬) একথা সমর্থন করে বলেন,-هُوَ اَوَّلُ مَنْ نَشَرَ عِلْمَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ ثَبَتَ الْمَسَائِلَ 'তিনিই প্রথম আবু হানীফার ইল্ম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেন ও তাঁর মাসআলাসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন'।[৩৮]

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ও খলীফাদের আমলেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে আগত সেই ইসলাম ছিল হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলাম। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন 'আহলুল হাদীছ'। তখনকার মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত হ'ত হাদীছের আলোকে। তাই আজও কোন কিছু হারিয়ে গেলে ও খুঁজে না পেলে বাঙ্গালী মুসলমানরা বলে, জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না'। কিন্তু পরবর্তীকালে হানাফী মতাবলম্বী সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দের সামরিক বিজয় এবং তাঁর সাথে ও পরে আগত তুর্কী হানাফী আলেম ও মারেফতী ফকীরদের মাধ্যমে

---

৩৬. শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রো : দারুত তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫/১৯৩৬), ১/১৪৯ পৃ., 'আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য' অনুচ্ছেদ।

৩৭. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪৬ 'ফক্বীহদের মাযহাবী পার্থক্যের কারণ সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৩৮. মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা: তাবি) ৩৮ পৃ.।

প্রচারিত হানাফী ও ছূফী ইসলাম প্রধানতঃ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে প্রসার লাভ করে। যার অধিকাংশ আমল ছিল শিরক ও বিদ'আতে ভরা। যদিও সোনারগাঁওয়ের মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি./১৩০০খৃ.) ও তাঁর শিষ্যদের প্রচেষ্টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন চালু থাকে।

উল্লেখ্য যে, বোখারা (রাশিয়া) থেকে আগত এই স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ-এর মাধ্যমেই উপমহাদেশের বুকে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বুখারী ও মুসলিমের দরস চালু হয়। তিনি সোনারগাঁওয়ে দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ ছহীহায়েন-এর দরস দিয়েছিলেন। বলা চলে যে, প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সর্বাধিক প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে তুর্কী, মোগল, শী'আ, পাঠান, আফগান প্রভৃতি দলের হাত বদল হয়ে যে ইসলাম এদেশে স্থিতি লাভ করে, তা হয়ে পড়ে শিরক, বিদ'আত ও বিভিন্ন কুসংস্কারে ভরা জগাখিচুড়ী ইসলাম। বলা বাহুল্য, আজও সে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ দ্রুত হক-এর দিকে ফিরে আসছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নীতি :

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর রায়-এর তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করতে তীব্রভাবে নিষেধ করে গিয়েছেন এবং 'যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখন সেটাই আমার মাযহাব' বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন *(দ্রঃ টীকা ৩)*। সেকারণ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী হানাফী (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন,

إِنَّهُ لَوْ عَاشَ حَتَّى دُوِّنَتْ أَحَادِيْثُ الشَّرِيْعَةِ .... لَأَخَذَ بِهَا وَ تَرَكَ كُلَّ قِيَاسٍ كَانَ قَاسَهُ وَ كَانَ الْقِيَاسُ قَلَّ فِيْ مَذْهَبِهِ كَمَا قَلَّ فِيْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ..

'যদি (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগে ইমাম আবু হানীফা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তিনি সেগুলি গ্রহণ করতেন ও যত ক্বিয়াসী ফৎওয়া দিয়েছেন সবই বাদ দিতেন এবং তাঁর মাযহাবেও ক্বিয়াস কম হ'ত, যেমন অন্যদের মাযহাবে হয়েছে। .... যে কথা বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা ক্বিয়াসকে দলীলের উপরে স্থান দিতেন, এটা তাঁর মুক্বাল্লিদগণের কথা মাত্র। যারা ইমামের ক্বিয়াসের উপরে আমল করাকে অপরিহার্য গণ্য করেছেন এবং হাদীছকে পরিত্যাগ করেছেন, যা ইমামের মৃত্যুর পরে ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম দায়ী নন, বরং দায়ী তার অন্ধ অনুসারীবৃন্দ'।[৩৯]

৩৯. আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী ছাপা : ১২৮৬ হি.) ১/৭৩ পৃ.।

ফলকথা আহলুল হাদীছগণের বিপরীতে আহলুর রায়গণের ক্বিয়াস স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রচিত ব্যবহারিক আইনসূত্রসমূহ বা উছূলে ফিক্বহের উপরে ভিত্তিশীল, হাদীছের উপরে নয়।

মুজতাহিদগণের বিভক্তি :

হিজরী ষষ্ঠ শতকের খ্যাতনামা বিদ্বান আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হি.) বলেন,

ثُمَّ الْمُجْتَهِدُوْنَ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ مَحْصُوْرُوْنَ فِيْ صِنْفَيْنِ لاَ يَعْدُوَانِ إِلَى ثَالِثٍ : أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ أَصْحَابُ الرَّأْىِ، أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ ... وَ إِنَّمَا سُمُّوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ عِنَايَتَهُمْ بِتَحْصِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَ نَقْلِ الْأَخْبَارِ وَ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى النُّصُوْصِ وَ لاَيَرْجِعُوْنَ إِلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَ الْخَفِيِّ مَا وَجَدُوْا خَبَرًا أَوْ أَثَرًا ... وَ أَصْحَابُ الرَّأْىِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ هُمْ أَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ الثَّابِتِ ... وَ إِنَّمَا سُمُّوا أَصْحَابَ الرَّأْىِ لِأَنَّ أَكْثَرَ عِنَايَتِهِمْ بِتَحْصِيْلِ وَجْهِ الْقِيَاسِ وَالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَ بِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَيْهَا وَ رُبَّمَا يُقَدِّمُوْنَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ عَلَى آحَادِ الْأَخْبَارِ–

‘উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দু’ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোন ভাগে নয়। আছহাবুল হাদীছ ও আছহাবুর রায় (আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়)। আহলুল হাদীছগণ হেজায (মক্কা-মদীনা)-এর অধিবাসী। ...তাদেরকে ‘আহলুল হাদীছ’ এ জন্য বলা হয় যে, তাদের সার্বিক লক্ষ্য নিয়োজিত থাকে হাদীছ সংগ্রহের প্রতি এবং তাঁরা সমস্ত আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন (কুরআন-হাদীছের) দলীল সমূহের উপর। হাদীছ বা আছার পেলে তাঁরা কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ক্বিয়াসের দিকে ফিরে তাকান না...। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণ হ’লেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁরা আবু হানীফা নু‘মান বিন ছাবিত-এর অনুসারী। ...তাদেরকে ‘আহলুর রায়’ এজন্য বলা হয় যে, তাদের অধিকতর লক্ষ্য থাকে ক্বিয়াসের কারণ অনুসন্ধানের প্রতি ও কুরআন-হাদীছের আহকাম হ’তে সৃষ্ট মর্মার্থের প্রতি। তার উপরেই তাঁরা উদ্ভূত ঘটনাসমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন। কখনো কখনো তাঁরা ‘খবরে ওয়াহেদ’ পর্যায়ের হাদীছের উপরে প্রকাশ্য ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন’।[৪০]

৪০. আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, তাবি) ১/২০৬-২০৭ পৃ.।

আহলুল হাদীছের নীতির সপক্ষে মত প্রকাশ করতে গিয়ে হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হায্‌ম আন্দালুসী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন-এর প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বা ইজমা এই যে, তাঁদের কোন একজন ব্যক্তির সকল কথার প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না। অতএব ঐ ব্যক্তি জেনে রাখুক, যে ব্যক্তি আবু হানীফার সকল কথা গ্রহণ করেছে, কিংবা মালেক-শাফেঈ বা আহমাদের সকল কথাকে গ্রহণ করেছে। তাঁদের কোন কথা ছাড়েনি বা অন্যের কথার প্রতি দৃকপাত করেনি, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি, ঐ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করেছে। এ নীতির অনুসারী কোন লোক ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের তিনটি প্রশংসিত যুগে ছিল না। ঐ ব্যক্তি মুমিনদের গৃহীত পথের বাইরে গিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ অবস্থা হ'তে পানাহ দিন'।[৪১]

এক্ষণে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে আমরা আল্লাহ-প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান নেব? না মানুষের রচিত ফিক্বহের ভিত্তিতে সমাধান নেব। আমরা বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযীকে অগ্রাধিকার দেব? নাকি পরবর্তীতে সৃষ্ট একটি নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহ গ্রন্থ কুদূরী, শরহে বেকায়া, হেদায়াহ, আলমগীরীকে অগ্রাধিকার দেব? আমরা কি হাদীছপন্থী হব, নাকি রায়পন্থী হব?

জানা আবশ্যক যে, নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে, অহি-র অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু যুগে যুগে 'রায়'-এর পরিবর্তন ঘটেছে, আজও ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। বর্তমানে মুসলিম তরুণ সমাজ ক্রমেই বিজাতীয় রায়ের অনুসারী হয়ে পড়ছে। ফলে নানা মুণীর নানা মতে মুসলিম সমাজ আজ শতধা বিভক্ত। বিশৃঙ্খল এই বিরাট উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ ও কল্যাণমুখী করার একটাই মাত্র পথ রয়েছে। আর সেটা হ'ল, সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসা। পবিত্র কুরাআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালার সম্মুখে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। যুগ যুগ ধরে আহলেহাদীছ আন্দোলন এই কল্যাণ লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়ে এসেছে, আজও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে ইনশাআল্লাহ।

---

৪১. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হি.) ১/১৫৪-৫৫ পৃ.।

জামা'আতে আহলেহাদীছ যুগে যুগে

ছাহাবী ও তাবেঈগণ প্রথম যুগের আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁদের হাতে বিজিত ও তাঁদের মাধ্যমে প্রচারিত তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মুসলিমগণ সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ৩৭ হিজরী থেকে বিদ'আতীদের উদ্ভব হতে থাকলে তাদের বিপরীতে আহলুল হাদীছগণ স্বতন্ত্র নামে ও বৈশিষ্ট্যে পরিচিত হ'তে থাকেন। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় তাক্বলীদ ভিত্তিক বিভিন্ন মাযহাব বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তৎকালীন পৃথিবীর মুসলিম অঞ্চলসমূহে আহলুল হাদীছের পাশাপাশি বিভিন্ন মাযহাবী দলেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ফিলিস্তীনের প্রখ্যাত মুসলিম ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-বিশারী আল-মাক্বদেসী (৩৩৬-৩৮০ হি.) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর মুসলিম এলাকাসমূহ পরিভ্রমণে বের হন। তৎকালীন বিশ্বের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকাসমূহের কিছু কিছু তথ্য তিনি স্বীয় 'আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম' নামক ভ্রমণ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন, 'হেজায তথা মক্কা-মদীনা এলাকায় আহলে সুন্নাত *(পৃ. ৯৬)* এবং আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদের অধিকাংশ ফক্বীহ ও বিচারপতি হানাফী ছিলেন *(পৃ. ১২৭)*। উমাইয়াদের রাজধানী দামেশ্ক্ব ও সিরিয়ার লোকদের সমস্ত আমল আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরেই (وَالْعَمَلُ كَانَ فِيْهِ عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ) আছে। এখানে মু'তাযিলাদের কোন স্থান নেই। মালেকী বা দাঊদীও নেই' *(পৃ. ১৭৯-৮০)*।

অতঃপর মাক্বদেসী ৩৭৫ হিজরীতে তৎকালীন ভারতের ইসলামী রাজধানী সিন্ধুর মানছূরায় আগমন করেন। মানছূরাহ (করাচী) সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সেখানকার অধিকাংশ (মুসলিম) অধিবাসী আহলেহাদীছ' (أَكْثَرُهُمْ أَصْحَابُ حَدِيْثٍ)। ক্বাযী আবু মুহাম্মাদ মানছূরী নামে সেখানে দাঊদী মাযহাবের একজন ইমাম আছেন। তাঁর লিখিত অনেক মূল্যবান কেতাব রয়েছে। মুলতানের অধিবাসীরা শী'আ মতাবলম্বী। প্রত্যেক শহরেই কিছু কিছু হানাফী ফক্বীহ রয়েছেন। এখানে মালেকী বা মু'তাযেলী কেউ নেই, হাম্বলীও নেই'।[৪২]

৪২. শামসুদ্দীন আল-মাক্বদেসী, আহসানুত তাক্বাসীম ২য় সংস্করণ (লণ্ডন: ই, জে, ব্রীল ১৯০৬); ঐ (কায়রো: ১৪১১/১৯৯১) পৃ. ৪৮১; গ্রন্থটি ৩৭৫ হিজরীতে লিখিত হয়।

মাক্বদেসীর অর্ধশত বছর পরে ঐতিহাসিক আবু মানছূর আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী (৩৭০-৪২৯ হি.) তৎকালীন পৃথিবীতে আহলেহাদীছদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন,

ثُغُوْرُ الرُّوْمِ وَالْجَزِيْرَةِ وَ ثُغُوْرُ الشَّامِ وَ ثُغُوْرُ آذَرْبَيْجَانَ وَبَابِ الْأَبْوَابِ كُلُّهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ كَذَالِكَ ثُغُوْرُ أَفْرِيْقِيَّةَ وَ أَنْدَلُسَ وَ كُلُّ ثِغَرٍ وَرَاءِ بَحْرِ الْمَغْرِبِ أَهْلُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَ كَذَالِكَ ثُغُوْرُ الْيَمَنِ عَلَى سَاحِلِ الزَّنْجِ ، وَأَمَّا ثُغُوْرُ أَهْلِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ فِيْ وُجُوْهِ التُّرْكِ وَ الصِّيْنِ فَهُمْ فَرِيْقَانِ: إِمَّا شَافِعِيَّةٌ وَإِمَّا مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ-

‘রূম সীমান্ত, আলজিরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্তান) প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসী আহলে সুন্নাতের ‘আহলেহাদীছ’ মাযহাবের উপরে ছিলেন। এমনিভাবে আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদ্বর্তী দেশসমূহের সকল মুসলমান ‘আহলেহাদীছ’ ছিলেন। একইভাবে আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামনের সকল অধিবাসী ‘আহলেহাদীছ’ ছিলেন। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্তান সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দু’টি দল ছিল : একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী’।[৪৩]

শামসুদ্দীন মাক্বদেসী ও আব্দুল ক্বাহির বাগদাদীর উপরোক্ত বর্ণনা হ’তে প্রমাণিত হয় যে, বাগদাদী খেলাফতের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে ‘আহলুর রায়’ ও মু‘তাযিলাদের চরম রাজনৈতিক ও মাযহাবী নির্যাতন সত্ত্বেও পঞ্চম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত খোদ মক্কা-মদীনা ও সিরিয়া সহ ইউরোপ, আফ্রিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরে এবং সুদূর সিন্ধু পর্যন্ত আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যাধিক্য বজায় ছিল, যা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার বৈ কি!

৩৭৫ হিজরীর কিছু পরে মানছূরার শাসন ক্ষমতা ইসমাঈলী শী‘আদের হাতে চলে যায়। অন্যদিকে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দ থেকে দিল্লীতে ও বাংলাদেশে শুরু হয় ‘আহলুর রায়’ হানাফী শাসন। তখন থেকেই কখনও গযনভী, কখনও আফগানী, কখনও তুর্কীদের দ্বারা উপমহাদেশ শাসিত হয় এবং মূল আরবীয় শাসনের অবসান ঘটে। ফলে একদিকে রাজনৈতিক

৪৩. আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী, কিতাবুল উছূলিদ্দীন (ইস্তাম্বুল: দাওলাহ প্রেস ১৩৪৬/১৯২৮) ১/৩১৭ পৃ.।

অনুদারতা, অন্যদিকে তাক্বলীদপন্থী আলেমদের সংকীর্ণতা, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও আহলেহাদীছ আলেমদের স্বল্পতার কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে।

অতঃপর দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.)-এর শাণিত যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুসরণের জায্বা সৃষ্টি হয় এবং তাঁর পরে তদীয় পুত্রগণ ও মুজাহিদ পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হি.)-এর সূচিত 'জিহাদ আন্দোলন'-এর মাধ্যমে সারা ভারতে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, যা আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে বসবাসরত প্রায় ছয় কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই বিপ্লবেরই ফসল।[৪৪] যাদের রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় বালাকোট, বাঁশের কেল্লা, মুল্কা, সিত্তানা, আম্বালা, চামারকান্দ, আসমাস্ত ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতিসমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতন, গাযী ও শহীদী রক্তের অমলিন ছাপসমূহ আজও ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। যুলুম ও নির্যাতনের আগুনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী 'জামা'আতে আহলেহাদীছ' তাই চিরকালীন জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না, ঈমানদার হ'লে তোমরাই বিজয়ী' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

ফের্কাবন্দী বনাম আহলেহাদীছ

আল্লাহ্র হুকুম ছিল, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا *'ওয়া'তাছিমূ বিহাবলিল্লা-হি জামী'আঁও অলা তাফাররাক্বূ'*। অর্থ: 'তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। (সাবধান)! দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। কিন্তু রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পর হ'তেই মুসলমানরা আপোষে দলাদলি ও ফির্কাবন্দীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়।

৪৪. বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ। -প্রকাশক ।

মুসলমানদের মধ্যে এই দল বিভক্তির কারণ ছিল মূলতঃ চারটি।-

১. ইহূদী-খৃষ্টানদের প্ররোচনা। ২. রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব। ৩. বিভিন্ন বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ। ৪. শরী'আতের ব্যাখ্যাগত মতভেদ।

প্রথমোক্ত কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে, তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের (২৩-৩৫ হি.) শেষ দিকে ইয়ামনের জনৈকা নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহূদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়। পরে তারই প্ররোচনায় মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'সাবাঈ' ও 'ওছমানী' দু'টি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর (২) বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতেই মহান খলীফা ওছমান (রাঃ) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী'আ দলের উদ্ভব ঘটে এবং চরমপন্থী খারেজীদের হাতে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন।

(৩) উপরোক্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে আক্বীদা ও উছূলী বিতর্ক শুরু হয়। ফলে ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের উদ্ভব ঘটে। শী'আরা আলী ও মিক্বদাদ (রাঃ) সহ কয়েকজন ব্যতীত বাকীসব ছাহাবীকে কাফের বলে। ক্বাদারিয়াগণ তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। জাবরিয়াগণ তার বিপরীতে অদৃষ্টবাদী হয়ে যায়। খারেজীগণ কবীরা গোনাহগারকে কাফের ও তার রক্ত হালাল গণ্য করে। তার বিপরীতে মুরজিয়াগণ কবীরা গোনাহগারকে পূর্ণ মুমিন বলে। মু'তাযিলা যুক্তিবাদীগণ কবীরা গোনাহগারকে না মুমিন, না কাফের বলে এক বিভ্রান্তিকর আক্বীদার জন্ম দেয়। তারা আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করে।

সেইসাথে নওমুসলিমদের মাধ্যমে ও আরবীতে অনূদিত অনারব গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। যার ফলে মুসলিম সমাজে নানাবিধ শিরক ও বিদ'আত দেখা দেয়। অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতি কুফরী মতবাদ মা'রেফাতের নামে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে বিভিন্ন বিজাতীয় দর্শন চিন্তা মুসলমানদের মাঝে আক্বীদাগত ফের্কা সৃষ্টিতে বারি সিঞ্চন করে।

(৪) এতদ্ব্যতীত শরী'আতের ব্যাখ্যাগত মতভেদের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় নানা মাযহাব ও তরীকা। শী'আ-সুন্নী বিভেদ ছাড়াও সুন্নীরা হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী চারটি ফের্কায় বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর এক মাযহাবের

লোকদের জন্য অন্য মাযহাবের ফৎওয়া মানা নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে ইসলামের মধ্যে ফের্কাবন্দীর ইতিহাস একটি দুঃখজনক অভিশাপ হিসাবে দিন দিন প্রলম্বিত হ'তে থাকে।

ইসলামের মধ্যকার বিভিন্ন মাযহাব অপর মাযহাবে গৃহীত অনেক ছহীহ সিদ্ধান্ত , যার পক্ষে কিতাব ও সুন্নাতের ছহীহ দলীল রয়েছে, তাকে শুধুমাত্র নিজেদের তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে। অতঃপর নিজেদের এই অনুদারতা ঢাকবার জন্য অপর মাযহাবের গৃহীত ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার করেছে অথবা 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) বলে দাবী করেছে। কিংবা তার দূরতম ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছে অথবা 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে এড়িয়ে গেছে। এঁরা জাঁকজমকের সাথে 'খতমে বুখারী'-র অনুষ্ঠান করেন, অথচ বুখারীর হাদীছ মানেন না। ছহীহ বুখারীর অনুবাদক হ'তে গর্ববোধ করেন, অথচ অনুবাদে কারচুপি করেন। আবার অযৌক্তিক টীকা-টিপ্পনীর ছুরি চালিয়ে স্বীয় মাযহাব বিরোধী ছহীহ হাদীছগুলিকে কচুকাটা করেন। তাদের লিখিত তাফসীর, হাদীছ ও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের প্রায় সর্বত্র এই অপতৎপরতা বিদ্যমান। তাদের মাদ্রাসাগুলিতে সব শ্রেণীতে নিজেদের ফিক্বহ পড়িয়ে ছাত্রদের মগয তৈরী করে নিয়ে শেষের দাওরা শ্রেণীতে বরকতের নামে কুতুবে সিত্তাহ্র বাছাইকৃত অংশসমূহ পড়ানো হয়। অথচ হাদীছের উপর আমল করা হয় না। বলা বাহুল্য এইসব তাক্বলীদী গোঁড়ামীর ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকদের দ্বারাই ইসলামী ঐক্য ইসলামের নামেই ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে এবং তা এখন সামাজিকভাবে স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।

বিভিন্ন ফের্কা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সকল মাযহাব ও তরীকার অনুসারীরা তাদের গৃহীত ফৎওয়াসমূহ কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত এবং যে সকল হাদীছ ও আছার তাদের মাযহাবের অনুকূলে হ'ত, সেগুলি তারা সানন্দে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যেগুলি তার বিরোধী হ'ত, তারা সেগুলির দূরতম ব্যাখ্যায় লিপ্ত হ'তেন কিংবা 'মানসূখ' বলে পরিত্যাগ করতেন। শী'আরা তো রাজনৈতিক কারণে হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনায় তিন লাখ জাল হাদীছ বানিয়ে নিয়েছেন।[৪৫] প্রচলিত কুরআন মাজীদ, যা 'মুছহাফে উছমানী' নামে পরিচিত, তার বিপরীতে তাদের আবিষ্কৃত এর তিনগুণ বড় 'মুছহাফে ফাতেমা' নামক তথাকথিত কুরআন গ্রন্থে প্রচলিত কুরআন মাজীদের একটি

৪৫. ড. মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৮১।

হরফও নেই বলে তারা দাবী করেন।[৪৬] এমনিভাবে উমাইয়া, আব্বাসীয়, শী'আ, খারেজী, হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের লোকেরা নিজ নিজ দলের ও মাযহাবের পক্ষে ও অপর মাযহাবের বিপক্ষে কত যে জাল ও মিথ্যা হাদীছ রটনা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।[৪৭]

এ থেকে বাঁচার একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। আর তা হ'ল মুসলমানকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেবল এভাবেই তাদের হারানো ঐক্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ

'হাদীছ' অর্থ বাণী এবং 'সুন্নাহ' অর্থ রীতি। পারিভাষিক অর্থে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর কথা, কর্ম ও সম্মতিকে 'হাদীছ' বলা হয়। হাদীছ ও সুন্নাহ্র মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয়ের বিষয়বস্তু এক এবং সবকিছুই হাদীছের মাধ্যমে লিখিত রূপ লাভ করেছে। হাদীছ ও ফিক্বহে 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল হাদীছ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী যুগে 'আহলুর রায়'-এর বিপরীতে 'আহলুল হাদীছ' নামটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

৩৭ হিজরী থেকে ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে ভেজাল মিশ্রিত হ'তে শুরু করেছিল। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের পবিত্র উদ্যোগ এসবের প্রসার রোধ করেছিল। তাঁরা এসব ফিৎনা হ'তে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং বিদ'আতপন্থীদের বিপরীতে নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন। অতঃপর তাঁদের অনুসারী হকপন্থী মুসলমানরাও নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন। যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন,

---

৪৬. ইহসান ইলাহী যাহীর, আশ-শী'আহ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোর : ইদারাহ তারজুমানুস সুন্নাহ, তাবি) পৃ. ৮০-৮১।

৪৭. ড. মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৭৮-৭৯; ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই : তাবি, তাহকীক : দাঊদ রায) দুর্রে মুখতার-এর বরাতে, পৃ. ১৮৩-৮৫; থিসিস পৃ. ১৮০-৮২ টীকা ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ-

'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না।[৪৮] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এজন্য বলেন,

وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ مَعْرُوْفٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ أَبَا حَنِيْفَةَ وَ مَالِكًا وَ الشَّافِعِيَّ وَ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ-

'আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাচীন একটি মাযহাব সুপরিচিত ছিল। সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যারা তাঁদের নবীর কাছ থেকে সরাসরি ইল্‌ম হাছিল করেছিলেন'।[৪৯] ছহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে যে 'আহলুল হাদীছ' বলা হ'ত, সেকথা আমরা ইতিপূর্বে ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী, ইমাম শা'বী, ইবনু হাযম আন্দালুসী প্রমুখের বক্তব্যে অবহিত হয়েছি *(দ্রঃ টীকা ১, ২, ১১)*।

আহলেহাদীছগণ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে ও বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থসমূহে 'আহলুল হাদীছ', 'আছহাবুল হাদীছ', 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত', 'আহলুল আছার', 'আহলুল হক' 'মুহাদ্দেছীন' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছেন। সালাফে ছালেহীনের অনুসারী হিসাবে তাঁরা 'সালাফী' নামেও পরিচিত।[৫০] আহলেহাদীছগণ মিসর, সূদান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে 'আনছারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়াহ', সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে 'সালাফী', ইন্দোনেশিয়াতে 'আল-জামা'আতুল মুহাম্মাদিয়াহ' এবং পাক-ভারত উপমহাদেশে 'মুহাম্মাদী' ও 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত। যদিও বিরোধীরা তাঁদেরকে লা-মাযহাবী, রাফাদানী, ওয়াহ্‌হাবী, গায়ের মুক্বাল্লিদ ইত্যাদি বাজে নামে অভিহিত করে থাকেন।

---

৪৮. মুক্বাদ্দামা মুসলিম, (বৈরূত: দরুল ফিক্‌র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃ. ১৫।

৪৯. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, 'মিনহাজুস সুন্নাহ' (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তাবি, ১৩২২ হি. মিসরী ছাপা হ'তে ফটোকপিকৃত) ১/২৫৬ পৃ. ।

৫০. ছাহাবা, তাবেঈন ও হাদীছপন্থী বিগত বিদ্বানগণকে 'সালাফে ছালেহীন' বলা হয়। -লেখক

সকল মুসলমান কি আহলেহাদীছ?

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার কিংবা সম্পূর্ণ অমান্য করে কেউ মুসলমান হ'তে পারে না। তাই এক হিসাবে দুনিয়ার সকল মুসলমানই আহলেহাদীছ। কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মুসলমানদের মধ্যে এযাবৎ যতগুলো দল, মাযহাব ও তরীকার সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও হচ্ছে, তার সবগুলোই কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সেজন্য প্রত্যেক মাযহাবের পৃথক পৃথক 'ফিক্বহ' গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা স্ব স্ব ফিক্বহের কিতাবসমূহ হ'তে ফৎওয়া সংগ্রহ করে থাকেন এবং সেগুলোকেই কার্যত অভ্রান্ত শরী'আত ভেবে মান্য করে থাকেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন নির্দেশ আছে কি-না, তা খুঁজে দেখার অবকাশ তাদের থাকে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মনে এ অন্ধ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে যে, স্বীয় তরীকা বা মাযহাবী ফিক্বহের বিপরীত পবিত্র কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কোন কথাই থাকতে পারে না।

সেটাও মন্দের ভাল ছিল যদি না অবস্থা আরও নিম্ন পর্যায়ে নেমে যেত। বর্তমানে কোন কোন আলেম ও পীর যেকোন কারণেই হোক মাঝে-মধ্যে এমনামন অভিনব ফৎওয়া জারি করে থাকেন, যার সাথে কুরআন-হাদীছ তো দূরের কথা, নিজ মাযহাবী ফিক্বহের কিতাবেরও কোন সম্পর্ক নেই। যেমন আমাদের সমাজে প্রচলিত পীরপূজা, কবরপূজা, মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী, চেহলাম, হায়াতুন্নবী, আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, যত কল্লা তত আল্লাহ ইত্যাদি কুফরী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমলসমূহের পিছনে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কিংবা তাঁর মাযহাবের শ্রেষ্ঠ কিতাবসমূহে কোনরূপ সমর্থন নেই। অথচ সরলবুদ্ধি জনসাধারণ অন্ধ বিশ্বাসে তাদের আলেমদের তাবেদারী করতে গিয়ে এগুলিকেই প্রকৃত ইসলামী অনুষ্ঠান বলে ধারণা করে এবং এর বিরোধিতাকে ইসলামের বিরোধিতা বলে মনে করে। এভাবে তারা বিভিন্ন সময় নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের শিকার হয়ে পড়ে। যার পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ ঐ ব্যক্তির সম্মুখে যদি কোন নিরপেক্ষ হকপন্থী আলেম রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর কোন ছহীহ হাদীছ পেশ করে তার ভুল ধরিয়ে দিতে চান, তাহ'লে বেচারা ভীষণ ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং শেষ

অস্ত্র হিসাবে নিজের বাপ-দাদা হ'তে শুরু করে বিগত যুগের ইমাম ও পীর-আউলিয়াদের নাম নিয়ে যুক্তি দেখিয়ে বলে 'তাঁরা কি বুঝতেন না?' যদিও ঐ সকল বিগত ব্যক্তিদের তাক্বওয়া-পরহেযগারী ও কুরআন-হাদীছের পাবন্দী সম্পর্কে তার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অথচ ঐ ব্যক্তি একবারও ভাবে না যে, দ্বীন সম্পূর্ণরূপে 'অহিয়ে এলাহীর' উপরে নির্ভরশীল। এখানে কোন ব্যক্তির নিজস্ব রায় বা খেয়াল-খুশীর কোন স্থান নেই।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত অজুহাতই ছিল সকল যুগের রেওয়াজপন্থীদের মোক্ষম যুক্তি- যা যুগে যুগে সকল নবীকেই শুনানো হয়েছে। এই অন্ধ কুসংস্কারের বিরোধিতা করার কারণেই সমাজের বুকে জেঁকে বসা কায়েমী স্বার্থবাদীরা নবীদেরকে অকথ্য নির্যাতন করেছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত নিক্ষেপ করেছে, সর্বস্বান্ত অবস্থায় দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। আজও তারা শেষনবী (ছাঃ)-এর সনিষ্ঠ অনুসারীদের উপরে একইভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

তাক্বলীদের পরিণতি :

অন্ধ তাক্বলীদ ও রসম পূজার শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করলেও গা শিউরে ওঠে। একদিকে থাকেন ভ্রান্তির আশংকাযুক্ত অনুসরণীয় ইমাম অথবা পীর-মাশায়েখ। অন্যদিকে থাকেন দোজাহানের অভ্রান্ত ইমাম, ইমামুল মুত্তাক্বীন ও ইমামুল মুরসালীন শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*। একদিকে থাকে ধর্মের নামে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ, অন্যদিকে থাকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পবিত্র হেদায়াতসমূহ। আল্লাহ না করুন এটিই যদি কারো প্রকৃত অবস্থা হয়ে থাকে, তবে কোন্ আকাশ তাকে ছায়া দিবে, কোন্ যমীন তাকে আশ্রয় দিবে, কোন্ নবীর শাফা'আত সে কামনা করবে?

তাক্বলীদের মায়াবন্ধনে পড়ে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কে কত বড় ইমাম বা কে কত বড় দলের অনুসারী, সেটাই এখন প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাযহাবী তাক্বলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ও আমন্ত্রণে ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে তাতার নেতা হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। পরবর্তীতে মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭ খৃ.) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক ক্বাযী নিয়োগ করা হয়, যা ৬৬৪ হিজরী থেকে ইসলাম জগতের

সর্বত্র চালু হয়ে যায়... এবং চার মাযহাব বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তার অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়'। বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হি.) ৮০১ হিজরী সনে মুক্বাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসিলম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। এভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে-সঊদ (১৮৭৬-১৯৫৩ খৃ.)-এর শুভ উদ্যোগে উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত হয়। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের বিধান অনুযায়ী একই ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে *(থিসিস পৃ. ৮৯)*। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

জাতীয় তথা ধর্মীয় তাক্বলীদের দুনিয়াবী পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার নামে আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়েছি। বিজাতীয় তাক্বলীদের ফলে আমরা প্রগতির নামে ইহূদী-খৃষ্টান ও অমুসলিমদের চালু করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি কুফরী মতবাদের অন্ধ অনুসারী হয়েছি। ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পূজা করতে গিয়ে একক 'ইসলামী খেলাফত' ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৫৭টি দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছি। বহু দলীয় গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে একটি দেশকে ভিতর থেকে অনৈক্যে ও বিশৃঙ্খলায় স্থায়ীভাবে ঘুণে ধরা ও দুর্বল করে রাখার অনৈসলামী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেছি। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার বিষবাষ্পে বঙ্গভবন থেকে বস্তিঘর পর্যন্ত হিংসা ও অশান্তির আগুনে জ্বলছি। এভাবে একদিকে আমাদের জাতীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ 'ইসলামী খেলাফত' তথা মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এখন ইহূদী-খৃষ্টান ও ইসলাম বিরোধী অক্ষশক্তির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে।

এককালের উমাইয়া খেলাফতের (৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খৃ.=৯০বৎসর) রাজধানী দামেশ্ক, আব্বাসীয় খেলাফতের (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খৃ.=৫০৯বৎসর) রাজধানী বাগদাদ, স্পেনীয় উমাইয়া খেলাফতের (৯২-৮৯৭ হি./৭১১-১৪৯২ খৃ.=৭৮১বৎসর) রাজধানী গ্রানাডা, তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র ও 'বিশ্বের বিস্ময়' কর্ডোভা-সেভিল আজ ইতিহাসের

বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের (৩৫১-১২৭৩ হি./৯৬২-১৮৫৭ খৃ.= ৮৯৫ বৎসর) কেন্দ্রস্থল গযনী (কাবুল) ও দিল্লী আজ ইতিহাসের হারানো অধ্যায়। সর্বশেষ উছমানীয় খেলাফতের (৬৮০-১৩৪২ হি./১২৮১-১৯২৪ খৃ.= ৬৬২ বৎসর) রাজধানী ইস্তাম্বুল বা কনষ্ট্যান্টিনোপল ও তুরস্ক আজ 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' বলে ইহূদী-খৃষ্টান জগতের হাসি-ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৬৪-৫৮৯ হি./১১৬৯-১১৯৩ খৃ.)-এর শাসিত মিসর এখন কথিত ইহূদী রাষ্ট্র (?) ইস্রাঈলের বন্ধু।

শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলমান আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। কিন্তু কেন? কে এজন্য দায়ী? ইসলাম না মুসলমান? ঔষধ না রোগী? নিশ্চয়ই দোষ ঔষধের নয়। কেননা এ ঔষধ বহু পরীক্ষিত। তাছাড়া ইসলামের যথার্থতার প্রশংসায় তো অমুসলিমরাই বেশী সোচ্চার। অতএব সে দোষ নিশ্চয়ই রোগীর, যারা এর ব্যবহার জানে না। আমরা যারা ঔষধ তাকে রেখে কেবল ঔষধ ঔষধ তাসবীহ জপেছি, কিন্তু সেবন করে দেখিনি। অথবা সঠিক ব্যবহারবিধি শিখিনি। কিংবা অল্প শিখে বাকীটা অনুমান করে নিয়েছি কিংবা অন্য কিছু মিশিয়ে মনের মত করে 'মিকশ্চার' বানিয়েছি, সেই আমরাই এজন্য দায়ী।

মুসলমানদের বর্তমান এই করুণ পরিণতি হেদায়াতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহান শিক্ষা হ'তে দূরে থাকারই ফল। আর একারণেই শাশ্বত জীবন বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যুগোপযোগী সমাধান পেতে ব্যর্থ হয়ে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা আজ ক্রমেই বিভিন্ন বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার বিভিন্ন চেহারা দেখে তারা মূল ইসলামকেই সন্দেহ করছে। দরগাহ, খানক্বাহ ও হালক্বায়ে যিকরের জৌলুস দেখে অথবা বিলাসী রাজনীতির জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চে ও মিছিলে ইসলামের তেজিয়ান শ্লোগান শুনে তারা ইসলামকে ভুল বুঝছে। তাকে পুঁজিবাদের সমার্থক অথবা শোষণের হাতিয়ার ভাবছে। অথচ মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*, হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর রেখে যাওয়া ইসলাম কি এই? নিশ্চয়ই নয়। তা পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে বিজাতীয় মতবাদসমূহ এবং অবশ্যই ফিরে যেতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মূল শিক্ষার মর্মকেন্দ্রে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আন্ত রিকভাবে আমরা তা পেতে চাই কি?

আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য সমূহ

এবারে 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে চিন্তা করুন। এটি প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তি ভিত্তিক মাযহাব, মতবাদ বা ইজম-এর নাম নয়। বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সমস্ত হেদায়াত এপথেই মওজুদ রয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এপথেই মানুষকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আহলেহাদীছ তাই চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি দাওয়াত, একটি 'আন্দোলন' এর নাম। এ আন্দোলন ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন দুনিয়ার সকল মানুষকে বিশেষ করে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী ছেড়ে এবং সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে চিরশান্তির গ্যারান্টি আল্লাহ্র কিতাব ও শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর সুন্নাতের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত হবার আহ্বান জানায়। কিতাব ও সুন্নাতের অভ্রান্ত পথনির্দেশকে কেন্দ্র করেই এ আন্দোলন গতি লাভ করেছে।

উম্মতের কোন ফক্বীহ, মুজতাহিদ, অলি-আউলিয়া, ইমাম বা ইসলামী চিন্তাবিদের দেওয়া কোন নিজস্ব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন গড়ে উঠেনি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত এ আন্দোলনের কর্মীদের অন্য কোন 'গাইড বুক' নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ব্যতীত তাদের অন্য কোন অভ্রান্ত ইমাম নেই। ইসলাম ব্যতীত তাদের অন্য কোন 'মাযহাব' বা চলার পথ নেই। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ফিক্বহ গ্রন্থ নেই। প্রচলিত চার মাযহাবের ইমামদেরকে তারা যথাযোগ্য সম্মান করে থাকেন। কোনরূপ অন্ধভক্তি বা অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী না হয়ে বরং বিভিন্ন মাযহাবের যে সকল সিদ্ধান্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হয় বা সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, তারা বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু ভুল ও শুদ্ধ সবকিছু মিলিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ বা তাক্বলীদ করাকে তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে মনে করেন।

তাদের মাঝে পুরোহিত তন্ত্রের কোন অবকাশ নেই। নেই পীরের 'ফয়েয' লাভের বা তাদের 'অসীলায়' মুক্তি -পাবার অহেতুক কোন মাথাব্যথা। তাদের রোগমুক্তি অথবা মামলায় ডিগ্রী পাবার জন্য কোন 'পীর বাবা' কিংবা 'সাধু

বাবা'-র চরণ ধূলি নিতে হয় না। কোন আউলিয়ার কবরে মানত করতে হয় না। কারো 'মুরীদ' হওয়ার সনদও নিতে হয় না।

খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী আহলেহাদীছগণ দুঃখে ও বিপদে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরই নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁরই নিকটে কাঁদেন, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বা করেন। 'তাক্বদীরের' ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য 'তদবীর' করে চলেন। পরকালীন মুক্তির জন্য তারা শিরক ও বিদ'আতমুক্ত এবং শরী'আত অনুমোদিত নেক আমলকেই একমাত্র 'অসীলা' মনে করেন, যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই খালেছ হয়ে থাকে। যে সকল কথায় ও কর্মে শিরক ও বিদ'আতের সামান্যতম ছিটে–ফোঁটা রয়েছে, তা হ'তে তারা দূরে থাকেন। কোন মানুষকে 'ইলমে গায়েব' বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে তারা বিশ্বাস করেন না। নবী ব্যতীত অন্য কাউকে তারা মা'ছূম বা নিষ্পাপ বলে মনে করেন না।

শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-কে তারা নূরের সৃষ্টি বা 'নূরনবী' নয় বরং মাটির সৃষ্টি 'মানুষ নবী' বলে মনে করেন। তারা কোন মৃত ব্যক্তিকে নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোনরূপ মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারী বলে বিশ্বাস করেন না। এমনকি কোন জীবিত ব্যক্তিও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত অপরের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। কবরে সিজদা করা, সেখানে মানত করা, ফুল দেওয়া, বাতি দেওয়া, গেলাফ চড়ানো, গোসল করানো, নযর-নেয়ায পাঠানো, মোরগ বা খাসি যবেহ করে 'হাজত' দেওয়া, কবরবাসীর অসীলায় মুক্তি কামনা করা, তার নিকটে ফরিয়াদ পেশ করা ইত্যাদিকে তারা প্রকাশ্য শিরক মনে করেন। এমনিভাবে একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লাখো মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর রূহ মুবারক হাযির হওয়ার অলীক ধারণা ও তাঁর সম্মানে সকলে দাঁড়িয়ে (ক্বিয়াম করে) সালাম জানানোকে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার গুণ কল্পনার মতই ঘৃণ্যতম পাপ বলে মনে করেন। তাঁর নামে 'জশনে জুলূস' ও র‍্যালী করাকে স্রেফ 'রিয়া' ও ভক্তির নামে ভান করা বলে মনে করেন। যা নিকৃষ্টতম বিদ'আত সমুহের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে কোন মৃত মানুষের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, নিজেদের বানানো স্মৃতিসৌধে বা শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, বিভিন্ন মানুষের তৈলচিত্র, ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণ ও সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ইত্যাদি সবকিছু জাহেলী যুগের ফেলে আসা অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজার জঘন্যতম শিরকী রীতি-নীতির আধুনিক রূপ বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস করেন যে, শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ইসলামের কোন হুকুম গোপন করে যাননি। বরং বিশ্ব ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে এবং ইসলামী চরিত্রের নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ রূপকার হিসাবে দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুঅতী জীবনে স্বীয় কথায়, কর্মে ও আচরণে ইসলামী শরী'আতের ভিতর-বাহির ও খুঁটি-নাটি সব কিছুই তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য স্পষ্ট করে গিয়েছেন এবং 'অহিয়ে এলাহীর' সবটুকু উম্মতের নিকট পূর্ণ সততার সাথে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর জীবন সায়াহ্নে বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত লক্ষাধিক ছাহাবীর নিকট হ'তে সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র নিকট হ'তে সরাসরি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার নিশ্চয়তাও লাভ করেছেন। অতএব আহলেহাদীছগণ মনে করেন যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করার পর নিজেদের আবিষ্কৃত হাক্বীক্বত, তরীক্বত ও মা'রেফাত তত্ত্বের তথাকথিত সীনা ব-সীনা বাত্বেনী ইলমের তালাশে অযথা সময় নষ্ট করা ইসলামের সহজ-সরল ও পরিচ্ছন্ন জীবন বিধান হ'তে দূরে সরে যাওয়ারই নামান্তর। সঙ্গে সঙ্গে এটা শেষনবী *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর শরী'আত সংক্রান্ত আমানতদারীর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে, যা ঈমানের প্রকাশ্য বিরোধী।

আহলেহাদীছগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-কে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসকে ঈমানের অন্যতম প্রধান রুকন বা স্তম্ভ বলে মনে করেন। এই রুকনকে অস্বীকার বা অমান্যকারী কিংবা এতে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কখনোই মুসলমান হ'তে পারে না। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। অতএব তিনি মুসলিম-অমুসলিম, জিন-ইনসান ও সৃষ্টিজগতের একমাত্র নবী। তাঁর অনুসারী বিশ্বের সকল মুসলমান একই মিল্লাতভুক্ত একটি মহাজাতি। যেখানে ফের্কাবন্দীর কোন অবকাশ নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মুসলিম মিল্লাতকে আপোষে সকল দলাদলি ভুলে শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর একক নেতৃত্বে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়।

আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রথম চারজন খলীফাকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' (সঠিক পথের অনুসারী খলীফাগণ) বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের সহ রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর অপর যে কোন ছাহাবীর প্রতি সামান্যতম অসম্মান প্রদর্শন করাকে তারা 'গুনাহে কাবীরা' বলে মনে করেন।

তারা মহানবী *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর পরিবারবর্গের প্রতি যেমন মনে-প্রাণে ভক্তি রাখেন, তেমনি মহররমের তা'যিয়ার নামে হুসায়েন-পূজারও চরম বিরোধিতা করে থাকেন।

খালেছ সুন্নাতের অনুসারী আহলেহাদীছগণ কোন অবস্থাতেই বিদ'আতের সাথে আপোষ করেন না। লৌকিকতার নামে, দেশাচারের নামে, বিদ'আতে হাসানাহ্র নামে অথবা 'হিকমতের' দোহাই পেড়ে এরা কোন বিদ'আতকে কখনই প্রশ্রয় দেন না। এদের নিকটে সবচাইতে সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রকারের শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সর্বদা আপোষহীন থাকেন এবং যেকোন মূল্যে তাওহীদ ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করে চলেন। বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইসলামকে সর্বযুগীয় সমাধান বলে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের গতিশীল (Dynamic) হওয়ার স্বার্থেই 'ইজতিহাদ'কে সকল যুগে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং 'তাক্বলীদে শাখছী'কে অবশ্য বর্জনীয় বলে মনে করেন।[৫১] তারা একথাই বলতে চান যে, 'তাক্বলীদে শাখছী' হ'ল মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অগ্রগতির মূলে সবচাইতে বড় বাধা। কেননা এর ফলে আমরা কেবল একজনের একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার অন্ধ অনুসরণ করি, যার মধ্যে ভুলের আশংকা পুরা মাত্রায় বিদ্যমান। অথচ উক্ত একই বিষয়ে আরও যে কিছু উন্নত চিন্তা অন্যের মধ্যে কিংবা আমার নিজের মধ্যেই থাকতে পারে, এই চেতনা ও আত্মবিশ্বাস আমরা হারিয়ে ফেলি। তাক্বলীদের সাক্ষাৎ পরিণতিতে অবশেষে আমরা হয়তবা সারাটি জীবন ধরে একজনের দেওয়া একটি ভুলের অনুসরণ করে চলি। অথচ স্ব স্ব ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থেই তা পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে চলা মুক্তিকামী মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল। বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবী চিরদিন এটাই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 'আহলেহাদীছ'-এর পরিচয় এবং এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সকল আহলেহাদীছ মুসলমান, কিন্তু সকল মুসলমান আহলেহাদীছ নন। কেননা অন্যেরা কেবল ঐ হাদীছগুলিই মানেন, যেগুলি তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা আলেমদের গৃহীত মাযহাবের অনুকূলে হয়। কিন্তু আহলেহাদীছগণ

৫১. ইজতিহাদ-এর আভিধানিক অর্থ : সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। পারিভাষিক অর্থ : 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শারঈ বিধান নির্ধারণের জন্য নিয়মানুযায়ী সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা চালানো। -প্রকাশক।

নিরপেক্ষভাবে যেকোন ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। উপরের আলোচনায় একথাও প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল, 'তাক্বলীদে শাখছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এই তাক্বলীদ ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন মাযহাব বা তরীকার হৌক কিংবা বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রগতির নামে বিজাতীয় কোন মতবাদের হৌক। 'অহি'র বিধানের আনুগত্য ব্যতীত ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকারের তাক্বলীদ বর্জনযোগ্য। অতএব যাবতীয় মাযহাবী সংকীর্ণতা ও তাক্বলীদী গোঁড়ামী ছেড়ে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মন নিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দেওয়া ফায়ছালার সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনতকারী ব্যক্তিই মাত্র 'আহলেহাদীছ'। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহান ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দেছীনের উপাধিধন্য এই গৌরবময় নামে নিজেকে পরিচয় দিতেও অনেকে সংকোচ বোধ করে থাকেন।

অনেকে আহলেহাদীছকে হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি তাক্বলীদী ফের্কার প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা অনুরূপ একটি পৃথক ফের্কা বলে মনে করেন। অথচ ঐগুলি নির্দিষ্ট একজন ইমামের অথবা মাযহাবী আলেমদের অনুসারী দল মাত্র। পক্ষান্তরে ঐসব গণ্ডী ভেঙ্গে যারা নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন, তারাই কেবল 'আহলেহাদীছ' হ'তে পারেন। কেননা 'আহলেহাদীছ' অর্থাৎ 'হাদীছের অনুসারী' বললে কোন ব্যক্তির অনুসারী বুঝায় না। অতএব রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* যেমন বিশ্বনবী, তাঁর নিকটে প্রেরিত 'অহি' যেমন বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য, তেমনি সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক আন্দোলন তথা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তেমনি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত।

পরিশেষে আমরা সবিনয়ে নিবেদন রাখতে চাই যে, যেভাবে নির্দিষ্ট ইমাম, মাযহাব, ফিক্বহ ও তরীকা রচনা করে লোকেরা বিভিন্ন দলীয় নামে বিভক্ত হয়েছেন, এ ধরনের কোন বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের মধ্যে কেউ দেখেছেন কি? অতএব ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও মুহাদ্দেছীনকে যেমন কেউ কোন ব্যক্তি পূজারী ফের্কায় চিহ্নিত করতে পারেন না, তেমনি তাঁদেরই নামে নামাংকিত ও তাঁদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী আহলেহাদীছগণকেও প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কায় চিহ্নিত করা যায় না। তবে উদার ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত কারণে আহলেহাদীছগণ নিঃসন্দেহে একটি পৃথক জামা'আতী সত্তা। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকেও 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়ে থাকে।

ঐক্যের আন্দোলন

এক্ষণে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ইসলামী ঐক্য চান এবং ইসলামের বিধান ও অনুশাসনসমূহ সঠিকভাবে পালন করে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি কামনা করেন, তবে তাকে সর্বপ্রথম তার গলা থেকে তাক্বলীদের বেড়ী ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এবং মাযহাবী সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে। কেননা যারা চার মাযহাব মান্য করাকে ফরয (?) বলেন, তাদের মুখে মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান শোভা পায় না। অতঃপর সম্পূর্ণ খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে হবে। তা তার নিজ মাযহাবের, নিজ বংশের বা সমাজের এমনকি নিজ দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধেও যাক না কেন। এই কঠিন ঝুঁকি নিয়ে 'হক' কবুল করতে পারলেই তবে জান্নাতের আশা করা যায়।

১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে (الإتحاد مع الإختلاف) 'মতপার্থক্য সহ ঐক্য' নামে একটি নতুন ফর্মুলার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু প্রায় দু' দশক (১৯৭৮-৯৮) চেষ্টা করেও তাতে কোন ফলোদয় হয়নি।[৫২] কারণ বৈষয়িক অনৈক্যের চাইতে ধর্মীয় অনৈক্য মানুষের মনে বেশী রেখাপাত করে। আর সেকারণেই শ্রেষ্ঠ ইবাদত 'ছালাতের' শুরুতে জায়নামাযের দো'আ, অতঃপর নাওয়ায়তু আন পড়তে হবে কি-না। তাছাড়া বুকে হাত বাঁধা বা নাভীর নীচে হাত বাঁধা, রুকূতে যাওয়া ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা বা না করা, ঈদায়নের ছালাতে ৬ তাকবীর না ১২ তাকবীর, তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আত না ২০ রাক'আত, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি হবে না, ছালাত শেষে ইমাম-মুক্তাদী দু'হাত উঠিয়ে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত (প্রার্থনা) করবে কি করবে না, জুম'আর আযান একটা না দু'টা- ইত্যাকার ধর্মীয় পার্থক্য সমূহ ঘুচানো আজও সম্ভব হয়নি। অথচ এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ-সরল ঐক্য ফর্মুলা হ'ল: ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা যেটি প্রমাণিত হবে, সেটি সকলে মেনে নিবেন ও বাকীটা ছেড়ে দিবেন। যদি দু'টিই ছহীহ হাদীছে থাকে, তবে সর্বাধিক ছহীহ আমলটি করবেন অথবা দু'টি আমলই সুযোগমত করবেন। নির্দিষ্ট কোন একটির উপরে গোঁড়ামী করবেন না। বলা বাহুল্য, এধরনের পার্থক্য ফিক্বহের অধিকাংশ বিষয়ে রয়েছে।

---

৫২. অধ্যাপক গোলাম আযম, ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, ফেব্রুয়ারী ২০০০) পুস্তক দ্রষ্টব্য।

অনেকে বলেন, আমাদের মধ্যে আক্বীদায় কোন বিরোধ নেই। যত বিরোধ কেবল শাখা-প্রশাখায়। কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং আমলের সাথে সাথে আক্বীদার ক্ষেত্রেও রয়েছে দুস্তর পার্থক্য। যেমন কেউ বলছেন, আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। অথচ আল্লাহ্র আকার আছে *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫, মায়েদাহ ৫/৬৪ ইত্যাদি)*। কিন্তু তাঁর তুলনীয় কিছু নেই *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত *(ত্বোয়াহা ২০/৫ ইত্যাদি)*। কিন্তু তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজিত *(তালাক ৬৫/১২, বাক্বারাহ ২/১৪৮ প্রভৃতি)*। কেউ বলছেন 'যত কল্লা তত আল্লাহ'। আমরা সবাই আল্লাহ্র সত্তার অংশ *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। বাকী সবই তাঁর সৃষ্টি। স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনই এক নয় *(রা'দ ১৩/১৬, নাহল ১৬/১৭ ইত্যাদি)*। মূলতঃ এগুলি ইরানী ও হিন্দুয়ানী অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শন, যা মা'রেফাতের নামে ছূফীবাদী দর্শন হিসাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

কেউ বলেন, নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়ারা মরেন না, বরং তাঁরা ভূপৃষ্ঠ হ'তে ভূগর্ভে অর্থাৎ কবরে ইন্তেকাল বা স্থানান্তরিত হন মাত্র। তাঁরা কবরে যিন্দা থাকেন ও ভক্তদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, মৃতকে কেউ শুনাতে পারে না *(নমল ২৭/৮০)* এবং মৃতদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। আল্লাহ ব্যতীত কেউ কারু কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না' *(মায়েদাহ ৫/৭৬ ইত্যাদি)*। এমনকি কেউ কেউ 'যিন্দা পীর' নামেও অভিহিত হয়েছেন। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। চরম অদৃষ্টবাদী একদল লোক বলছেন, 'কিছু হইতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়' আমরা সবাই পুতুল সদৃশ। অতএব 'যেমনে নাচাও তেমনি নাচি, পুতুলের কী দোষ'? এর বিপরীতে আরেকদল বলছেন, অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। 'মানুষ নিজেই তার অদৃষ্টের স্রষ্টা'। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং সকল বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে ফায়ছালা করতে হবে।

এছাড়াও রয়েছে হাক্বীক্বত, তরীক্বত ও মা'রেফাতের নামে চিশতিয়া, ক্বাদেরিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নকশবন্দীয়া নামক প্রধান চারটি ছূফীবাদী দল, যাদের উপদলসমূহ মিলে রয়েছে প্রায় দু'শ তরীকা। যাদের পরস্পরে আক্বীদা ও আমলে কোন মিল নেই। মিল নেই এক পীরের সাথে আরেক পীরের ও তাদের মুরীদদের। ১৯৮১ সালে সরকারী হিসাব মতে দেশে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার

পীর। নিঃসন্দেহে তার সংখ্যা এখন অনেক বেশী এবং যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই ১৩ কোটি তাওহীদবাদী মুসলিমের অবস্থা এখন ঘুণে ধরা বাঁশের মত।[৫৩] যাতে কোন শক্তি নেই। আর এর একমাত্র কারণ হ'ল, বিভিন্ন শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল। যেসবের প্রচলনকারী হ'লেন, প্রথমতঃ দেশের এক শ্রেণীর আলেম, যারা দুনিয়াবী স্বার্থে এগুলির প্রচলন করেন ও লালন করেন। দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণীর সমাজনেতা, যারা এগুলিকে সহযোগিতা করেন ও পাহারা দেন। তৃতীয়তঃ এক শ্রেণীর ধনী লোক, যারা তাদের অঢেল ধন-সম্পদ এসবের পিছনে ব্যয় করেন সহজে জান্নাত পাওয়ার ধোঁকায়। চতুর্থতঃ দেশের সরকার, যারা ধর্মের নামে এগুলিকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

সত্য কথা বলতে কি, এদেশের অধিকাংশ পীর ও ইসলামী নেতা তাওহীদ-এর সঠিক ব্যাখ্যা জানেন না কিংবা সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝেন না। সেকারণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী আক্বীদা যেমন তাওহীদের নামে পার পেয়ে যাচ্ছে, তেমনি প্রচলিত বিদ'আতসমূহ 'বিদ'আতে হাসানাহ্'র নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে যেন শিরক ও বিদ'আত বলে কিছুই নেই। যা আছে সবই তাওহীদ, সবই সুন্নাত, সবই ইসলাম। এসবের বিরোধিতাকারী আহলেহাদীছরাই আসলে বেদ্বীন ও লা-মাযহাবী। *হা-শা ওয়া কাল্লা!* অনেকে হিতাকাঙ্খী সেজে বলেন, আপনারা সকলের সাথে মিশে যান। অথচ তারা বুঝেন না যে, হক কখনো বাতিলের সাথে মিলে যায় না। মুক্তা কখনো লবনের মত পানিতে মিশে যায় না। বরং সর্বদা ভেসে থাকে।

অতএব শিরক ও বিদ'আত সমূহের ব্যাপারে মৌলিক ঐক্যমতে না এসে কেবলমাত্র ভোটের স্বার্থে সাময়িক 'ইসলামী ঐক্যজোট' করলে তা কখনই টেকসই হবে না। বরং স্লাইস্ড পাউরুটির মত স্বার্থদুষ্ট পাতলা পর্দার বাহ্যিক ঐক্য যেকোন সময়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

বলা আবশ্যক যে, ইসলামের শত্রুরা রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের চাইতে আক্বীদাগত বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী মুসলিম পণ্ডিত ইতিমধ্যেই তাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যারা দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহে, শিক্ষা কেন্দ্রে, অর্থনৈতিক উপায়-উপাদানসমূহে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অনুপ্রবেশ করে তাদের কপট উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন। ঐক্য প্রয়াসী ইসলামী নেতৃবৃন্দকে তাই মূল আক্বীদাগত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানাই।

---

৫৩. বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটি। -প্রকাশক।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইসলামের মধ্যকার বিচ্ছিন্ন ফের্কা সমূহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার একটিমাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়। মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-কে একাই একটি 'উম্মত' হিসাবে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে *(নাহ্ল ১৬/১২০)*। যদিও তাঁর যুগে তিনি কার্যতঃ একাকী ছিলেন এবং তাঁর পিতা ও নিজ গোত্র সহ সে যুগের প্রায় সকল মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

অতএব আজও যেকোন মূল্যে হক-কে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং মনকে উদার রেখে সকলকে হক-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে। সংখ্যায় কম হৌক বা বেশী হৌক হকপন্থী সেই লোকগুলিই হবেন আল্লাহ্র নিকটে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ একটি জামা'আত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সর্বদা সেদিকেই জগদ্বাসীকে আহ্বান জানায় এবং হকপন্থী সেই জামা'আতই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের (হকপন্থীদের) সঙ্গে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লাহ্র যমীনে প্রতিষ্ঠা করার যে আন্দোলন তাকেই সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন বলে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এর কাজ হ'ল কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃপক্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বিদ্যমান নেই। আর সেকারণেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে হয়েছে, আজও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের নামে এযাবত যতগুলো আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই অবশেষে সংকীর্ণ মাযহাবী রূপ ধারণ করেছে এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও শাসন সংবিধানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের বদলে কোন একটি মাযহাবী মতবাদ চেপে বসেছে। যার

পরিণতি অতীব ভয়াবহ হয়েছে। বিগত যুগে আব্বাসীয় খেলাফতকালে খলীফা মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক্ব বিল্লাহ (১৯৮-২৩২ হি.) কর্তৃক মু'তাযিলা মতবাদের নির্মম পৃষ্ঠপোষকতা, বর্তমানে ইরানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকূমত তথা শী'আ হুকূমত এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশে একটি বিশেষ ইসলামী দল কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ মাযহাবী (হানাফী) হুকূমত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এরই প্রমাণ বহন করে।[৫৪] যেকোন দলীয় নামের সাথে 'ইসলাম' শব্দটি জুড়ে দিলে তা দ্বারা অবশ্যই কিছু সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু নিজেদের দলীয় অনুদারতা ঢাকবার জন্য যেরূপ ঢালাওভাবে সকলে ইসলামকে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করছেন, তাতে ইসলামী আন্দোলন যেন গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছে। কোন্ ইসলামের দলভুক্ত হ'লে সত্যিকারের ইসলামী জামা'আতভুক্ত হ'লাম, তা বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

যে বৈশিষ্ট্যগত কারণে ছাহাবায়ে কেরাম স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করতেন, সেই একই কারণে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহী আহলেহাদীছগণ সকল প্রকারের রাখ-ঢাক ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্কে স্ব স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের পরিচালিত আন্দোলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলেছেন। তাতে সস্তা জনপিয়তা (Cheap popularity) অবশ্যই ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু তবুও হককে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পূর্ণ খোলা মনে যিনিই নির্ভেজাল ইসলামের অনুসরণে ব্রতী হবেন, তিনিই এ আন্দোলনে শরীক হ'তে পারবেন।

মোদ্দাকথা কালেমা শাহাদাত পাঠকারী যে কোন মুসলমান, তিনি যতই অনৈসলামী ভাবাপন্ন হৌন না কেন, তাকে যেমন 'কাফের' বলা যায় না, তেমনি ইসলামের নামে পরিচালিত কোন আন্দোলন, তার মধ্যে যতই শিরক ও বিদ'আতের জগাখিচুড়ি থাকুক না কেন, সাধারণভাবে তাকে ইসলামী আন্দোলনই বলতে হয়। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলতে এসব ভেজালের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠা করাই এ মহান আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব সঙ্গত কারণেই এ আন্দোলনের কর্মীরা সকল প্রকারের শিরক-বিদ'আত ও অনৈসলামী তৎপরতার বিরুদ্ধে হয়ে থাকেন আপোষহীন সংগ্রামী। তাই 'সকলের মনরক্ষা

৫৪. দ্রষ্টব্য: উর্দু সাপ্তাহিক আল-ইসলাম (লাহোর) ১৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা এবং বাংলা সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (ঢাকা) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ প্রশ্নোত্তরের আসর; অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তর (ঢাকা: গ্রন্থমালঞ্চ ১৯৯৮) পৃ. ১৮২।

নীতি' অনুসরণে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের কোন সুযোগ না থাকার কারণে আহলেহাদীছের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় চিরদিনই কম। বরং বলা যেতে পারে যে, সংখ্যায় কম হওয়াটাই এদের গৌরব। কেননা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* প্রদত্ত সুসংবাদ কেবলমাত্র ঐ সকল মর্দে মুজাহিদের জন্যই নির্ধারিত, যারা পরিত্যাগকারীদের ও বিরোধিতাকারীদের পরোয়া না করে সর্বদা হক-এর উপর বিজয়ী থাকেন *(মুসলিম হা/১৯২০, ১০৩৭)*। তাছাড়া কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা চিরদিনই কম হয়ে থাকে *(সাবা ৩৪/১৩)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন?

ইসলামের স্বচ্ছ কিরণমালার উপরে অনৈসলামী চিন্তাধারার কালো মেঘ যুগে যুগে ঘনায়িত হয়েছে। কখনো সে আলো সম্পূর্ণ বাধামুক্ত পরিবেশে মানুষের মাঝে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে এনেছে। কখনও বা জাহেলিয়াতের গাঢ় তমিশ্রায় মেঘে ঢাকা সূর্যের মত তার স্বচ্ছ কিরণ মানুষের নিকট আপন স্বরূপে প্রকাশ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বুভুক্ষ মানবতা চিরদিন তা পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা যারা তার যথাযথ পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে 'মুসলিম' হয়ে আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে প্রশংসা কুড়িয়েছিলাম। সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী আমাদের উচ্চ সম্মান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেই আমরাই ইসলামের সাথে সবচাইতে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে ভেজাল মিশ্রিত করেছি। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে মনের মত করে নিয়েছি। ফলে নিজেরা পেয়ে হারিয়েছি। অন্যকেও দিতে অপারগ হয়েছি।

বলতে কি, ইসলামের প্রথম যুগ হ'তেই তার বিরুদ্ধে ভিতর ও বাহির সকল দিক থেকে হামলা পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন অনৈসলামী চিন্তাধারা ও বিজাতীয় রসম-রেওয়াজকে ইসলামী লেবাস পরিয়ে মুসলিম সমাজে প্রচার ও প্রসার ঘটাবার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। যুগে যুগে বহু মুসলমান তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর পবিত্র যুগে মুনাফিকদের কপট আচরণ ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগে তাদের অপতৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকার নও-মুসলিমদের দ্বারা আমদানীকৃত শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী প্রথাসমূহের উদ্ভব আমাদেরকে উক্ত কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিদ'আতী দলগুলি থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্ভেজাল ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য হকপন্থী মুসলমানগণ সেই যুগে নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' হিসাবে পরিচিত করেছিলেন। তাঁরা মুসলিম সমাজকে যাবতীয় অনৈসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি হ'তে বিমুক্ত রাখার জন্য জীবনপাত করে গেছেন। যুগে যুগে তাঁদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। মুসলিম মিল্লাতকে কিতাব ও সুন্নাতের মূল ভিত্তির উপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিজেদের সকল শ্রম নিয়োজিত করেছেন। সত্য কথা বলতে কি, একমাত্র এঁদেরই নিঃস্বার্থ খিদমত ও আন্দোলনের ফলে বিদ'আতপন্থীদের হাতে ইসলাম আজও সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হ'তে পারেনি। এঁদের ঘরে আজও তাওহীদ ও সুন্নাহ স্বরূপে প্রাণবন্ত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা :

শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর আগমনকালে পৃথিবীর যে করুণ দশা ছিল, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি তা থেকে কোন অংশে কম নয়। সে কারণে পৃথিবীর বর্তমান বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে মানবতা যখন চরমভাবে মার খাচ্ছে, বস্তুবাদী দর্শনসমূহ তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে যখন ক্রমেই ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে এবং সারা বিশ্ব যখন একটি শান্তিময় আদর্শের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে, সেই মুহূর্তে ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ সকলের সম্মুখে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের যোগ্য অনুসারীগণকে তাই আজ তাদের চিরন্তন জিহাদী ঐতিহ্য স্মরণ করে চরম ত্যাগের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে ও বিদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের জোয়ার বইয়ে দিয়ে মানুষকে মূল ইসলামের মর্মমূলে সংগঠিত করতে হবে।

পরিশেষে আমরা বিশ্বের সকল মুসলমান, বিশেষ করে যুব সমাজকে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হওয়ার এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনা করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আহলেহাদীছ : অন্যদের দৃষ্টিতে

আহলেহাদীছগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ বলেন: **AHL-I-HADEETH :** The followers of the prophetic traditions, who profess to hold the same view as the early Ashab-al-hadith or Ahl-al-hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by 'Taqlid'.... But consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true Muslims.

The Ahle-hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity to faith and practices. Emphasis is accordingly laid in particular on the reassertion of 'Tawhid' and the denial of occult powers and knowledge of the hidden things (*Ilm-al-ghayb*) to any of his creatures. This involves a rejection of the miraculous powers of Saints and of the exaggerated veneration paid to them. They also make every effort to eradicate customs either to innovation (bid'a) or to Hindu or non-Islamic systems.

In all these, their reformist programme bears a striking resemblance to that of the '*Wahhabis*' of Arabia and as a matter of fact their adversaries often nickname them Wahhabies.

অর্থ: 'আহলেহাদীছ' বলতে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর হাদীছের অনুসারী দলকে বুঝায়। যারা প্রাথমিক যুগের আহলুল হাদীছ বা আছহাবে হাদীছের ন্যায় মত পোষণ করে থাকেন (আহলুর রায়-এর বিপরীতে)। যারা তাক্বলীদের বন্ধনকে স্বীকার করেন না...। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য যথার্থ পথপ্রদর্শক বা Worthy guide বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মূলনীতিসমূহের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আক্বীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালান। তারা বিশেষভাবে তাওহীদকে পুনঃনিশ্চিত করার উপরে জোর দেন এবং কোন সৃষ্টিকে অলৌকিক শক্তি অথবা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলতে অস্বীকার করেন। সে কারণে তারা কোন আউলিয়া বা সাধু ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ অতিভক্তি প্রদর্শন করেন না। তারা মুসলিম সমাজে সৃষ্ট কোন বিদ'আত (ধর্মের নামে সৃষ্ট কোন নতুন প্রথা) কিংবা হিন্দুয়ানী প্রথা বা অন্য যে কোন অনৈসলামী রীতি-নীতি সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। তাদের এই সংস্কারমূলক কার্যক্রম সমূহ আরবের ওয়াহ্হাবীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সত্য বলতে কি, তাদের বিরোধীরা এ কারণেই তাদেরকে কখনো কখনো 'ওয়াহ্হাবী' বলে দুর্নাম করে থাকে'।[৫৫]

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : ইসলামী আন্দোলন না বলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বলার পিছনে যুক্তি কী?

উত্তর : ইসলামী আন্দোলন একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। শী'আ, সুন্নী, শিরকী, বিদ'আতী সকল মত ও পথের মুসলমান ইসলামী আন্দোলনের নামে যে কোন দলে শরীক হ'তে পারেন। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি বিশেষ অর্থবোধক পরিভাষা। যেখানে শিরক ও বিদ'আত বর্জিত প্রকৃত তাওহীদপন্থী মুসলমানই কেবল অংশগ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনে মানব রচিত মতবাদ সমূহের অনুসারী এবং ইসলামের নামে রায়পন্থী কোন মুসলমানের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তিই কেবল আহলেহাদীছ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন-২ : সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বিপরীতে আহলেহাদীছ-এর নামে আন্দোলন চালানো বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর নামান্তর নয় কি?

উত্তর : দেশে ঐক্যের শ্লোগান আছে। কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য বলে বাস্তবে কিছু নেই। এর কারণ যারা ঐক্যের কথা বলেন, তারা বৃহত্তর ঐক্যের কোন

৫৫. এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, লাইডেন, ব্রীল ১৯৬০, ১/২৫৯ পৃ.।

গ্রহণযোগ্য ভিত্তি দিতে পারেননি। ফলে ইসলামী আন্দোলনের নামে এবং বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার নামে দেশে অসংখ্য ইসলামী দলের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রাজনীতির নামে অসংখ্য দল ও উপদল। অথচ এগুলিকে কেউ ফাটল বলেন না। বরং বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে এগুলির প্রশংসাই করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সকল দল ও মতের মুসলমানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে চলার একটিমাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই 'বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের' একমাত্র প্লাটফরম বলা যেতে পারে। যেখানে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম ঐক্যের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তি পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল এই যে, সংখ্যা কখনই সত্যের মাপকাঠি নয়। মুসলমানকে সংখ্যাপূজারী হ'তে *(আন'আম ৬/১১৬)* এবং জেনে-শুনে হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করতে *(বাক্বারাহ ২/৪২)* পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। বরং স্যখ্যায় কম-বেশী যাই-ই হৌক, সর্বাবস্থায় হক-এর অনুসারী থাকার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(নিসা ৪/১৭০ প্রভৃতি)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই মুসলমানগণ অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করেন *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২ প্রভৃতি)*। আহলেহাদীছ আন্দোলন সেই বিশ্বাসকেই বাস্তবায়িত করতে চায় মাত্র। অধিকাংশ লোক চিরকাল হক-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আজও করবে। তাই বলে কি সংখ্যাগুরুর নিন্দাবাদের ভয়ে সংখ্যালঘু সত্যসেবীগণ হক-এর দাওয়াত পরিত্যাগ করে বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যাবেন? অতএব হক-এর স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্যের বিষয়টি বিবেচনা করা গেলেও হকপন্থীদের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকার কুরআনী নির্দেশ *(তওবা ৯/১১৯)* সর্বদা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন-৩ : আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব কি? যদি না হয়, তাহ'লে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার যে দাবী আহলেহাদীছগণ করে থাকেন, তা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে?

উত্তর : কাউকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর সকল মুসলিম অঞ্চলে এমনকি ৩৭৫ হিজরী পর্যন্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন ইসলামী রাজধানী সিন্ধুর মানছূরাহ্তেও (করাচী) আহলেহাদীছগণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হিজরীতে আহলেহাদীছগণ

দক্ষিণ ভারতের গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছেন। পুনরায় যে আল্লাহ তাদের হাতে সে ক্ষমতা দিবেন না, এই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? বরং আমাদের উপরে ফরয হ'ল, শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। আর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব আল্লাহ্র *(ছফ ৬১/৯)*। অবশ্য দাওয়াত কবুল হ'লে তার বিনিময়ে আল্লাহপাক স্বীয় দ্বীনকে যেকোন সময়ে শাসন ক্ষমতায় বসাবেন বলে ওয়াদা করেছেন *(নূর ২৪/৫৫)*। এমনকি ফাসেকদের মাধ্যমেও তিনি এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন *(বুখারী হা/৪২০২-০৩)*।

প্রশ্ন-৪ : রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে প্রথমে রাষ্ট্র কায়েম করেন। অতঃপর ইসলাম কায়েম করেন।

উত্তর : কথাটি বাস্তবসম্মত নয়। ইসলাম মানুষের জন্য স্বভাবধর্ম। তা কখনোই রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। তবে তা নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। মুসলমান সর্বাবস্থায় সে চেষ্টা করে যাবে। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) ছিলেন শেষনবী। তাই তাঁর মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেটি প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ যখন যে মুমিনকে ক্ষমতায় বসাবেন, তখন তার জন্য এটি প্রধান দায়িত্ব হবে। আর অন্যদের দায়িত্ব হবে সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়া অসম্ভব, এই ধারণাটাই বা সার্বিকভাবে কতটুকু বাস্তব সম্মত? ইসলামের ফৌজদারী ও অর্থনৈতিক আইনের কতগুলি মৌলিক ধারা যেমন খুনের বদলে কিছ্বাছ, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীর দণ্ড প্রদান, সূদী লেনদেন সরকারীভাবে বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন। যে কোন মুসলিম শাসকই এগুলি করতে বাধ্য। না করলে তিনি এজন্য আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবেন। সাধারণ মুসলমানগণ ও ইসলামী সংগঠনসমূহ শাসন কর্তৃপক্ষকে এজন্য পরামর্শ দিবেন ও তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাবেন। সেই সাথে নিজেরা সাধ্যমত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন ও জনমত গড়ে তুলবেন।

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, সংখ্যাগুরু হৌক বা সংখ্যালঘু হৌক সকল অবস্থায় সকল দেশে মুসলমানকে ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। এজন্য বিশ্বব্যাপী

সর্বত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক পূর্বশর্ত নয় এবং তা কখনো সম্ভবও নয়। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তাছাড়া 'আখেরাতের গৃহ তো আল্লাহ নির্ধারিত রেখেছেন কেবল তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত নয় এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। আর শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্য' *(ক্বাছাছ-মাক্কী ২৮/৮৩)*।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতিতে 'আল্লাহ্ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। এখানে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত'। অথচ ইসলামী রাজনীতিতে 'অহি'-র বিধানই চূড়ান্ত'। দুঃখের বিষয়, এদেশে যারা এমনকি ইসলামের নামে রাজনীতি করেন, তারাও বৃটিশ প্রবর্তিত কুফরী গণতন্ত্রের পূজারী এবং 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'-এই মতবাদে বিশ্বাসী। আর সে কারণেই তারা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা অধিক সেই মাযহাব অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা হওয়াটাই স্বাভাবিক'।[৫৬] হক-নাহক কোন ব্যাপার নয়, সংখ্যায় বেশী হ'লেই হ'ল। অথচ আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ইসলামের নামে অর্জিত সুন্নী প্রধান পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হ'লেন শী'আ এবং আইনমন্ত্রী যাফরুল্লাহ খান হ'লেন অমুসলিম ক্বাদিয়ানী। আল্লাহ্র ইচ্ছা তো এভাবেই কার্যকর হয়।

চতুর্থতঃ আজকাল ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে জোট করাকে কুরায়েশদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'-র সঙ্গে তুলনা করছেন। এর মাধ্যমে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন মাত্র। কেননা রাসূল (ছাঃ) সেদিন ত্বাগূতী কোন বিধানের সঙ্গে আপোষ করেননি। কেবল নিজের নামের শেষে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে দিয়ে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখে সন্ধি করেছিলেন *(মুসলিম হা/১৭৮৪; বুখারী হা/২৭৩১)*। পক্ষান্তরে ইসলামী নেতাগণ সেক্যুলার সরকারের পার্টনার হয়ে অসংখ্য ত্বাগূতী বিধানের সাথে আপোষ করে চলেন।

অতএব প্রচলিত এই শিরকী রাজনীতির সঙ্গে আপোষ করে নয়; বরং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পক্ষে জনমত গঠনের মাধ্যমে একে পরিবর্তন করাই হ'ল প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাজনীতি।

---

৫৬. দ্রষ্টব্য: সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (ঢাকা) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ প্রশ্নোত্তরের আসর; অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তর (ঢাকা: গ্রন্থমালঞ্চ ১৯৯৮) পৃ. ১৮২।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ দু'টি বিষয়কে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন। ১- আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের মৌলিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে ওযর পেশ করা। ২- হঠকারী বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা, যেন 'তারা দাওয়াত পায়নি' বলে আল্লাহ্র সম্মুখে কোনরূপ ওযর পেশ করার সুযোগ না পায়।

আর দু'টি বিষয়কে তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দেন। তিনি চাইলে সে দু'টি দ্রুত বাস্তবায়িত করবেন, চাইলে দেরীতে করবেন। একটি হ'ল, মানুষের হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়টি হ'ল, তাঁর প্রেরিত দ্বীনকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। উক্ত দু'টি বিষয় অর্জনের জন্য ইসলাম প্রদত্ত সমাজ বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণে জনগণের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে সদা সচেষ্ট থাকা যরূরী *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*। কারণ সরকার পরিবর্তনের চাইতে সমাজ পরিবর্তনকে নবীগণ অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আমরা নবীদের সেই তরীকায় চলতে চাই। তাছাড়া সমাজ পরিবর্তন ব্যতীত সরকার পরিবর্তন সমাজে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। যেমন সক্ষম হয়নি ভারতে ৬৫২ (১২০৬-১৮৫৮ খৃ.) বছরের মুসলিম শাসন এবং বাংলাদেশে ১৯০ (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃ.) বছরের খৃষ্টান ইংরেজ শাসন। যদিও দুর্বলচেতা কিছু লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৫ : ইসলামী আন্দোলনের নামে যতগুলি দল কাজ করছে, তারা সবাই ঠিক। অতএব যেকোন একটি দলে যোগ দিলেই তো চলে।

উত্তর : আমরা বিশ্বাস করি কোন ব্যাপারে 'ঠিক' একটাই হয়, একাধিক নয়। আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই একমাত্র ঠিক, বাকী সবই বেঠিক। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন থেকে সরিয়ে ভেজাল আন্দোলনসমূহে নেওয়ার জন্যই বর্তমানে 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'-এর ধোঁকা সৃষ্টি করা হচ্ছে মাত্র।

প্রশ্ন-৬ : আহলেহাদীছ-এর রাজনৈতিক দর্শন কী?

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালিত করা।

প্রশ্ন-৭ : প্রচলিত রাজনীতিতে কয়টি শিরক আছে?

উত্তর : দু'টি। (১) জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং (২) অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। অথচ ইসলামী রাজনীতিতে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস

(বাক্বারাহ ২/২০, ১৬৫) এবং অহি-র বিধানই চূড়ান্ত *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। এছাড়া প্রচলিত রাজনীতিতে সকল ধর্ম সমান। অথচ ইসলামী রাজনীতিতে আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

প্রশ্ন-৮ : আহলেহাদীছ-এর নিকটে দেশে আইন রচনার ভিত্তিসমূহ কী কী?

উত্তর : (১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আইন রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা (২) অস্পষ্ট বিষয়গুলিতে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবার আলোকে 'ইজতিহাদ' করা (৩) মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করা।

প্রশ্ন-৯ : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

প্রশ্ন-১০ : আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি কী?

উত্তর : আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি হ'ল দু'টি : (১) আল্লাহ্র পথে দাওয়াত এবং (২) আল্লাহ বিরোধী পথে প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ হবে জান, মাল, সময়, শ্রম, কথা, কলম ও সংগঠন তথা সর্বাত্মকভাবে বৈধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। এক কথায় আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি হ'ল দু'টি : দাওয়াত ও জিহাদ।

প্রশ্ন-১১ : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কেমন সমাজ চায়?

উত্তর : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

আল্লাহ পাক সকল মুসলিম ভাই-বোনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

এক নযরে আহলেহাদীছ

১. আহলেহাদীছ কারা?

যারা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী।

২. আহলেহাদীছ আন্দোলন কী?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন?

নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীকার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন।

৪. আমাদের আহ্বান

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!!

৫. আমরা চাই

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

প্রশ্নমালা

১. ‘আহলেহাদীছ’-এর পরিচয় কী?

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বলতে কাদের বোঝানো হয়?

৩. ‘আহলেহাদীছ’-এর বাহ্যিক নিদর্শন কী কী?

৪. আহলুল হাদীছ ও আহলুল রায় বলতে কাদের বোঝানো হয়?

৫. তাক্বলীদে শাখ্ছীর ব্যাখ্যা কী?

৬. আহলেহাদীছের ইস্তিদলালী পদ্ধতি কী?

৭. হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতির কারণ কি?

৮. যুগে যুগে কারা জামা‘আতে আহলেহাদীছের অন্তর্ভুক্ত থেকে দাওয়াতী কাজ করেছেন?

৯. মুসলমানদের মধ্যে দল-বিভক্তির কারণ কী কী?

১০. দুনিয়ার সকল মুসলমান কি আহলেহাদীছ?

১১. আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য কী?

১২. তাক্বলীদকারীদের পরিণতি কেমন হবে?

১৩. ইসলামের দৃষ্টিতে ঐক্যের আন্দোলনের ভিত্তি কী হওয়া উচিত?

১৪. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ কী? এ আন্দোলনের প্রয়োজন কেন?

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭ খৃ.
২য় প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৮ খৃ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ وحْدَهُ والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَن لاَ نَبِيَّ بعدَهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَ بَعْدُ :

আমরা কি চাই?

আমরা আমাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

পৃথিবীতে মোটামুটি চার ধরনের মানুষ বসবাস করে।

(১) আল্লাহকে মানে ও তাঁর বিধানকে মানে। যেমন ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগে যুগে একনিষ্ঠ মুমিনগণ।

(২) আল্লাহকে মানে, কিন্তু তার বিধানকে মানে না। যেমন আবু জাহ্ল ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুশরিকবৃন্দ।

(৩) আল্লাহকে মানে এবং তার বিধানের কিছু মানে, কিছু মানে না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুনাফিক ও ফাসেকবৃন্দ।

(৪) আল্লাহকে মানে না। তার বিধানকেও মানে না। যেমন যুগে যুগে কাফের ও নাস্তিকবৃন্দ।

আদমের পৃথিবীতে অবতরণ :

আল্লাহ আদম-হাওয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- ‘..তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’। ‘পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

ইবলীসের বিতাড়ন :

ইবলীসকে পৃথিবীতে বিতাড়নের সময় তার প্রার্থনা মোতাবেক আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করার অনুমতি দেন এবং বলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৪২)*। তিনি আরও বললেন, قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ- 'তবে এটাই সত্য। আর আমি সত্যই বলে থাকি'। 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই' *(ছোয়াদ ৩৮/৮৪-৮৫)*।

বস্তুতঃ তখন থেকেই চলছে শয়তানী প্রলোভন থেকে মুক্ত আল্লাহ্র অনুগত খাঁটি বান্দাদের বাছাই প্রক্রিয়া। সেজন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর বাণী ও বিধানসহ নবীগণকে পাঠিয়েছেন মানুষকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখার জন্য। কিন্তু শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে থাকে।

প্রকৃত ঈমানদারগণ সর্বদা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকেন ও আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকেন। শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে তারা পা দেন না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসী লোকেরা হয় শয়তানের লোভনীয় শিকার। শেষোক্ত তিন প্রকারের লোকেরা সর্বদা প্রথমোক্ত মোখলেছ বান্দাদের দুশমন হয়। এরা সর্বদা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। এরাই হ'ল আল্লাহ্র ভাষায় কাফের, মুনাফিক ও ফাসেক শ্রেণী বা তাদের অনুগামী। এরাই সমাজে সকল অশান্তি ও ভাঙ্গনের জন্য দায়ী। আল্লাহ্র দাসত্বের অর্থ ও সারবত্তা এরা বুঝে না। যদিও তারা আল্লাহকে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ- 'যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ বিষয়ে জানে না' *(লোকমান ৩১/২৫)*।

অর্থাৎ ওরা 'সৃষ্টিকর্তা' হিসাবে আল্লাহকে মানে। কিন্তু তাঁর বিধান মানতে চায় না। অথচ আল্লাহকে স্বীকৃতির অর্থই হ'ল তাঁর বিধান সমূহ মেনে চলা ও সর্বাবস্থায় তাঁর দাসত্ব করা। দুনিয়াতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হ'ল সেটা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে 'তাওহীদে ইবাদত' প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আল্লাহ্র দাসত্বের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় :

আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ- (الشورى ١٣)-

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাক, তা তাদের কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়’ *(শূরা ৪২/১৩)*।

নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এটি ছিল মুশরিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয়। কেননা এতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বিঘ্নিত হয়। আজও সেটি অব্যাহত রয়েছে।

অত্র আয়াতে ‘তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর’ অর্থ তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা কর। অর্থাৎ ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ, ইক্বামতে হুকূমত নয়। যেমনটি আধুনিক যুগের কোন কোন মুফাসসির ধারণা করেছেন। কেননা কোন নবীই হুকূমত প্রতিষ্ঠার জন্য বা ক্ষমতা লাভের জন্য দাওয়াত দেননি। বরং সকলেই শিরকের স্থলে তাওহীদের আলোকে সমাজ সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাওহীদ এককভাবে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু হুকূমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সর্বাবস্থায় শর্ত নয়। তবে সেজন্য আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকারের মাধ্যমে জনমত গঠন করা সর্বাবস্থায় যরূরী। কেননা সার্বিক জীবনে পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। এজন্য মুসলিম রাজনীতিক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অবশ্যই তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন। নইলে আখেরাতে দায়ী হবেন।

আলী (রাঃ)-কে হত্যাকারী খারেজী চরমপন্থীরা বলেছিল, لاَ حُكْمُ إِلاَّ للهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই'। জওয়াবে আলী (রাঃ) বলেছিলেন, كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ بِرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً.. أَمَّاالْفَاجِرَةُ : فَيُقَامُ بِهَا الْحُدُوْدُ وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا العَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ– 'কথা সত্য, কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে'। 'অবশ্যই মানুষের জন্য নেতৃত্ব থাকবে, ভাল হৌক বা মন্দ হৌক।.. মন্দ শাসকের মাধ্যমে দণ্ডবিধি সমূহ কায়েম করা হয়। রাস্তা সমূহ নিরাপদ করা হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণ করা হয়'।[৫৭]

বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগেও কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের কাফের গণ্য করার মাধ্যমে চরমপন্থীরা তাদের রক্তকে হালাল মনে করছে। ফলে মুসলিম সমাজে রক্তাক্ত হানাহানি চলছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সকল প্রকার চরমপন্থী আন্দোলন থেকে সর্বদা বিরত থাকে এবং সমাজকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে।

'আহ্দে আলাস্ত :

সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ সকল মানুষকে ছোট্ট পিপীলিকার অবয়ব দিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাঁর দাসত্বের অঙ্গীকার নিয়ে বলেছিলেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই'? তারা বলেছিল, بَلَى شَهِدْنَا 'হ্যাঁ। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আল্লাহ এ সাক্ষ্য ও অঙ্গীকার এজন্য নিয়েছিলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে শিরক করার ব্যাপারে বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে বাঁচতে না পারে কিংবা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে, আমরা আল্লাহকে স্বীকৃতি দান ও তাঁর দাসত্ব করার বিষয়টি জানতাম না' *(আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩)*।[৫৮]

---

৫৭. মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলত্বানিয়াহ ১/৯৮ 'বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; আকরাম যিয়া 'উমারী, 'আছরুল খিলাফাতির রাশেদাহ (মাকতাবা উবায়কান) ১/১৪২।

৫৮. أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ– يَعْنِى عَرَفَةَ– فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلاً قَالَ (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟... আহমাদ হা/২৪৫৫, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ); হাকেম হা/৪০০০, ২/৫৯৩ পৃ. সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১২১ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ, আলবানী, হাদীছ ছহীহ।

বর্তমান পৃথিবীতে যাবতীয় অশান্তির মূলে হ'ল আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা। তথা শয়তানের দাসত্ব করা। মানুষ নানা ভয়-ভীতি ও প্রলোভনে পড়ে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র দাসত্ব ছেড়ে শয়তানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হচ্ছে। সেখান থেকে নিজেকে ও অন্যকে বাঁচানোই হ'ল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য। নবী-রাসূলগণ সর্বদা সেকাজই করে গেছেন।

শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের বাস্তব রূপকার। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেপথেই মানুষকে পরিচালিত করতে চায় এবং কেবল তাওহীদে রুবূবিয়াত নয়; বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাওহীদে ইবাদত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

কেন চাই?

ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্যই আমরা সার্বিক জীবনে তাওহীদের প্রতিষ্ঠা চাই। আমরা বলি, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। পৃথিবীর সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষ একই আদমের সন্তান। ফলে সকলের মৌলিক সমস্যা ও চাহিদা যেমন এক, তেমনি সবকিছুর মৌলিক সমাধানও মূলতঃ একই। সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই আল্লাহ্র বিধান সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর।

দু'টি দর্শনের সংঘাত :

পৃথিবীতে সর্ব যুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে এসেছে। এক- মানুষ সর্বদা নিজের খেয়াল-খুশীমত চলবে। দুই- মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান মতে চলবে ও সে অনুযায়ী কাজ করবে। অন্য কথায়, মানুষ মানুষের দাসত্ব করবে, না আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করবে?

প্রত্যেক মানবশিশু ফিৎরাতের উপর অর্থাৎ 'ইসলামের উপর' (عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ) জন্মগ্রহণ করে।[৫৯] আল্লাহ্র দেওয়া স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সে তার দৈহিক

৫৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৩২; শু'আয়েব আরনাঊত্ব বলেন, বর্ণনাকারীগণ সকলে বিশ্বস্ত।

ও মানসিক পরিবৃদ্ধি লাভ করে। তার আকৃতি, প্রকৃতি, মেধা ও যোগ্যতা সবকিছুই আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত- একথা সে নিজের অবচেতন মনে স্বীকার করে ও আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের স্তরসমূহে তার দেহ বাধ্যগতভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। যদিও তার চিন্তাশক্তি স্বাধীন থাকে। তাই এ সময় সে শয়তানের দাসত্ব অথবা আল্লাহ্র দাসত্বের যেকোন একটি বেছে নিতে পারে।

চারটি বাধা

মোটামুটি চারটি প্রধান বাধা মানুষকে তার স্বভাবধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তার পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র।

প্রথম বাধা– পরিবার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রত্যেক মানব সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী বানায়, নাছারা বানায় বা অগ্নি উপাসক বানায়'...।[৬০] ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, وَيُشَرِّكَانِهِ 'পিতা-মাতা তাকে মুশরিক বানায়'।[৬১]

এক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান হ'ল এই যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও রীতি-নীতি হ'তে বিরত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً 'যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেন আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদাচরণ করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। বস্তুতঃ সন্তানের দুনিয়াবী মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি আল্লাহ্র বিধান মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

---

৬০. বুখারী হা/১৩৫৯; মুসলিম হা/২৬৫৮ (২২); মিশকাত হা/৯০।
৬১. মুসলিম হা/২৬৫৮ (২৩) 'তাক্বদীর' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ।

পারিবারিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত কায়েম করা ভবিষ্যৎ সুসন্তান ও সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য একান্তভাবেই যরূরী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এজন্য নিয়মিত ব্যক্তি প্রশিক্ষণ ছাড়াও 'সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের' কর্মসূচী রেখেছে। যেখানে মা-বোনেরা নিজ গৃহে দ্বীনের তা'লীম নিতে পারেন। তাছাড়া শৈশবে 'সোনামণি' সংগঠনের মাধ্যমে ছোট্টমণিদেরকে শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার জন্য নিয়মিত কর্মসূচীর মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এভাবে শৈশবে তাওহীদের বীজ বপিত ও রোপিত হ'লে পাথরে খোদাই করার মত ঐ শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকবে বলে আশা করা যায়। এরপরে যৌবনে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মসূচী মেনে চলতে হয়।

দ্বিতীয় বাধা– সমাজ :

সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি ও রসম-রেওয়াজ অনেক সময় ইলাহী বিধানের বিরোধী হয়। সেগুলির বিরোধিতা করে আল্লাহ্র বিধান মানতে গেলে সামাজিক বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। এমনকি সমাজনেতাদের রোষ ও সামাজিক বয়কটের শিকার হ'তে হয়। নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকলকেই এই কঠিন সামাজিক বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। যখনই তাঁরা তাদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিয়েছেন, তখনই তারা জওয়াব দিয়েছে, بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি' *(বাক্বারাহ ২/১৭০; মুমিনূন ২৩/২৪; নূহ ৭১/২৩)*। অতএব এই কঠিন বাধা মোকাবিলা করে আল্লাহ্র বিধান পালন করা ও তাঁর দাসত্ব করা অনেক সময় অসম্ভব বিবেচিত হয়। তাকে নানাবিধ অপবাদ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এজন্য চূড়ান্ত নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। তাঁকে 'সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি'র অপবাদ সহ মক্কায় সর্বমোট ১৫ রকমের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। সমাজ তাকে তিন বছর যাবৎ বয়কট করেছে। অবশেষে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।

তৃতীয় বাধা– প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মনেতাগণ :

ধর্মনেতারা সর্বদা নিজেদেরকে ধর্মের প্রতিভূ মনে করেন। নিজেদের মধ্যে ধর্ম না থাকলেও ধর্মের বড়াই থাকে তাদের ষোল আনা। আর একারণেই ইবরাহীম

(আঃ)-এর পিতা ধর্মনেতা 'আযর' স্বীয় পুত্র ইবরাহীমকে বলেছিলেন, أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا– '..হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও? যদি তুমি (এথেকে) বিরত না হও, তাহ'লে অবশ্যই আমি পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি চিরদিনের মত আমার থেকে দূর হয়ে যাও'! *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মদীনার ইহূদী ধর্মনেতারা সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছিল। ধর্মের দোহাই দিয়েই তারা তাদের ধার্মিক লোকদের প্রকৃত ধর্ম ইসলাম থেকে বিরত রেখেছিল। এমনকি আল্লাহ্র রাসূলকে নাজরানের খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের সঙ্গে 'মুবাহালা'র মত কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইসব পথভ্রষ্ট ধর্মনেতারা তাদের অনুসারীদের নিকট 'রব'-এর আসন দখল করেছিল। ইচ্ছামত তওরাত পরিবর্তন করে তারা বলত, এগুলিই আল্লাহ্র বিধান। তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত। ভক্তরা অন্ধভাবে তা মেনে চলত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষের প্রতি মানুষের এই অন্ধ গোলামীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। ফলে ধর্মনেতারা তাঁর জানী দুশমনে পরিণত হয়। অথচ তারা শেষনবী হিসাবে তাঁকে চিনত, যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনত *(বাক্বারাহ ২/১৪৬)*।

বিখ্যাত দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র খ্রিষ্টান গোত্রনেতা 'আদী ইবনু হাতেম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মদীনায় আসেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট মসজিদে নববীতে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমার মূর্তিটা ফেলে দাও। তখন তিনি গলা থেকে ক্রুশ ফেলে দিয়ে নিকটে আসেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবার ৩১ আয়াতটি পাঠ করেন, اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ– এবং ঈসা ইবনে মারিয়ামকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে'। এটা শুনে 'আদী বলে উঠলেন إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা তাদের ইবাদত করি না'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ 'তারা কি ঐ বস্তুকে হারাম করে না যা আল্লাহ হালাল

করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হারাম গণ্য কর এবং তারা কি ঐ বস্তুকে হালাল করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হালাল গণ্য কর'। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৬২]

ইবনু আব্বাস ও যাহহাক বলেন, إِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا– 'ইহূদী-নাছারাদের ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিত এবং লোকেরা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৩]

বস্তুতঃ বর্তমান যুগেও কথিত ধর্মনেতাদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার সামনে মানুষ অন্ধের মত মাথা নীচু করছে। জায়েয-নাজায়েয, সুন্নাত-বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি অনেক সময় হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপর। কখনওবা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনওবা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনওবা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা মারা গেলে একদল লোক তাদের কবর পূজা করছে। তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনা করছে। তাদের কবরে নযর-মানত করছে। সেখানে পয়সা দিয়ে বিপদাপদ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। সেখানে ওরসের জমজমাট মেলা চালু করছে। তাদের কবরগুলিকে সমাধি সৌধ বানিয়ে সেগুলিকে তীর্থস্থানে পরিণত করছে। এভাবে এই সব ধর্মনেতাগণ জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও তাদের ভক্ত অনুসারীদের নিকট রীতিমত 'রব' এর আসনে সমাসীন হয়ে আছেন। এদের রেখে যাওয়া রীতি-নীতি কিংবা তাদের নামে এদের খাদেম ও ভক্তদের চালু করা বেশরা রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে কথা

৬২. তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩।
৬৩. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত ছাপা ১৯৮৬ খৃ.) ১০/৮০-৮১ পৃ. হা/১৬৬৪১, ১৬৬৩০।

বলা রীতিমত মানহানিকর; এমনকি জীবনহানিকর ব্যাপার হয়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহ্র নাম নিয়েই এরা এসব শরী'আত বিরোধী কাজ-কর্ম করে থাকেন। এদের চেহারা-ছূরত ও পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ভক্ত বাহিনী যেকোন সৎসাহসী দ্বীনদার মানুষকে ভীত করার জন্য যথেষ্ট। ফলে এদেরকে ডিঙিয়ে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা জীবনের ঝুঁকি নেবার শামিল। যা নেবার মত লোকের সংখ্যা সর্বদাই কম থাকে। অথচ যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি।

কেবল ধর্মনেতারা নন, রাজনৈতিক নেতারাও আজকাল পূজিত হচ্ছেন মহা সমারোহে। তাদের কবরগুলি এখন রীতিমত তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। সেখানে যেতে না পারায় এদেশে একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পতন ঘটে গেল চোখের পলকে মাত্র কয়েক বছর আগে (২০০২ সালের ২১শে জুন)। মৃত নেতাদের ছবি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তাদের রীতিমত পূজা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি অনেক জীবিত রাজনৈতিক নেতা তাদের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের প্রধান ফটকে নিজেদের প্রতিকৃতি পাথরে খোদাই করে দিচ্ছেন সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের জন্য। তাদের ঘরে ও অফিসে তাদের ছবি সমূহ টাঙানো হচ্ছে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। দেশের সর্বোচ্চ সেনানিবাসে দেশের প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানগণ নিজেদের বানানো 'শিখা অনির্বাণ' বা 'শিখা চিরন্তন' নামক সদা জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে মাথা নত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। যা মজূসী-অগ্নি উপাসকদের অনুকরণ মাত্র। মানুষের যে মস্তক কেবল আল্লাহ্র কাছে নত হবে, সেই উন্নত মস্তক আজ নত হচ্ছে কবরে এবং ছবি-মূর্তি ও আগুনের সম্মুখে। ঐ জাতির উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, যে জাতির মস্তক যেখানে-সেখানে অবনত হয়? রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দেশের অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচলিত সূদী অর্থনীতির ছোবলে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। যথেচ্ছভাবে নেতারা হারামকে হালাল করে যাচ্ছেন। এভাবে ইহূদী-নাছারা নেতাদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর সেদিনের ভর্ৎসনাবাণী আজ মুসলিম নেতাদের হাতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ জাতির পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চলার মধ্যে। যাকে তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত বলা হয়।

চতুর্থ বাধা– রাষ্ট্র :

বিগত যুগে ইবরাহীম (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিলেন ইরাকের সম্রাট নমরূদ। তার লোকেরা বলেছিল, حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। মূসা (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিল মিসরের সম্রাট ফেরাঊন। তিনি তার লোকদের বলেছিলেন, ...وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى '(মূসা ও হারূণ) তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি রহিত করতে চায়' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। তিনি আরও বলেছিলেন, مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 'আমি যা বুঝি সেদিকেই তোমাদের পথ দেখাই। আর আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথেই পরিচালিত করি' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। যাকারিয়া ও তৎপুত্র ইয়াহইয়া (আঃ) নিহত হয়েছিলেন সে যুগের সম্রাট কর্তৃক। ইহূদীদের চক্রান্তে ঈসা (আঃ)-কে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁর যুগের সম্রাট। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে ছাড়াও মোট ১৪ বার গোপনে হত্যাপ্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁর যুগের সমাজনেতারা। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যা বলেনি। বরং তাঁর আনীত কুরআনী বিধানকে অস্বীকার করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ– 'বস্তুতঃ ওরা তোমাকে মিথ্যা বলে না। বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*। এজন্য তারা বলেছিল, ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ 'এই কুরআন বাদ দিয়ে তুমি অন্য কুরআন নিয়ে আস অথবা এটাকে পরিবর্তন করে আনো'। জবাবে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ নির্দেশ দেন, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ– 'তুমি বল যে, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

বস্তুতঃ যুগে যুগে সত্যসেবীদের বিরুদ্ধে এই নীতিই চলে আসছে। মুসলিম উম্মাহর যুগসংস্কারকগণের মধ্যে কঠিন রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়েছে অসংখ্য তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ছাড়াও ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল এবং তাঁদের পরে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী, ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম ও যুগে যুগে তাঁদের অনুসারী যুগসংস্কারক মনীষীগণকে, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।[৬৪]

কিভাবে চাই?

জাতির এই সার্বিক ভাঙ্গন দশা প্রতিরোধ আমরা কিভাবে করতে চাই? **পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবীগণের তরীকায় আমরা এটা চাই।**

---

৬৪. উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৫তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় 'তাবলীগী ইজতেমা'-র দু'দিন পূর্বে ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় রাজশাহীর নওদাপাড়া দারুল ইমারত হ'তে সংগঠনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত, নায়েবে আমীর, সেক্রেটারী জেনারেল ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদককে উপরের নির্দেশের কথা বলে পুলিশ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে অন্যান্য নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। আমীরে জামা'আতের উপর ব্যাংক ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ ও হত্যা সহ মোট ১০টি মিথ্যা মামলা চাপানো হয়। অতঃপর ঢাকা জেআইসিতে ১০+১০=২০ দিন, নওগাঁ ৪ দিন ও সিরাজগঞ্জে ৩+৩=৬ দিন মোট এক মাস রিম্যাণ্ডে রাখা হয়। অতঃপর রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও ঢাকা সহ মোট ৭টি কারাগারে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতের নামে কারারুদ্ধ রেখে তৎকালীন কথিত ইসলামী মূল্যবোধের বিএনপি-জামায়াত চার দলীয় জোট সরকার ইতিহাসের এক বর্বরোচিত ঘৃণ্য অধ্যায় রচনা করে। হাইকোর্টের ডিরেকশন অনুযায়ী ফখরুদ্দীন আহমাদ-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালের ২৮শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব বগুড়া যেলা কারাগার হ'তে আমীরে জামা'আত যামিনে মুক্তি পান। অতঃপর এসব মিথ্যা মামলার ঘানি টানতে হয় ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন। যা শেষ হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ হ'তে ৪ঠা জানুয়ারী ২০১৪) ২০১৩ সালের ২০শে নভেম্বর বুধবার বগুড়া যেলা আদালত হ'তে বেকসুর খালাস পাওয়ার মাধ্যমে।

জানা আবশ্যক যে, বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো উইকিলিক্সের ফাঁস করা রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকার তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস কর্তৃক ২০০৫ সালের ২০শে এপ্রিল বুধবার আমেরিকায় তার সরকারের নিকট মামলার প্রধান বিবাদী মুহতারাম আমীরে জামা'আত সম্পর্কে প্রেরিত গোপন রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, We want him at least 14 years to let this movement die down. 'আমরা চাই তাকে কমপক্ষে ১৪ বছর কারাগারে আবদ্ধ রাখতে। যাতে এই আন্দোলন মরে নিঃশেষ হয়ে যায়' *(দৈনিক ইনকিলাব, ১লা এপ্রিল ২০১২)*। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিভিন্ন পণ্ডিত ও তাদের অনুসারী দলসমূহ স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এর জবাব দিয়ে থাকেন এবং সে অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকেন। পৃথিবীর মানুষ রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের পরীক্ষা নিয়েছে। যদিও তা মানবতার কল্যাণের পরিবর্তে কেবল অকল্যাণই বৃদ্ধি করেছে। লাখ-কোটি মানুষের জান-মাল ও ইযযত লুটিয়েছে। উপরোক্ত মতবাদ সমূহের সার-নির্যাস হ'ল, মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং তার চিন্তাধারা কখনোই আবেগমুক্ত নয়। ফলে উক্ত মতবাদ সমূহের কোনটাই মানুষের স্বভাবধর্মের কাছাকাছি যেতে পারেনি। সেকারণ সবগুলি মতবাদই ব্যর্থ হয়েছে। তবুও স্বার্থবাদীরা এগুলো নিয়ে জেঁকে বসে আছে ছলে-বলে-কৌশলে। সেকারণ আমরা মানব রচিত কোন বিধানের অনুসরণ না করে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানের আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং নবীগণের তরীকায় দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে তথা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবতার বিপর্যয় রোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কেননা আমাদের শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এভাবেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ– 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য হ'তে একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও সুন্নাহ। যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল ' *(জুম'আহ ৬২/২)*।

আমরা আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস মনে করি এবং তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহকে চির সত্য এবং সকল যুগের জন্য পালনযোগ্য ও অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ প্রেরিত প্রতিটি বিধানই সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তার পরিবর্তনকারী কেউ নেই *(আন'আম ৬/১১৫)*। ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুশীলনের মধ্যেই মানবতার মুক্তি নিহিত। এর বাইরে যা কিছুই বলা হবে, তা স্রেফ ধারণা ও কল্পনা এবং যিদ ও হঠকারিতা মাত্র।

মানব রচিত এযাবতকালের সকল মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং এ সবের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর মানুষ এখন উন্মুখ হয়ে আছে মানবতার প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির জন্য। জর্জ বার্নার্ডশ', বার্ট্রাণ্ড রাসেল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, মিঃ

গান্ধী প্রমুখ বিশ্বখ্যাত অমুসলিম দার্শনিক ও রাজনীতিকগণ ইসলামকেই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য একমাত্র বিকল্প হিসাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু আমরা যারা ইসলামের অনুসারী, যাদের দায়িত্ব ছিল জগদ্বাসীর কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার, সেই আমরাই আজ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি।

স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্ব মুসলিমের জন্য আল্লাহ্র একটি অনন্য নে'মত। এখানকার অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার জন্য জন্ম থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কিভাবে সেটা মানবে, তা জানে না। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন অবসানের পর থেকে বিগত ৭১ বছর কেবল নেতার বদল হয়েছে। কিন্তু নীতির বদল হয়নি। ফলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি। বরং দিন দিন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষ এথেকে পরিত্রাণ চায়। কিন্তু কীভাবে পরিত্রাণ পাবে? এক্ষেত্রে চারটি মতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।-

চার ধরনের প্রচেষ্টা :

(১) একদল বিশ্ব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সবকিছুতেই বাইরের সাথে আপোষ করে চলতে চান। তারা ভিতরে ঘা রেখে উপরে মলম দিতে ভালবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছালাত-ছিয়াম- হজ্জ ইত্যাদি পালনেই তাদের ধর্ম-কর্ম সীমাবদ্ধ। কথিত বিশ্বনেতারা সর্বদা এদেরকেই পসন্দ করেন ও এদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসান। এরা নিজেদেরকে 'সেক্যুলার' বলেন। যদিও তারা পুরাপুরি সেক্যুলার নন। তবে ইসলামী বিধান জারি করতে উদ্যোগী না হবার কারণেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তারা 'সেক্যুলার'।

(২) আরেক দল আছেন যারা ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রাজনীতি করেন। কিন্তু প্রচলিত অনৈসলামী রাজনীতির মাধ্যমেই সেটা করতে চান। ফলে লক্ষ্য ইসলাম হ'লেও রাস্তা যেহেতু ইসলামের বিপরীত, সেকারণ তাদের রাজনীতি ও সেক্যুলারদের রাজনীতির মধ্যে শ্লোগানের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা ক্ষমতায় যাবার জন্য এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পর সে আচরণই করেন, যেটা সেক্যুলাররা করে থাকেন। বরং কিছুটা বেশীই করেন। ভোটপ্রার্থী হওয়ার কারণে 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলাই তাদের নীতি। ফলে সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনে তারা অপারগ। কূয়াতে পচা বিড়াল রেখে উপরের পানি সেচাতেই তারা অভ্যস্ত। এরা ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে 'মডারেট' বা পপুলার লকব পেয়ে গেছেন। যদিও সেক্যুলারদের হাতেই তারা সর্বদা পর্যুদস্ত হচ্ছেন। আদর্শচ্যুত হয়ে ইহকাল-পরকাল দু'কুল হারাচ্ছেন।

(৩) তৃতীয় আরেক দল আছেন যারা ইসলাম বলতে তাদের শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জালে ভরা তরীকাকে বুঝেন। মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-

চেহলাম, শবেবরাত-শবেমে'রাজ, কবর-ওরস এগুলিই তাদের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ছূফীবাদের অনুসারী হবার দাবী করে এরা দুনিয়াত্যাগী হিসাবে পরিচিত হতে ভালবাসেন। যদিও ক্ষমতার স্বাদ পাবার জন্য এখন তারা কয়েকটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন ও নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। এদের কাছাকাছি আরেকটি দল আছেন, যারা নিজেদের দাওয়াতকে 'নবীওয়ালা দাওয়াত' বলেন এবং সর্বদা 'রাসূলের তরীকায় শান্তি' বলে থাকেন। অথচ মিথ্যা ফাযায়েলের মোহ ছড়িয়ে স্বচ্ছ মাসায়েল থেকে মানুষকে দূরে রাখেন। সবাইকে খুশী করতে গিয়ে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন থেকে এরা অনেক দূরে। এমনকি তাদের মুখে এখন প্রায়ই শোনা যায়, হাদীছ সবই রাসূলের। এর মধ্যে আবার ছহীহ-যঈফ আছে নাকি? এদের হামলার প্রধান শিকার হলেন ইমাম বুখারী সহ কুতুবে সিত্তাহ্র মুহাদ্দিছগণ এবং শায়েখ নাছেরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছ বেত্তাগণ। কারণ তাদের আচরিত দ্বীনের বেশীর ভাগই ছহীহ হাদীছের আলোকে বিশুদ্ধ নয়। যদিও ধর্মের বাহ্যিক রূপ এদের মধ্যেই বেশী।

(৪) চতুর্থ দলটি হলেন তারাই যারা তাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করতে চান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র দাসত্ব করতে চান। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ঢেলে সাজাতে চান এবং রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সমাজ সংস্কার করতে চান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাঁদেরই দ্বারা পরিচালিত।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা তাদের মূল লক্ষ্য নয়। বরং সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ পরিবর্তনের কঠিন দায়িত্ব পালনে তারা শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী আমীরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে নেকীর উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। ছহীহ হাদীছের আলোকে তারা নিজেদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করেন এবং অন্যকে সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করেন। সরকারের ইসলাম বিরোধী এবং দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ সমূহের তারা প্রতিবাদ করেন। সরকারকে সুপরামর্শ দেন এবং সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। তবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন না। জ্বালাও-পোড়াও, হরতাল-ধর্মঘট ও ভাঙচুর করেন না। সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিরোধী কোন কাজ তারা করেন না। কারণ এতে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারা ক্ষমতা লাভের জন্য দল গঠন করেন না। তার জন্য লড়াই করেন না বা ক্ষমতার জন্য প্রার্থী হন না। এমনকি ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষী হন না। কারণ এগুলি শরী'আতে

নিষিদ্ধ।[৬৫] নেতৃত্ব বা ক্ষমতা আল্লাহ্র দান। যাকে খুশী তিনি এটা দান করে থাকেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য।

তারা মুরজিয়াদের মত আমল-এর ব্যাপারে শৈথিল্যবাদী নন, কিংবা খারেজীদের মত চরমপন্থী ও জঙ্গীবাদী নন। তারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে পূর্ণ মুমিন বলেন না। বরং তারা ফাসেক বা ত্রুটিপূর্ণ মুমিন। তারা তাদেরকে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেন না এবং তাদের রক্তকে হালাল মনে করেন না। তারা মাথা ব্যথা হ'লে মাথা কেটে ফেলতে বলেন না। বরং মাথা ব্যথার ঔষধ খেতে বলেন।

সেক্যুলার, পপুলার ও ছূফী মুসলমানরা বৃটিশের রেখে যাওয়া নীতি ও পদ্ধতির প্রতি আপোষমুখী হওয়ায় তারাই পাশ্চাত্যের সবচাইতে নিকটতম বলে আমেরিকার সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে (RAND 2006)। তাদের মতে সালাফীরাই তাদের একমাত্র বিরুদ্ধবাদী। কারণ তারাই মাত্র বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী এবং তারাই মাত্র জাতীয় ও বিজাতীয় কুসংস্কার সমূহ থেকে দেশবাসীকে পরিশুদ্ধ করতে চায়।

সম্ভবতঃ এ কারণেই বাংলাদেশে আমাদের সংগঠনের উপর যুলুম নেমে এসেছে পাশ্চাত্যের লেজুড় সরকার ও রাজনীতিকদের মাধ্যমে (ফেব্রু'০৫-আগস্ট'০৮)। তারা আমাদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের প্রভাবিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহের মাধ্যমে নানা অপবাদ রটিয়েছে। এখনও মাঝে-মধ্যে কাল্পনিক ও মিথ্যা অপবাদ সমূহ রটিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপর সরকারীভাবে জেল-যুলুম চালানো হয়েছে এবং এখনও কমবেশী চলছে। কিন্তু সত্যিকারের আদর্শনিষ্ঠ ঈমানদার কর্মীরা কখনোই আদর্শচ্যুত হন না এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত বিক্রি করেন না।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করে' *(ছফ ৬১/৪)*। তাই আমরা যত বেশী আদর্শনিষ্ঠ ও জামা'আতবদ্ধ হব, তত বেশী আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত হব এবং আমাদের পথচলা সহজ হবে। এভাবে ধীরে ধীরে জনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে 'তাওহীদে ইবাদত' প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। জনগণের সার্বভৌমত্বের স্থলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে এবং অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত- এই ভ্রান্ত নীতির বিপরীতে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত, এই সত্য নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

---

৬৫. বুখারী হা/২২৬১; ৭১৪৯; মুসলিম হা/১৭৩৩ (১৪-১৫); মিশকাত হা/৩৬৮৩।

এজন্য সকল দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া এবং কপটতা হ'তে মুক্ত হয়ে মানবতার সার্বজনীন কল্যাণের কর্মসূচী নিয়ে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের ঘোষিত চার দফা কর্মসূচী হ'ল : তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও তাজদীদে মিল্লাত। অর্থাৎ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজ সংস্কার। আমরা আমাদের সীমাহীন অযোগ্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে সাধ্যমত সমাজ সংস্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা আমাদের সকল দুঃখ-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকটে পেশ করি। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের অবস্থা দেখছেন ও শুনছেন। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই রহমতের ভিখারী। আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণই আমাদের জন্য যথেষ্ট *(আনফাল ৮/৬৪)*।

পরিশেষে সকলের প্রতি আমাদের একান্ত আহ্বান :

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে যা বলেছিলেন, আসুন! আমরাও সেকথা বলি।-

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি রহম কর! আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমূহ কবুল কর! আমাদেরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার শক্তি দাও- আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

****

প্রশ্নমালা

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কী চায়? কেন চায়? কিভাবে চায়?
২. 'আহ্দে আলাস্ত কী?
৩. পৃথিবীতে কয় ধরনের মানুষ বসবাস করে? তাদের পরিচয় কী?
৪. ইসলামের পথে চলতে প্রধান বাধা কয়টি ও কী কী?
৫. দেশে কয় ধরনের প্রচেষ্টা চালু আছে? সেগুলো কী কী?

সমাজ
বিপ্লবের ধারা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৬ খৃ.
৬ষ্ঠ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২৩ খৃ.

[বিগত ১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবর মোতাবেক ১৩৯৩ সালের ৭ই কার্তিক বুধবার রাজশাহী মহানগরীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে[৬৬] 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৬ উদ্বোধন করতে গিয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন, অত্র পুস্তিকাটি তারই অনুলিপি]।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد..

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৬-তে দেশের বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত নিবেদিতপ্রাণ সাথী ও বন্ধুগণ, রাজশাহী শহর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সুধীবর্গ, প্রশিক্ষক হিসাবে আগত মাননীয় ওলামায়ে কেরাম, বিদ্বান মণ্ডলী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের মাননীয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয়গণ!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৬ উদ্বোধন করতে গিয়ে আমি প্রথমে স্মরণ করছি উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিগত সূর্যগুলিকে। স্মরণ করছি অলিউল্লাহ-পরিবার[৬৭]-কে।

---

৬৬. উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩৮৪ সালের ২৩শে মাঘ রবিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী (বর্তমানে ৭৯/ক/১, ঢাকা-১২০৪), ছিল সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস। ১৯৮০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি যাত্রাবাড়ী থেকে চলে এলে কেন্দ্রীয় ঠিকানা হয়, মাদ্রাসাতুল হাদীছ, ৯৪ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১। অতঃপর ১৯৮৪ সালের ৩০শে মে রাজশাহীতে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হ'লে ঠিকানা হয় রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা)। অতঃপর ১৯৯৬ সালের ১৯শে মে হ'তে অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় ঠিকানা হ'ল আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।

৬৭. অলিউল্লাহ-পরিবার বলতে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী ও তাঁর চার পুত্র ও পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদসহ মোট বারো জনকে বুঝানো হয়। শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.), তৎপুত্র শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪), শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৮), শাহ আবদুল ক্বাদের (১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮), শাহ আবদুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮২৪) এবং তাঁর পুত্র শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)। জিহাদ আন্দোলনের এই মহান সিপাহসালার ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্নে বর্তমান পশ্চিম পাঞ্জাবের বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন।

স্মরণ করছি শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হোসায়েন দেহলভী,[৬৮] নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী[৬৯] ও তৎপরবর্তীকাল হ'তে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইল্‌মে কুরআন ও ইল্‌মে হাদীছের অতন্দ্র প্রহরীগণকে, সেই অতুলনীয় শিক্ষকবৃন্দকে; স্মরণ করছি বালাকোটের অমর শহীদানকে; স্মরণ করছি কালাপানির বীর কয়েদীগণকে।

স্মরণ করছি আফগানিস্তান হ'তে শুরু করে বাংলার বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র এলাকার শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সেই জানা-অজানা বীর মুজাহেদীনকে, যাঁদের ত্যাগপুত ইতিহাস আমাদের যাত্রাপথে প্রতিনিয়ত প্রেরণা যোগায়; উৎসাহ যোগায় সম্মুখে এগিয়ে যাবার। যাঁদের রক্তঋণ কিছুটা আদায়ের উদ্দেশ্যেই আমরা বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক তরুণ আজ এখানে জমায়েত হয়েছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের মহান পূর্বসূরীগণের, আমাদের মহান সালাফে ছালেহীনের যথার্থ উত্তরসূরী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৬৮. সাইয়িদ নাযীর হোসায়েন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২)। দিল্লীর মাদ্রাসা রহীমিয়ার এই স্বনামধন্য মুহাদ্দিছের দীর্ঘ ৭৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ১ লক্ষ ২৫ হাযার ছাত্রের মধ্যে ৮০ হাযারই আহলেহাদীছ হয়ে যান। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে এই মহান শিক্ষকের অবদান ছিল সর্বাধিক। বিহারের মুঙ্গের যেলার অন্তর্ভুক্ত গঙ্গা তীরবর্তী সূর্যগড়ের অনতিদূরে বালথোয়া নামক গ্রামে জনৈক হানাফী আলেম মৌলবী জাওয়াদ আলীর ঔরসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তারা সূর্যগড়ে বসবাস করেন। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার প্রতি নযর দেননি। একদিন তাদের পরিবারের সুহৃদ জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেন, হে নযীর! তোমাদের বংশের সবাই মৌলবী। অথচ তুমি জাহিল হয়ে রইলে? ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্য তরুণ নযীর হোসায়েনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফলে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের এক রাতে তিনি গোপনে পাটনা আযীমাবাদ চলে যান। সেখানে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর পক্ষকালব্যাপী ওয়ায শুনে তাঁর মধ্যে হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনা জেগে ওঠে। ফলে তিনি হাদীছ শিক্ষার জন্য দিল্লীতে গমন করেন। অতঃপর শিক্ষা ও কর্মজীবনের দীর্ঘ ৮০ বছর তিনি দিল্লীতে অতিবাহিত করেন ও সেখানেই ১৩২০ হিজরীর ১০ই রজব মোতাবেক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সোমবার বাদ মাগরিব মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন শীদীপুরা গোরস্থানে স্বীয় পুত্রের কবরের পাশে তিনি সমাহিত হন *(দ্র. থিসিস ৩২০-২২, ৩৩৯-৪৩ পৃ.)*।

৬৯. তৎকালীন ভারতের ভূপাল রাজ্যের নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০) জীবনের তিন চতুর্থাংশ দারিদ্র্যের কষাঘাতে এবং চৌদ্দ বছর রাজ্য পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব পালন করেও মাত্র ৫৮ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় অন্যূন ২২২ খানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। মিসর থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহ ছাপিয়ে এনে সারা ভারতে বিতরণ করেন। এইভাবে লুপ্তপ্রায় ইলমে হাদীছ ও হাদীছ ভিত্তিক ইসলামকে তিনি পুনরায় লেখনীর মাধ্যমে জাগিয়ে তোলেন *(দ্র. থিসিস ৩৪৪-৬১ পৃ.)*।

পরিস্থিতির মূল্যায়ন

বন্ধুগণ!

বর্তমান কম্পিউটার যুগে বিশ্বের পরিধি একেবারেই ছোট হয়ে গেছে। পৃথিবী নামক সৌরমণ্ডলের এই ছোট্ট গ্রহটিকে যদি একটি ছোট্ট পুকুরের সঙ্গে তুলনা করি, তাহ'লে এর এক প্রান্তে একটা ঢিল পড়লেও অপর প্রান্তে গিয়ে তার ঢেউ লাগে। তাই নিজের দেশের পরিস্থিতিকে আর বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আশান্বিত বিশ্বকে হতাশ করে জাগতিক শক্তিতে বলিয়ান বর্তমান বিশ্বের দুই পরাশক্তি আয়োজিত রিগ্যান ও গর্বাচেভ-এর 'রিকজাভিক বৈঠক' দুঃখজনক ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।[৭০] আর এর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে পাশ্চাত্যের মানবিক দেউলিয়াত্ব। অগণিত মারণাস্ত্রের গুদাম ছাড়া, বস্তুগত পাশবশক্তি ছাড়া মানবতার সামনে পেশ করার মত তাদের নিকটে কোন মূল্যবোধ আর অবশিষ্ট নেই। ফলে এক্ষণে শুরু হয়েছে দুই পরাশক্তির দেশী-বিদেশী ও আমাদের স্বদেশী এজেন্টদের পারস্পরিক দোষারোপের পালা। শুরু হয়েছে ছাফাইয়ের মহড়া। এদের প্রচার যন্ত্রগুলো প্রাণান্ত কোশেশ অব্যাহত রেখেছে নিজেদের ভিতরকার দৈন্যদশা ঢাকবার জন্য। ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখা-নাঙ্গা মানুষ যারা নিরাপদ অবস্থানে থেকে দূর থেকে এই মহড়া অবলোকন করছে, তাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গেছে এই সব তন্ত্রমন্ত্রের হোতাদের নগ্ন চেহারা। সারা বিশ্ব এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে ইসলামের দিকে। আল্লাহ প্রেরিত হেদায়াতের দিকে।

বন্ধুগণ!

আমাদের দেশসহ সমগ্র বিশ্ব আজ সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। এ জাহেলিয়াত সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং

---

৭০. আইসল্যাণ্ডের রিকজাভিক (REYKJAVIK) নগরীতে ১৯৮৬ সালের ১১, ১২ ও ১৩ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ও সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ-এর মধ্যে দূর ও মাঝারি পাল্লার অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির উদ্দেশ্যে তিনদিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অবশেষে এই বৈঠক ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য উভয় প্রেসিডেন্ট একে অপরকে দোষারোপ করে বক্তব্য রাখেন *(বাংলাদেশ অবজারভার ১৪ই অক্টোবর ১৯৮৬)*।

কতিপয় মানুষকে মানুষের জন্য রব-এর আসনে বসিয়েছে। বস্তুবাদী শক্তিগুলি তাদের স্ব স্ব দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক প্রভুদেরকে উক্ত মর্যাদা দিয়েছে। ধর্মীয় শক্তিগুলিও স্ব স্ব ধর্মনেতাদেরকে নামে- বেনামে উক্ত আসনে বসিয়েছে।

ঠিক এমনই পরিস্থিতি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালে। বলতে গেলে প্রায় সারা বিশ্ব তখন রোমক ও পারসিক দুই পরাশক্তির করতলগত ছিল। মানুষ এদেরকেই আল্লাহ্র ছায়া[৭১] ভেবে নিয়েছিল। এই সুযোগে এরা ছিনতাই করে নিয়েছিল সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি। জনগণকে তারা তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহার করত- যেমন আজও সর্বত্র করা হচ্ছে।

তৎকালীন ধর্মীয় নেতাদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তাঁরা যা বলতেন, জনগণ সেটাকেই 'দ্বীন' ভেবে নিত। জগদ্বিখ্যাত দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র 'আদী বিন হাতেম তৎকালীন সময়ে ত্বাঈ গোত্রের নেতা ও বিখ্যাত খ্রিষ্টান পণ্ডিত ছিলেন। স্বীয় ভগিনী ও সম্প্রদায়ের লোকদের উৎসাহে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলেন, তখন তাঁর গলায় স্বর্ণ খচিত ক্রুশ (+) ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। তখন তিনি ফেলে দিলেন। অতঃপর তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনে হাকীম-এর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ- (التوبة ٣١)-

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবাহ ৯/৩১)*।

---

৭১. যেমন জুম'আর খুৎবায় বলা হয়ে থাকে, السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللهُ- 'সুলতান বা শাসক পৃথিবীতে আল্লাহ্র ছায়া স্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁকে সম্মান করল, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি তাঁকে অসম্মানিত করল, আল্লাহ তাকে অসম্মানিত করবেন'। হাদীছটির প্রথমাংশ অর্থাৎ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ অংশটি মুনকার ও যঈফ *(আলবানী, যঈফাহ হা/১৬৬১-৬৪)*। শেষাংশটি 'হাসান' *(তিরমিযী হা/২২২৪; ছহীহাহ হা/২২৯৭)*।

উক্ত আয়াত শোনার পর 'আদী বিন হাতেম বলে উঠলেন, إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা তাদের ইবাদত করি না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ 'আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা কি তা হারাম করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম করেছ। আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা কি তা হালাল করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল করেছ। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'বেশ ওটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।

ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে মানুষের 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন'।[৭২]

দেড় হাযার বছর পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও চলছে সারা বিশ্বে নামে-বেনামে আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনতাইয়ের মহড়া। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জনগণের নামে সার্বভৌম ক্ষমতা লুট করে তা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেছে। জনগণের শাসনের নামে তারা দলের শাসন চালায়। আর দলের নামে

---

৭২. পুরা বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ عُنُقِىْ صُلَيْبٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا عَدِىُّ إطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ قَالَ: فَطَرَحْتُهُ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِىْ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ – رواه ابن جرير فى تفسيره واللفظ لحديث ابى كُرَيْب– قال ابنُ عباس رضي الله عنه: أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَابًا– وقال الضحاك يعني: سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ– *(তাফসীর ইবনু জারীর ত্বাবারী (বৈরূত ছাপা : ১৯৮৬), হা/১৬৬৩২, ১৬৬৪১, ১৬৬৩০; ১০/৮০-৮১ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩০৯৫ হাদীছ হাসান; বায়হাক্বী ১০/১১৬ পৃ., হা/২০৮৪৭)*।

তারা নেতার শাসন চালায়। গণ আদালতের দোহাই পেড়ে তারা আল্লাহ্র আদালতে জওয়াবদিহিতাকে এড়াতে চায়। তারা তাদের ইচ্ছামত আইন তৈরী করে ওটাকেই জনগণের আইন বলে চালিয়ে দেয়।

অন্যদিকে ধর্মনেতারা নিজেদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার নিকট শরী'আতের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। জায়েয ও নাজায়েয, সুন্নাত ও বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপরে। কখনওবা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনওবা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনওবা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রচলিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও মাযহাবী তাক্বলীদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নামীয় বিভেদাত্মক জাহেলী মতবাদের খপ্পরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। পার্লামেন্টে 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' এবং 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'- ইলাহী সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ এই দুই শেরেকী মন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েই এরা রাজনীতিতে নেমেছেন। এরা 'আল্লাহ' এবং 'ইসলামের' নামেই জনগণের নিকট ভোট চাইছেন। এদের ভোট না দেওয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া বলে গণ্য করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়- বহু দলে বিভক্ত এইসব রাজনীতিকরা প্রত্যেকেই ভাবেন, তার দলটিকে ভোট দিলেই কেবল এদেশে সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, নইলে নয়।

ট্রাজেডী এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের শিরকী বিষবৃক্ষের ফল খেয়েই এঁরা রাজনীতি করছেন এবং সেখানে ইসলামকে ব্যবহার করছেন। প্রশ্ন করলে বলা হয় 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কখনো কখনো শিরককেও বরদাশত করা চলে' (নাঊযুবিল্লাহ)। আল্লাহ্র নিকট ঐসব যুক্তিবাদীরা কি কৈফিয়ত দিবেন সে প্রশ্ন না রেখেও একথা হলফ করে বলা চলে যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লব কেবলমাত্র ইসলামী তরীকার মাধ্যমেই সম্ভব, পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা শিরকী তরীকার মাধ্যমে নয়।

বন্ধুগণ! হতাশায় মুহ্যমান বিশ্ব যখন ইসলামের দিকে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তখন আমাদের উপরোক্ত অবস্থা কি দুঃখজনক নয়?

ইসলামের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব

এমত পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি যে, ইসলামের পুনরুজ্জীবন একমাত্র সেপথেই সম্ভব, যে পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগিয়েছিলেন। তিনি প্রথমেই রোগীর আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে ঔষধ প্রয়োগ করেননি। বরং রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করে সেখানেই চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়ে অথবা চরিত্র সংশোধনের আন্দোলন থেকে কাজ শুরু করেননি কিংবা দেননি আরব জাতীয়তাবাদের মুখরোচক শ্লোগান। কারণ সত্যিকারের সামাজহিতৈষী হিসাবে তিনি চাননি যে, আল্লাহ্র বান্দাগণ তৎকালীন রোমান বা ঈরানী আগ্রাসন হ'তে মুক্তি লাভ করে পুনরায় আরবীয় প্রভুদের মরণ থাবার শিকারে পরিণত হৌক।

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমস্যা সমূহের গোড়া ধরেই টান দিলেন এবং স্থায়ী সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে আক্বীদা পরিবর্তনের আন্দোলন শুরু করলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুটিকতক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভু যেভাবে স্বাধীন মানুষকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছিল, সেই ছিনতাইকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা নিরংকুশভাবে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করার আহ্বান জানালেন। ঘোষণা করলেন- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'*। 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। বলা বাহুল্য লা ইলা-হা ইল্লাল্লহ্র এই কালেমা সেদিন কেবল শ্লোগান মাত্র ছিল না। বরং এ ছিল সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা।

আরবরা আল্লাহ্কে জীবন-মৃত্যুর মালিক হিসাবে, সন্তানদাতা হিসাবে, রূযীদাতা হিসাবে মানতো। অনেকে আখেরাতে জওয়াবদিহিতায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঐ একই হেদায়াতের জ্যোতিধারা থেকে আলো নিতে হবে, এ কথা তারা মানতে রাযী ছিল না। তারা ভাবতো এসব ক্ষেত্রে আমরাই ইলাহ। ফলে শুরু হ'ল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সরাসরি দ্বন্দ্ব।[৭৩]

৭৩. এবিষয়ে মাননীয় লেখক অনূদিত 'ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব' বইটি পাঠ করুন।

জাহেলিয়াতের শিখণ্ডীরা আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-কে নেতৃত্বের টোপ দিল। অর্থ-সম্পদের লোভ দেখাল। আরও অন্যান্য লোভনীয় প্রস্তাব দিল। কিন্তু তিনি টললেন না। সমস্ত নিন্দা-অপবাদ ও বাধার ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তিনি সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আক্বীদা সংশোধনের আন্দোলন চালাতে থাকলেন। ফলে দীর্ঘ তের বৎসরের মাক্কী জীবনে তৈরী হ'লেন এমন কিছু মর্দে মুজাহিদ তাযা সৈনিক, যারা সমাজ পরিবর্তনের কঠিন জিহাদে প্রত্যয়দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। যারা শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাময়িক কোন সমস্যা নিয়ে নয় বরং সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যে ধীর অথচ দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে পারেন।

ফলাফল সবারই জানা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে খেলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগে যে অনুপম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একথা বুঝা গেল যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল দু'টি।-

(১) প্রথমে আক্বীদায় বিপ্লব আনা (২) নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদায় বিশ্বাসী নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী কর্মীদের একটি জামা'আত গঠন করা।

খেলাফতে রাশেদার আদর্শ পুনরায় কেন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি?

ছাহাবায়ে কেরামের পর বিভিন্ন কারণে ঐ ধরনের জামা'আত আর তৈরী হ'তে পারেনি। ফলে প্রকৃত ইসলামী সমাজ পুনরায় কায়েম হয়নি। তার প্রধান কারণ হিসাবে আমরা তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারি। **(১) তাওহীদী আক্বীদা দুর্বলকারী বিভিন্ন অনৈসলামী দর্শনের অনুপ্রবেশ। (২) ঈমান ও আমলের মধ্যে ঐক্যতান শিথিল হওয়া (৩) জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষকামিতা।**

সমাজ বিপ্লবের ধারা

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা হ'ল তিনটি : **(১) মূল তাওহীদকে উপলব্ধি করা।** এর মাধ্যমে প্রথমে সমাজের আক্বীদা সংশোধনে ব্রতী হওয়া এবং নির্ভেজাল ইসলামের দিকে ফিরে যাওয়া- যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ হ'তে উৎসারিত। **(২) ঈমান ও আমলের বৈপরীত্য দূর করা।** এজন্য বাস্তব

অনুভূতি নিয়ে কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন করা। **(৩) জাহেলিয়াতের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা।** অর্থাৎ জীবনের কোন ক্ষেত্রে তাওহীদ ও কোন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াত এরূপ দ্বিমুখী নীতির অনুসারী হওয়া যাবেনা।

অতএব জাহেলিয়াতের অনুসারী ব্যক্তি যদি নিজের বাপ-ভাই-সন্তান বা আত্মীয়-স্বজনও হয়, তথাপি তাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আল্লাহ্র কঠোর নির্দেশ পাঠ করুন সূরা মুজাদালাহ্র শেষ আয়াতে।

বর্ণিত তিনদফা কর্মপন্থাকেই আমরা ইসলামী সমাজ বিপ্লবের তিনটি ধারা হিসাবে গণ্য করতে চাই।

ধারাগুলির ব্যাখ্যা

আসুন! আমরা সমাজ বিপ্লবের উপরোক্ত তিনটি ধারার উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। প্রথম ধারাটি হ'ল তাওহীদের সঠিক উপলব্ধি।

তাওহীদ তিন প্রকার : তাওহীদে রুবূবিয়াত (পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব), তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব) এবং তাওহীদে উলূহিয়াত (আল্লাহ্র ইবাদতে একত্ব)। এই তিন প্রকারের তাওহীদের মধ্যে জাহেলী যুগের আরবরা কমবেশী প্রথম দু'প্রকারের তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, 'খালেক্ব' ও 'রাযযাক্ব' হিসাবে বিশ্বাস করত। অনেকে আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। তারা নিজেদের নাম 'আব্দুল্লাহ' 'আব্দুল মুত্ত্বালিব' প্রভৃতি রাখত। এতদসত্ত্বেও তারা 'মুসলিম' ছিল না এই কারণে যে, তাদের মধ্যে 'তাওহীদে উলূহিয়াত' ছিল না। তারা 'অসীলাপূজায়' বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির মূর্তি তৈরী করে তাদের নিকট নযর-নেয়ায পেশ করত। আল্লাহ্র ঘর কা'বা গৃহের বাইরে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে আল্লাহ্র কোন হেদায়াত থাকতে পারে, একথা তারা মানতে রাযী ছিল না। এরা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক একজন নেতাকে 'ইলাহ'-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরই বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক শ্লোগান উচ্চারণ করেন- *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)। এখানে আল্লাহকে মানবার আগে 'গায়রুল্লাহ'কে বর্জনের কথা বলা হয়েছে। আর এ কারণেই পূণ্য অর্জনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল পাপ বর্জন করা।

দুর্ভাগ্য এই যে, জাহেলী আরবরা আল্লাহ্কে মানতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু গায়রুল্লাহকে ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। পূণ্য অর্জনের আকাংখা ছিল, কিন্তু পাপ বর্জনে তারা রাযী ছিল না।

'তাওহীদ' সম্পর্কে বাংলাদেশের বর্তমান মুসলমানদের অধিকাংশের ধারণা জাহেলী আরবদের ধারণার সাথে যে অনেকাংশে মিল আছে, তা আশা করি কারও বুঝতে বাকী নেই। আমরা 'বায়তুল মোকাররমে' গিয়ে আল্লাহকে সিজদা করি। আবার 'সংসদ ভবনে' গিয়ে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী হই। 'মাযারে' গিয়ে অসীলাপূজারী হই। আমাদের নামও আব্দুল্লাহ-আব্দুল মুত্ত্বালিব। আরবের মুশরিকরা যে নিয়তে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির কাছে যেত, আমরাও একই নিয়তে নিজেদের হাতে গড়া মাযার ও খানক্বাহে যাই। তারা তাদের বৈষয়িক ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন আইন মানতো না। আমরা আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন হেদায়াত মানতে চাই না। আমরা কালেমার যিকর করে বা জুম'আ-জামা'আতে হাযির হয়ে ভেবে নেই জান্নাত পাব। অথচ ইসলামের সকল হুকুম মানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র যাকাত জমা করতে অস্বীকার করায় আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কারণ ইসলামের অর্থনৈতিক বিষয়টিকে তারা অমান্য করেছিল। তাদের ছালাত-ছিয়াম কোন কাজে লাগেনি তাওহীদের মৌলিক বিশ্বাসে খুঁত থাকার কারণে।

আমাদের সমাজকে সর্বপ্রথমে তাই তাওহীদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মুসলিম জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকেই হেদায়াত নিতে হবে। আর সে হেদায়াত সঞ্চিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে, অন্য কোথাও নয়। আমাদেরকে সকল ব্যাপারে কেবলমাত্র ঐ দুই পবিত্র উৎস থেকেই আলো নিতে হবে।

প্রথম ধারাটি সম্পর্কে স্পষ্ট বুঝ হাছিল হয়ে গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা না দিলেও চলে। কারণ দুর্বল আক্বীদার লোক দ্বারা কখনও বিপ্লব হ'তে পারে না। আর বাতিলের সঙ্গে আপোষকামী ব্যক্তি কখনো হকপন্থী হ'তে পারে না। জাহেলী সমাজে বসবাস করেও নবীগণ কখনো জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষ করেননি।

মুক্তির একই পথ- দাওয়াত ও জিহাদ

বন্ধুগণ!

সমাজ বিপ্লবের উপরোক্ত তিনটি ধারা প্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে নিজেকে আদর্শ নমুনা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু একাজ একেবারে নির্বিঘ্নে সম্ভব হবে না। যখনই উক্ত তিনটি ধারার দিকে আপনি জনগণকে দাওয়াত দিবেন এবং তা কায়েম করতে প্রয়াসী হবেন, তখনই আপনার সমাজ এমনকি আপনার পরিবার আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে। বরং বলা যেতে পারে যে, জাহেলিয়াত তার সমগ্র হাতিয়ার নিয়ে আপনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় আপনাকে তিনটি বস্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে।- **(১) নিজেকে সব সময় জাহেলিয়াতের ময়দানে যুদ্ধরত সৈনিক মনে করা। (২) শাহাদাত পিয়াসী সৈনিকের বাঁচার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা। (৩) নিজের কর্ম ও আচরণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া।** আল্লাহ্র ঘোষণা শুনুন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ- (آل عمران ١٤٢)-

'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো (প্রমাণ সহ) জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল'? *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*।

'জিহাদ' অর্থ আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। 'শহীদ' অর্থ আল্লাহ্র পথে নিহত অথবা মৃত্যুবরণকারী মুমিন। জিহাদ মুমিনের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। যেখানেই সে অন্যায় দেখবে, সেখানেই সে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবে। জিহাদকে বাদ দিয়ে মুমিন হিসাবে এ জগতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জিহাদ ও জিহাদের নিয়ত চিরদিন বাকী থাকবে'।[৭৪] শয়তানের আয়ু ক্বিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ। অতএব যতদিন শয়তান থাকবে, ততদিন তার বিরুদ্ধে জিহাদ থাকবে। জিহাদ থেকে যিনি পিছিয়ে যাবেন কিংবা অলসতা প্রদর্শন করবেন, তিনি শয়তানের সঙ্গে মিতালী করবেন এবং আল্লাহ্র গযবের শিকার হবেন। আল্লাহ বলেন,

---

৭৪. বুখারী হা/৩১৮৯, ২৭৮৩; মুসলিম হা/১৩৫৩, ১৮৬৪; মিশকাত হা/২৭১৫।

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اِسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ- قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ، (التوبة ٢٣-٢٤)-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালংঘনকারী’। ‘বলে দাও, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, স্বগোত্র ও ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর, ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হবার আশংকা কর এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা ভালোবাস- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় হয়, তাহ’লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(তওবাহ ৯/২৩-২৪)*।

জিহাদের প্রকৃতি

বর্তমানে ‘জিহাদ’ এবং ‘শহীদ’ শব্দ দু’টি স্থানে-অস্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক দলই নিজেদের দলীয় স্বার্থে কাজ করাকে ‘জিহাদ’ ভাবেন এবং অপর দলের হাতে নিহত হ’লে তাকে ‘শহীদ’ বলে আখ্যায়িত করেন। আসুন, এ বিষয়ে আমরা ২য় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট থেকে জওয়াব নিই। একদা এক খুৎবায় ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ تَقُولُونَ فِي مَغَازِيكُمْ فُلاَنٌ شَهِيدٌ وَمَاتَ فَلاَنٌ شَهِيدًا... أَلاَ لاَ تَقُولُوا ذَلِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ- ‘কেউ যুদ্ধে নিহত হ’লে বা কেউ মারা গেলে তোমরা বলে থাক যে, ‘অমুক লোক শহীদ হয়ে গেছে’। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বল যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হ’ল সে শহীদ এবং যে আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল

সে শহীদ'।[৭৫] কেননা কোন্ ব্যক্তি কোন্ নিয়তে জিহাদ করেছে, সে খবর একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন। খালেছ আল্লাহ্র ওয়াস্তে জিহাদ হওয়াটাই এখানে বড় কথা। দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয়।

অতঃপর জিহাদ সম্পর্কে 'মুমিনের সংগ্রাম রাজনৈতিক নয় বরং আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম'- প্রসঙ্গে সাইয়িদ কুতুব বলেন,[৭৬]

'ঈমানদারগণ ও তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে যে সংগ্রাম অবিরতভাবে চলছে, এটা স্রেফ আক্বীদার সংগ্রাম, আদৌ অন্য কিছু নয়। তাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয় স্রেফ ঈমানের কারণে। তারা তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয় স্রেফ আক্বীদার কারণে। এটি কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয় বা কোন জাতি-গোষ্ঠীগত সংগ্রাম নয়। যদি এসবের সামান্য কিছুও হ'ত, তাহ'লে তা মিটানো সম্ভব হ'ত এবং তার সমাধান সহজ হ'ত। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এটি হ'ল আক্বীদা-বিশ্বাসের সংগ্রাম। হয় কুফর থাকবে, নয় ঈমান থাকবে। হয় জাহেলিয়াত থাকবে, নয় ইসলাম থাকবে'।[৭৭]

---

৭৫. ফাৎহুল বারী 'এ কথা বলা হবে না যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ' অনুচ্ছেদ, হা/২৮৯৭-এর পরে; আহমাদ হা/২৮৫, ১০৭৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৯১০; মুসলিম হা/১৯১৫, মিশকাত হা/৩৮১১; ।

৭৬. বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هى فى صحيحها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق وان خصومهم لاينقمون منهم الا الايمان ولايسخطون منهم الا العقيدة- انها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها ولكنها فى صحيحها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام- معالم فى الطريق، ط-بيروت ١٩٨٣ ص ٢٠١-

৭৭. সাইয়েদ কুতুব, মা'আলিম ফিত ত্বরীক্ব (বৈরূত ছাপা : ১৯৮৩), ২০১ পৃ.।
এর অর্থ এটা নয় যে, কোন ঈমানদার ব্যক্তি কখনো কবীরা গোনাহ করবে না। করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার রক্ত হালাল হবে'। কেননা এরূপ চরমপন্থী আক্বীদা হ'ল ভ্রান্ত ফিরক্বা খারেজীদের আক্বীদা। যারা ৪র্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল তিনি প্রতিপক্ষ মু'আবিয়া (রাঃ)-কে কাফের বলেননি বলে। এই চরমপন্থা আক্বীদার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে *(মুসলিম হা/১০৬৪ (১৪৭-৪৮), হা/১০৬৬ (১৫৫)*। আধুনিক যুগে অনুরূপ আক্বীদার লোকদেরকে বিদ্বানগণ *'জামা'আতুত তাকফীর'* (جماعة التكفير) অর্থাৎ 'কবীরা গোনাহগারদের কাফের অভিহিতকারী দল' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এরূপ চরমপন্থী আক্বীদার ফলে যিনি মারছেন ও যিনি মরছেন, উভয়ে মুসলমান। আর এটাই তো শয়তানের পাতানো ফাঁদ, যেখানে তারা পা দিয়েছেন। বস্তুতঃ পাকিস্তানের মাওলানা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.) ও মিসরের সাইয়িদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬) ছিলেন উক্ত আক্বীদারই অনুসারী *(দ্র. 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই, ২য় সংস্করণ ৫২-৫৫ পৃ.)*।

বন্ধুগণ!

নবীগণের ইতিহাস স্মরণ করুন। তারা কারো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে ভাগ বসাতে যাননি। তাঁদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসনশক্তিকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি। তাহ'লে কেন তখনকার সমাজ সর্বশক্তি নিয়ে তাঁদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? কেন তাঁদেরকে বেঁধে করাতে চিরে হত্যা করেছিল? কেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত নিক্ষেপ করেছিল? কেন আমাদের নবী (ছাঃ)-কে দেশ ছাড়তে হয়েছিল? কেন 'আছহাবুল উখদূদ'-এর কয়েক হাযার ঈমানদার নর-নারীকে একই দিনে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ'ল?

জওয়াব আল্লাহ্র কাছ থেকেই নিন- وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ– 'তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহাপরাক্রান্ত ও মহাপ্রশংসিত আল্লাহ্র উপরে' *(বুরূজ ৮৫/৮)*।

বলাবাহুল্য ঈমান ও কুফর, ইসলাম ও জাহেলিয়াত কখনো একত্রে বাস করতে পারে না। বর্তমানে মুসলিম সমাজে ব্যাপক অধঃপতনের মূল কারণ হ'ল জিহাদবিমুখতা। আর জিহাদবিমুখতার প্রধান কারণ হ'ল আপোষ কামিতা। তথাকথিত 'হেকমতের' দোহাই পেড়ে সর্বত্র জাহেলিয়াতের সঙ্গে আমরা আপোষ করে চলেছি। কি আলেম কি সমাজনেতা সবাই যেন আমরা একই রোগে ভুগছি। আমরা আপোষ করেছি ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'তাক্বলীদে শাখছী'র সাথে, যা কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসরণের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা। আমরা আপোষ করেছি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে- যা ইলাহী সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা আপোষ করেছি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে, যা ইসলামী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা আপোষ করেছি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনৈসলামী রসম-রেওয়াজের সঙ্গে, যা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক।

বন্ধুগণ!

আমাদেরকে অবশ্যই আপোষকামী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। যেমন করেছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর মাক্কী জীবনে। জাহেলী সমাজে বসবাস করেও তিনি জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষ করেননি। সমাজ তাঁকে বয়কট করেছে। তাঁর জন্য বাজার নিষিদ্ধ করেছে। গাছের ছাল-পাতা খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করেছেন। তথাপি সমাজের সঙ্গে আপোষ করেননি। মর্মান্তিক অগ্নি পরীক্ষা সত্ত্বেও আপোষ করেননি পিতা ইব্রাহীম (আঃ) তৎকালীন সমাজ ও

সরকারের সাথে। শুধু ইব্রাহীম কেন দুনিয়ার সকল নবীর ইতিহাস জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদের ইতিহাস। কোন নবীই স্বীয় জীবনে স্বীয় সমাজে মেজরিটির সমর্থন পাননি। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন কোন কোন নবী একজন উম্মত বা উম্মত শূন্য অবস্থায় উঠবেন।[৭৮]

সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না পাওয়ার অর্থ কি তাঁরা বাতিলপন্থী ছিলেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। তাঁরা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার লড়াই করেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন আল্লাহ্র পাঠানো অভ্রান্ত সত্যকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে। হক-এর আওয়াযকে বুলন্দ করতে। সত্যকে সত্য হিসাবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করতে।

আমাদেরকেও নবীগণের পথ বেছে নিতে হবে। সে পথ ভোটারের মনস্তুষ্টির পথ নয়, সে পথ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ। সে পথ শুধু চেয়ার পরিবর্তনের পথ নয়, সে পথ সমাজ পরিবর্তনের পথ, সমাজ বিপ্লবের পথ, আপোষহীন জিহাদের পথ।

জিহাদের হাতিয়ার

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের তাৎপর্য চিরকাল একই থাকবে। তবে জিহাদের মাধ্যম সর্বদা পরিবর্তনশীল। অসিযুদ্ধ এখুনি নয়। মসীযুদ্ধ অসির চাইতে শক্তিশালী। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.)-কে জেলখানায় আটকে রেখেও সরকার নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে তাঁর কাগজ-কলম কেড়ে নিয়েছিল। বাধ্য হয়ে জেলখানার বাবুর্চির সৌজন্যে কিছু কয়লা সংগ্রহ করে তাই দিয়ে নিজ কক্ষের দেওয়াল কুরআন ও সুন্নাহ্র কালি দিয়ে আলোকিত করেছিলেন। অবশেষে জেলখানাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাতিল শক্তিগুলি যে সব হাতিয়ার নিয়ে হক-কে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টায় রত, আমাদেরকে ওহোদের ময়দানের ন্যায় বাতিলের হামলার সেসব অলি-গলিতে সতর্ক প্রহরা বসাতে হবে। এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হ'ল তিনটি : কথা, কলম ও সংগঠন। আপনাকে অবশ্যই কথা বলা শিখতে হবে। যদি 'টেবিল টক'-এ পটু হন, সেটা করুন। যদি স্টেজ-এর বক্তৃতায় পারঙ্গম হন, তবে তাই করুন। ইল্মের ডিপো হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দাওয়াত দিন। মানুষের নিকট হক-এর আহ্বান পৌঁছে দিন। যে কোন সমস্যায় কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান নিন। দ্বীনের ব্যাপারে কপোল কল্পিত কোন কথা বলবেন না। কুটতর্কে জড়াবেন না।

---

৭৮. বুখারী হা/৫৭৫২; মুসলিম হা/২২০; মিশকাত হা/৫২৯৬ 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।

লিখুন। আপনার লেখা মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানুক। সেখানে ঝংকার উঠুক। সমাজ বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠুক। ঘুণে ধরা আক্বীদায় পরিবর্তন আসুক। আপনার বই ছিঁড়ে ফেলুক, দুঃখ নেই। কিন্তু সাথে সাথে হৃদয়ে লালিত জাহেলিয়াতের অন্ধকার যেন ছিঁড়ে খান খান হয়ে যায়। বিদেশী ভাষা শিখুন। কিন্তু মায়ের ভাষায় বলুন ও লিখুন। কেননা আল্লাহ আপনাকে-আমাকে এদেশেই দ্বীন প্রচারের জন্য মনোনীত করেছেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

বিচ্ছিন্ন জনগণ যখন একটি আদর্শমূলে একই লক্ষ্যে একই নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত হয়, তখন সেটি একটি জনশক্তিতে পরিণত হয়। আমাদেরকে অবশ্যই একটি সংঘবদ্ধ জনশক্তি হিসাবে, একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। এদেশের বাতিলপন্থীরা তাদের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ। হকপন্থীদের তাদের করুণার ভিখারী হয়ে বেঁচে থাকার কোন অবকাশ নেই।

আন্দোলন অথবা ধ্বংস

কথা, কলম ও সংগঠন- জিহাদের এই ত্রিমুখী হাতিয়ার নিয়ে আমাদেরকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَنصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ- (محمد ٧)- 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে দৃঢ় রাখবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। অতএব 'আল্লাহ তার দ্বীনকে হেফাযত করবেন'। এবিষয়ে আপনার-আমার কিছুই করণীয় নেই- এ ধরনের ধোঁকা হ'তে দূরে থাকুন। আল্লাহ যেমন দ্বীনের মালিক, তেমনি আপনার রূযীরও মালিক। কিন্তু রূযী উপার্জনের বেলায় তো আপনি চুপচাপ ঘরে বসে থাকেন না। বিনা প্রচেষ্টায় যদি রূযী আপনার ঘরে না আসে, তাহ'লে বিনা প্রচেষ্টায় দ্বীন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? তীব্র স্রোতের মুখে দুর্বল বাঁধের যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে না, সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের তীব্র স্রোতের মুখে হকপন্থীদের প্রতিরোধ যদি মযবুত না হয়, তাহ'লে তারাও তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন ঐ দায়িত্ব আল্লাহ অন্য লোকদের হাতে ন্যস্ত করবেন, আমরা মাহরূম হব। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- (التوبة ٣٩)-

'যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং অন্য কওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।

যাদেরকে তোমরা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী' *(তওবা ৯/৩৯)*। অতএব হয় আন্দোলন, নয় ধ্বংস, যে কোন একটি পথ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার-আমার।

জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

মধু পেতে গেলে মৌমাছির কামড় সহ্য করতে হয়। গোলাপ আহরণ করতে গেলে আঙ্গুলে কাঁটা ফোটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। জান্নাত পেতে গেলে তেমনি কাঁটা বিছানো রাস্তায় চলতে হবে। বিলাসিতাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে হবে। সকল প্রকারের রিয়া ও অহংকার পায়ের তলে দাবাতে হবে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে সকল কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ- (البقرة ٢١٤)-

'তোমরা কি ধারণা করেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর এখনও তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। অবশেষে রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল, কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*।

নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের যদি এমন অবস্থা হয়, তাহ'লে জাহেলিয়াত যখন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে দৃঢ়ভাবে জেঁকে বসে আছে, সে অবস্থায় আমাদের মত গোনাহগারদের আরও কত গুণ বেশী কষ্ট ও মুছীবতের সম্মুখীন হ'তে হবে?

তিনটি হুঁশিয়ারী

পরিশেষে আমরা যারা 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' হিসাবে আজ এখানে সমবেত হয়েছি, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বিশেষ কয়েকটি কথা আরয করতে চাই-

আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে জীবনের সবকিছু কুরবানী দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করেছি। আর সেজন্যই

শয়তান অন্য সকলের চাইতে আমাদের পিছনে কাজ করবে বেশী। সে আমাদেরকে প্রধানতঃ তিনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে।-

(১) আমরা আন্দোলনের ত্বরিৎ ফল পেতে চাইব। (২) অন্যদের দুনিয়াবী জৌলুস দেখে প্রতারিত হব। (৩) আমরা পরস্পরের আমানতে সন্দেহ করব।

মনে রাখবেন শয়তান যদি এই তিনটি হাতিয়ারের কোন একটি আমাদের উপরে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়, তাহ'লে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট হবে। আন্দোলন ব্যাহত হবে।

মুমিনের জন্য পার্থিব বিজয় লাভ অপরিহার্য নয়

আর একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মুমিনের জন্য পার্থিব বিজয় লাভ অপরিহার্য নয়। আমরা আমাদের আন্দোলনের বিনিময়ে দুনিয়ায় কিছু চাই না। সবকিছু আখেরাতে চাই। আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيْبٍ- (الشورى ٢٠)-

'যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। এরপরেও যদি আমরা কখনো পার্থিব বিজয় লাভ করি, তবে সেটি হবে আমাদের জন্য পরীক্ষা মাত্র। কেননা পার্থিব বিজয় লাভ মুমিনের আন্দোলনের প্রতিদান নয় বরং সেটি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমতা দেওয়া ও নেওয়ার মালিক আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

'তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ। তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান কর ও যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে খুশী সম্মানিত কর ও যাকে খুশী অসম্মানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*।

অতএব আসুন! শুধু রাজনীতি নয়, শুধু অর্থনীতি নয়, বরং সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে আমরা নবীদের তরীকায় এগিয়ে চলি। আমাদের জান-মাল,

সময়-শ্রম, শিক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি তথা আল্লাহ্র দেওয়া আমাদের সকল প্রিয় বস্তুকে পিতা ইব্রাহীমের ন্যায় আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গ করি। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- (الأنعام ١٦٢)-

'তুমি বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, সবকিছু জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

আসুন! আমরা পুনরায় উচ্চারণ করি ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সেই দুনিয়া কাঁপানো শ্লোগান... *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'*। জীবনের কোন ক্ষেত্রে 'নেই কোন ইলাহ কেবলমাত্র আল্লাহ ব্যতীত'। পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং সকল দরূদ ও সালাম তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের জন্য।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم- سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

[প্রশ্নোত্তর অংশটুকু 'তিনটি মতবাদ' নামক আলাদা বইয়ে দেখুন!]

***

প্রশ্নমালা

১. ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত কয়টি ও কী কী?
২. খেলাফতে রাশেদার আদর্শ পুনরায় কেন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি?
৩. সমাজ বিপ্লবের ধারা কয়টি ও কী কী? ব্যাখ্যা দিন।
৪. একজন কর্মীকে সর্বদা কয়টি বিষয় মনে রাখতে হবে? সেগুলো কী কী?
৫. তিনটি হুঁশিয়ারী কী কী?
৬. 'মুমিনের জন্য পার্থিব বিজয় লাভ অপরিহার্য নয়' ব্যাখ্যা করুন।
৭. বর্তমান সময়ে জিহাদের হাতিয়ার কয়টি ও কী কী?

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৮ খৃ.
৩য় প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২ খৃ.

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বহু সমাজ দরদী মানুষ নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যা সাময়িকভাবে সমাজে স্থিতি ফিরাতে সক্ষম হ'লেও স্থায়ী ফলদায়ক হয়নি। উক্ত লক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র অহি-র আলোকে পথ দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ নবীগণের সেই নিঃস্বার্থ হেদায়াত নিজেদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেনি। ফলে পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষের হাতে প্রতিনিয়ত মানবতা পর্যুদস্ত হচ্ছে। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অহি প্রাপ্ত হয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। যার পদ্ধতি ছিল পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা। যার মাধ্যম ছিল 'দাওয়াত ও জিহাদ'। মূলতঃ তাওহীদের মর্মবাণীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সর্বমুখী 'জিহাদ'-ই হ'ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।

২৩ বছরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নবুঅতী জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাতিকে যে বাস্তব নির্দেশনা দিয়ে যান, সেটাকেই আমরা **'সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী'** নাম দিয়ে আগামী বংশধরগণের উদ্দেশ্যে পেশ করলাম। একটি বড় বিষয়কে ছোট আকারে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তবুও চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য পথ দেখানোই যথেষ্ট বলে মনে করি। সমাজ সংস্কারের দুরূহ কাজে নামলে উৎস থেকে ঝর্ণা বেরোবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আগামী দিনের বিচক্ষণ সংস্কারকদের হাতেই এর যথার্থ বাস্তবতা নির্ভর করে। অতএব আল্লাহ্র নিকটেই সকল প্রার্থনা এবং তিনিই একমাত্র তাওফীকদাতা।

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

সমাজ সুন্দর না হ'লে মানুষ সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরিবার ও পরিবেশের প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়ে থাকে। শয়তান প্রতিনিয়ত সমাজ দূষণে রত থাকে এবং মানুষকে তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* আগমনের পূর্বে মক্কাসহ তৎকালীন বিশ্ব সমাজ মনুষ্যত্বহীনতার জাহেলিয়াতে ডুবে ছিল। মানুষ নিজ হাতে নিজের মনুষ্যত্ব হননে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে বাছাই করে 'শেষনবী' হিসাবে প্রেরণ করেন *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*। যার মাধ্যমে তিনি পথহারা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তাঁর ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহ পুনরায় ফেলে আসা জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যেতে থাকে। বর্তমানে যা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের ভদ্র লেবাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত মানবতা পর্যুদস্ত হচ্ছে। যাতে যেকোন মুহূর্তে বিশ্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে। এই পতিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে সেই পথে, যে পথের মাধ্যমে জাহেলী আরবের মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়েছিলেন এবং তারা বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হয়েছিলেন।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তরবারী নিয়ে আগমন করেননি বা কোন দো'আ-তাবীয দিয়ে সমাজ সংশোধন করেননি। তিনি এসেছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি দ্বীন নিয়ে। যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে শয়তানের দাসত্ব হ'তে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে যে মানুষ একদিন অন্য মানুষের রক্তখেকো ছিল, সেই মানুষ মুহূর্তের মধ্যে তার জীবন রক্ষাকারীতে পরিণত হয়। যে মানুষ একদিন অন্য মানুষের পূজা দিত, সে মানুষ পরস্পরে ভাই হয়ে যায়। নারীর ইযযত হরণে উদ্যত যুবক তার ইযযত রক্ষায় জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেই শাশ্বত দ্বীন ও চিরন্তন আদর্শ কি ছিল, আল্লাহ নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন।-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

‘তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল’। ‘আর তাদের মধ্যকার অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(জুম‘আহ ৬২/২-৩)*।

প্রথম আয়াতে নবী যুগের লোকদের কথা বলা হয়েছে এবং শেষের আয়াতে নবী পরবর্তী ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন শেষনবী হিসাবে এবং তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন ও ইনসানের নবী। এর দ্বারা এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র অভ্রান্ত শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল সকল যুগের জাহেলিয়াত দূর করা সম্ভব। অন্যকিছু দ্বারা নয়।

উপরোক্ত আয়াতে সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের যে স্থায়ী কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে, তা মাত্র দু’টি শব্দে বর্ণনা করা যায়। আর তা হ’ল ‘তাযকিয়াহ’ ও ‘তারবিয়াহ’ (اَلتَّزْكِيَةُ وَ التَّرْبِيَةُ)। অর্থাৎ পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা। যার মাধ্যম ছিল কিতাব ও হিকমাহ। তথা কুরআন ও সুন্নাহ। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। যাতে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মশুদ্ধিতার তীব্র অনুভূতি। ফলে তার যে কর্মতৎপরতা এতদিন দুনিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল, তা নিমেষে আখেরাত কেন্দ্রিক হয়ে যায়। তার পার্থিব জীবনে এসে যায় আমূল পরিবর্তন। যা সে আগে ভাবতেই পারত না। তার দুনিয়ামুখী চলার পথ ইউটার্ণ হয়ে আল্লাহমুখী হয়ে যায়।

জাহেলী আরব সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর মন্তব্য

হাফেয ইবনু কাছীর *(রাহেমাহুল্লাহ)* বলেন, আরবের লোকেরা প্রাচীনকালে ইব্রাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিল। পরে তারা তাকে পরিবর্তন করে, রূপান্তর করে, ওলট-পালট করে ও তার বিরোধিতা করে। অতঃপর তারা তাওহীদকে

শিরকে এবং দৃঢ়বিশ্বাসকে সন্দেহে পরিবর্তন করে। এছাড়াও তারা বহু কিছু নতুন বিষয়ের প্রচলন ঘটায়, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি। একই অবস্থা হয়েছিল তওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদের। তারা তাদের কিতাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাতে শাব্দিক যোগ-বিয়োগ করেছিল, রূপান্তর করেছিল ও দূরতম ব্যাখ্যা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন মহান ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আত দিয়ে, যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শামিল করে। যাতে রয়েছে তাদের জন্য সরল পথের দিশা এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণে বিস্তৃত বিবরণ'...।[৭৯]

দূর অতীতে জাহেলী আরবের যে পতিত দশা ছিল, আধুনিক যুগে মানবজাতির অবস্থা তার চাইতে অধঃপতিত। সেদিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সমাজে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেই পথ ও সেই পদ্ধতিই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী পথ ও পদ্ধতি। এর বিপরীত পথে গেলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং সমাজে অনাচার ও ধ্বংস নেমে আসবে। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্বের উন্নয়ন ও মানবতার বিজয় সাধনের জন্য সাময়িক কোন টোটকা নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের স্থায়ী কর্মসূচী প্রদান ও তার যথাযথ অনুসরণ একান্তভাবেই আবশ্যক।

নবীদের সহচরগণ :

আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন ঘুণে ধরা সমাজকে আল্লাহ্র পথে সংস্কারের জন্য। নির্বাচন করেছেন তাদের জন্য একদল সহচরকে। যারা সংস্কার কার্য এগিয়ে নিতে নবীগণকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَّأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ

---

৭৯. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা জুম'আ ২ আয়াত;

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَبَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ، وَقَلَبُوهُ وَخَالَفُوهُ، وَاسْتَبْدَلُوا بِالتَّوْحِيدِ شِرْكًا وَبِالْيَقِينِ شَكًّا، وَابْتَدَعُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَأْذَنْ بِهَا اللهُ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ قَدْ بَدَّلُوا كُتُبَهُمْ وَحَرَّفُوهَا وَغَيَّرُوهَا وَأَوَّلُوهَا، فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ بِشَرْعٍ عَظِيمٍ كَامِلٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، فِيهِ هِدَايَتُهُمْ، وَالْبَيَانُ لِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ...-

يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَآءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'আমার পূর্বে আল্লাহ এমন কোন নবীকে কোন উম্মতের মধ্যে পাঠাননি, যাদের মধ্যে তার জন্য 'হাওয়ারী' বা আন্তরিক সহচরবৃন্দ ছিল না। এছাড়া তাদের আরও সাথী ছিল, যারা তাদের নবীর সুন্নাতের উপরে আমল করত এবং তার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করত। কিন্তু তাদের পর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হ'ল যারা এমন কথা বলত, যা তারা করত না। এমন কাজ করত, যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়নি। অতএব (আমার উম্মতের মধ্যেও ঐরূপ দেখা গেলে) যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি যবান (ও কলম) দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে (ঘৃণার মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই'।[৮০]

পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করা এবং নিড়ানী ও পানি সরবরাহের মাধ্যমে নিয়মিত পরিচর্যা করে যেভাবে একটি চারাগাছকে বড় ও ফলবন্ত করা হয়, সেভাবে ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়মিত পরিশুদ্ধি ও পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয়। তাতে সুন্দর ফল আসে এবং সমাজ সুস্থ ও ফলবন্ত হয়। নইলে বিপরীত ফলে ব্যক্তি ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়। প্রত্যেক নবী-রাসূল একাজই করেছেন। তাদের যথার্থ অনুসারী নেতাগণ চিরকাল এভাবেই ব্যক্তি পরিচর্যা ও সমাজ সংশোধনের কাজ করে গেছেন। যখন কোন সমাজে কোন সংস্কারক নেতার আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। যদিও অধিকাংশ লোক থাকে হঠকারী ও তাকে পরিত্যাগকারী অথবা শৈথিল্যবাদী ও আপোষকামী। কিন্তু সংস্কারকগণ তাতে থেমে যান না।

উপরোক্ত হাদীছে 'জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টার মূল ও প্রথম অংশ হ'ল 'দাওয়াত'। পুঁতিগন্ধময় সমাজ থেকে বাতিল হটাতে গেলে তাওহীদের প্রতি নিরন্তর দাওয়াত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাজটিই করে গেছেন তাঁর সমগ্র নবুঅতী জীবনে। তাঁর নবুঅতকালে যেমন মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও

৮০. মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭ 'ঈমান' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

অসহায়ত্ব ছিল এবং মাদানী জীবনের যুদ্ধ ও বিজয় এসেছিল। তেমনি একজন নিখাদ দাঈর জীবনেও আসতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক যে, শেষনবী হিসাবে এবং দ্বীনের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে তাঁর জীবনে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে এটা ঘটেছিল। কিন্তু অন্য দাঈদের জীবনে দাওয়াত ও বিজয় দু'টিই ঘটতে হবে এমনটি নয়। বরং তাদের জীবনে মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও অসহায়ত্বই বেশী থাকবে। দুনিয়াবী বিজয়ের সৌভাগ্য কমই থাকবে। বিগত দেড় হাযার বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্যই প্রদান করে।

এখানে এ যুক্তি অচল যে, 'নবী জীবনের শেষে যেহেতু ইসলামের পূর্ণতা এসেছে ক্ষমতা ও সশস্ত্র বিজয়ের মাধ্যমে, অতএব সর্বদা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই কেবল দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করতে হবে। নইলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না'। এরূপ দাবীতে ইসলামের ধর্মীয় আবেদন শেষ হয়ে যাবে এবং স্রেফ ক্ষমতান্ধ একটি আগ্রাসী রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত হবে। যা হবে ইসলামের জন্য সবচাইতে ক্ষতিকর। যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই করেছে ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ও তাদের দোসর জঙ্গীবাদীরা।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম সমূহ

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম হবে দু'টি : দাওয়াত ও জিহাদ। অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতি দাওয়াত এবং শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ। দু'টিই সমান্তরালভাবে করার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসে। নইলে কথা ও কর্ম পৃথক হ'লে বরং উল্টা ফল হবে।

(১) দাওয়াত ও তার পদ্ধতি :

আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ-

'তুমি মানুষকে ডাক তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(১২৫)*। 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি উত্তম' *(১২৬)*। 'তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ হবে কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে। তাদের উপর দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না' *(নাহল ১৬/১২৫-২৭)*। অত্র আয়াতে ইসলামী দাওয়াত ও তার পদ্ধতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(২) জিহাদ ও তার পদ্ধতি :

'জিহাদ' جُهْدٌ 'জুহদুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ, কষ্ট ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। ইসলামে জিহাদ হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,- مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সেই-ই মাত্র আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[৮১] আল্লাহ বিরোধী কোন আদর্শকে সমুন্নত করার জন্য নয় বা কোন দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ- 'যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের পথে আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪)*।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ- تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?'

৮১. বুখারী হা/২৮১০; মুসলিম হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, রাবী আবু মূসা (রাঃ)।

'সেটা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ ৬১/১০-১১)*।

এই জিহাদ হবে আক্বীদা ও আমল, জান ও মাল সবকিছুর মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ– 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৮২] ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআন ও হাদীছে মালের কথা আগে বলা হয়েছে। কারণ জিহাদের জন্য প্রথমে মালের প্রয়োজন হয়ে থাকে।[৮৩] এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তার জন্য সাতশত গুণ নেকী লেখা হয়'।[৮৪] তিনি বলেন, مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের গাযীকে রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, সে স্বয়ং যুদ্ধ করল। আর যে ব্যক্তি গাযীর পরিবারের তত্ত্বাবধান করল, সেও যুদ্ধ করল'।[৮৫] অর্থাৎ আল্লাহ্র পথের মুজাহিদকে সাহায্য করা ও তার পরিবারের তত্ত্বাবধান করাটাও জিহাদে অংশগ্রহণের শামিল।

আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', যবান ও কলমের মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাটাও তেমনি 'জিহাদ'। এর জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাও তেমনি 'জিহাদ'। বরং কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জিহাদই স্থায়ী ফলদায়ক। যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তিত হয়। আর সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার অধিকার কেবল জামা'আতে 'আম্মাহ তথা রাষ্ট্রনেতার, অন্য কারু নয়। যেমন মাদানী জীবনে

---

৮২. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৩১; মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়, রাবী আনাস (রাঃ)।

৮৩. কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ৪১ আয়াত, ৮/১৩৯।

৮৪. তিরমিযী হা/১৬২৫; নাসাঈ হা/৩১৮৬; মিশকাত হা/৩৮২৬, রাবী খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ)।

৮৫. বুখারী হা/২৮৪৩; মুসলিম হা/১৮৯৫; মিশকাত হা/৩৭৯৭, রাবী যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ)।

রাসূল (ছাঃ)-এর এবং পরবর্তীতে সেটি খলীফাগণের অধিকারে ছিল। নইলে জিহাদের নামে কিছু মুসলিম তরুণের অস্ত্রবাজি ইসলামকে বদনাম করার শামিল। এগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতান্ধদের পাতানো ফাঁদ মাত্র। এসব থেকে দূরে থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ– 'নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'তে দেন না' *(ইউনুস ১০/৮১)*। এটি ব্যক্তি ও সাংগঠনিক জীবনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাষ্ট্রনেতাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বড় বড় কল্যাণ হয়। আবার বড় বড় বিপর্যয় সংঘটিত হয়।

জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা : জিহাদের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। কথা ও কলমের মাধ্যমে দাওয়াত একাকী দেওয়া সম্ভব। তাতে বহু মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন হ'তে পারে। কিন্তু সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের কাজ জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা তথা সংগঠন ব্যতীত সম্ভব নয়। এই দুরূহ কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিখাদ আনুগত্যশীল একদল কর্মীর নিরন্তর প্রচেষ্টা আবশ্যক। এটাই হ'ল اَلْجِهَادُ الْجِماعِى বা জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। এটি জিহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এদিকে নির্দেশনা দিয়েই আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ– 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*।

হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ– 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।[৮৬] তিনি বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়'।[৮৭]

---

৮৬. আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।
৮৭. নাসাঈ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, অথচ তার গর্দানে আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করল'।[৮৮] এটি কেবল খেলাফতে রাশেদাহ পর্যন্ত সীমায়িত নয়। বরং সকল যুগে রাষ্ট্রীয় বায়'আত ও সাংগঠনিক বায়'আত দু'টিই হ'তে পারে। কারণ বায়'আত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার না থাকলে রাষ্ট্র বা সংগঠনের প্রতি কোনরূপ দায়বদ্ধতা থাকে না। আর বায়'আতবিহীন আনুগত্য সাধারণ সমর্থনের ন্যায়, যা তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। এই বায়'আত না থাকলে বা ভঙ্গ করলে কেউ কাফির হবে না বটে, কিন্তু সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। যাকে এখানে 'জাহেলিয়াত' বলা হয়েছে *(মিরক্বাত)*। যা আল্লাহ্র কাম্য নয়। জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি চূড়ান্ত নির্দেশনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَّرْجِعَ؛ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ– رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ–

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি; আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন : (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (৩) তার আনুগত্য করা (৪) (প্রয়োজনে) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের পথে আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[৮৯]

---

৮৮. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।

৮৯. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/৩৬৯৪, রাবী হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ)।

উক্ত হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় এই মর্মে যে, (১) মুসলমানের জন্য সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, 'আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন'। যদিও তিনি সর্বদা অহী মোতাবেক কথা বলে থাকেন। বর্তমানে জাতীয় ও বিজাতীয় তাক্বলীদের ধোঁকায় পড়ে মুসলিম উম্মাহ্র জাতীয় ঐক্য ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে। ধর্মীয় জীবনে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার জাতীয় তাক্বলীদ এবং বৈষয়িক জীবনে অমুসলিমদের বিজাতীয় তাক্বলীদ তাদের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে।

(২) জামা'আতী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করা ইসলামী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করার শামিল। মুসলমান যদি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বেরিয়ে যায়, তাহ'লে সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল।

(৩) মুমিনদের সংগঠন হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও সার্বিক জীবনে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। তাহ'লে আল্লাহ তাদের গায়েবী মদদ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا– 'তিনি স্বীয় রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিনী দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখোনি। তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্র ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন' *(তওবাহ ৯/৪০)*। এই বিজয় কেবল রাজনৈতিক বিজয় নয়, বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে।

(৪) আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্য বিহীন এবং ছাহাবায়ে কেরামের তরীকায় সমাজ গড়ার উদ্দেশ্য বিহীন কোন জামা'আত ইসলামী জামা'আত নয়। সেকারণ শিরক ও বিদ'আতপন্থী বা সেক্যুলার কোন দলে যোগদান করা বা তাদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা সিদ্ধ নয়। এরা ক্ষমতাসীন হ'লে তাদের খাজনা-ট্যাক্স ইত্যাদি দিয়ে দিতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ– 'তোমরা তাদের হক তাদেরকে দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও'।[৯০] অর্থাৎ বাধ্যগত অবস্থায় বাতিলপন্থী শাসকদের প্রতি আনুগত্য করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য হেদায়াতের দো'আ করতে হবে।

---

৯০. বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭২ 'ইমারত ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

(৫) হক-বাতিল না বুঝে কোন দলে যোগ দেয়া বা বিশুদ্ধ ইসলামী জামা'আত ছেড়ে নতুন দল গড়া যাবেনা। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ– 'যে ব্যক্তি আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। বরং সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহেলিয়াতের উপর নিহত হয়।...[৯১]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَه... 'তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে): (১) যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তার আমীরের অবাধ্য হ'ল। অতঃপর অবাধ্য অবস্থায় মারা গেল। (২) যে দাসী বা দাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেল। (৩) যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত রয়েছেন। যিনি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যথাযথ ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ঐ স্ত্রী তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়...।[৯২]

(৭) মুসলমানদের সামাজিক জীবন হবে আমীরের অধীনে আনুগত্যপূর্ণ সমাজ। উদ্ধত বা বিদ্রোহী নয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ– 'তোমাদের উপর আমীরের আনুগত্য অপরিহার্য করা হ'ল। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা মুমিন হ'ল নাকে লাগামবদ্ধ উটের মত। যেখানেই তাকে নেওয়া হয়, সেখানেই সে অনুগত হয়ে গমন করে'।[৯৩]

---

৯১. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৯২. আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ছহীহাহ হা/৫৪২, রাবী ফাযালাহ বিন উবাইদ (রাঃ)।

৯৩. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭, রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)।

(৭) 'আমীর' হবেন রাসূল (ছাঃ)-এর যথার্থ অনুসারী। কেননা রাসূল (ছাঃ) উক্ত আমীরকে 'আমার আমীর' (أَمِيرِى) বলে সম্মানিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى– 'যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৯৪] শিরক ও বিদ'আতপন্থী বা ইসলাম বিরোধী সেক্যুলার কোন নেতা বা শাসক কখনোই রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় 'আমার আমীর' নন। যদিও বাধ্য ও অবাধ্য উভয় আমীরই আমীর। যেমন বাধ্য ও অবাধ্য উভয় সন্তানই পিতার সন্তান। কিন্তু কেবল বাধ্য সন্তানকেই পিতা বলেন, 'আমার সন্তান'। আর সেই-ই কেবল পিতার স্নেহ লাভে ধন্য হয়। বস্তুতঃ ইসলামী আমীরের আনুগত্য হবে নেকীর উদ্দেশ্যে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এই আমীর রাষ্ট্রনেতা বা সংগঠনের নেতা দুইই হ'তে পারেন। রাষ্ট্রনেতা দণ্ডবিধিসমূহ বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু সংগঠনের নেতা সেটি করবেন না। উভয় আমীরের উপরেই আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী দেশ ও সংগঠন পরিচালনা করা অপরিহার্য। বাস্তবতা এই যে, বিশ্বব্যাপী কোথাও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই। বলতে গেলে দ্বীন বেঁচে আছে জামা'আতে খাছ্ছাহ বা ইসলামী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে। অতএব সেখানে শারঈ ইমারত ও আনুগত্য অপরিহার্য। যেমন মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। যদিও মাক্কী জীবনে রাসূল (ছাঃ) দণ্ডবিধিসমূহ কায়েমের অধিকারী ছিলেন না।

ফলাফল :

আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ– وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ– 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলি দৃঢ় করবেন'। 'আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্মগুলি নিস্ফল করে দিবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭-৮)*।

৯৪. বুখারী হা/১৭৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ– ‘আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত’ *(হজ্জ ২২/৪০)*। এখানে আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ তাঁর দ্বীনকে ও তাঁর নবীকে এবং আল্লাহ্র বন্ধুদেরকে সাহায্য করা *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। যার ব্যাখ্যা হ’ল সার্বিক জীবনে যথাযথভাবে দ্বীন পালন করা, তার হালাল-হারামের বিধান সমূহ মেনে চলা এবং যথার্থভাবে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এটা করলেই তিনি আমাদের সাহায্য করবেন ও আমাদের পাণ্ডলিকে দৃঢ় করবেন। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে স্থিতি ও দৃঢ়তা প্রদান করবেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ– وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ–

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতির বদলে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। (শর্ত হ’ল) তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরে যারা অবাধ্য হবে তারাই হবে পাপাচারী’। ‘তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*। আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন,وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ–‘তিনি আরও একটি অনুগ্রহ দান করবেন যা তোমরা পসন্দ কর। (আর তা হ’ল) আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও’ *(ছফ ৬১/১৩)*।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি সমূহ

(১) তাওহীদের আহ্বানের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করা :

আল্লাহ্র আনুগত্য এবং অন্যের আনুগত্য একসঙ্গে চলে না। তাই প্রথমে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। যেমন হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ– 'তুমি আহলে কিতাবদের নিকটে যাচ্ছ। অতএব তুমি প্রথমে তাদেরকে এই সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান জানাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। এটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের দাওয়াত দাও। এটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে তাদের সম্পদের যাকাত আদায়ের কথা বল। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এটা মেনে নিলে তুমি তাদের থেকে যাকাত নাও এবং তাদের উত্তম মাল সমূহ হ'তে বিরত থাক। আর তুমি মযলূমের বদদো'আ থেকে সাবধান থাক। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই'।[৯৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ডাক'।[৯৬]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى 'যেন তারা আল্লাহকে এক বলে গণ্য করে' *(বুখারী হা/৭৩৭২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ

৯৫. বুখারী হা/৭৩৭২, ১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯ (২৯, ৩১); মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।
৯৬. বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯ (৩১), রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ– ‘তুমি তাদেরকে সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান জানাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল’।[৯৭] সবগুলি একই মর্ম বহন করে।

বস্তুতঃ তাওহীদের দাওয়াতের মধ্যেই রিসালাতের প্রতি আনুগত্যের কথা রয়েছে। কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে যার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। অমুসলিমদের নিকট প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দানের কারণ হ’ল এই যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে ডাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে অন্যের আনুগত্যকে শরীক করে। আনুগত্যের পরিবর্তন ছাড়া বিধান প্রদানের কোন অর্থই হয় না। কেননা তাতে বিধান কার্যকর হবে না। বরং পরিত্যক্ত হবে। তাওহীদ হ’ল বিশ্বাসের বস্তু। আর রিসালাত হ’ল অনুসরণের বস্তু। অতএব তাওহীদের স্বীকৃতি দানের পরেই ফরয বিধান সমূহ একে একে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের নিকটেও একইভাবে দাওয়াত দিতে হবে। কেননা অধিকাংশ মুসলমান তাওহীদের মর্ম বুঝেনা। বরং তাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিরক বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ– ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে’ *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

উপরে বর্ণিত হাদীছে তাওহীদের পর কেবল ছালাত ও যাকাতের কথা এসেছে। প্রথমটি নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য এবং দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য। দু’টিই মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ নীতি সকল যুগে প্রযোজ্য। যারা ছালাত আদায় করেন, অথচ নানা অজুহাতে ফরয যাকাত আদায় করেন না, তারা বিষয়টি অনুধাবন করুন। বস্তুতঃ নিয়মমাফিক যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা না থাকায় মুসলিম সমাজে ধন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং পুঁজিবাদীরা সুযোগ নিয়েছে।

(২) আল্লাহ্র জন্য বিশুদ্ধচিত্তে কাজ করা :

আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ– ‘তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর তার প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে’ *(যুমার ৩৯/২)*। কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্য ব্যতীত কখনোই চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় না। যে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, আমাকে কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন, আমি অবশ্যই প্রাণ ভরে

৯৭. বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯ (২৯), রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

তার শুকরিয়া আদায় করব। আমি অবশ্যই সেই কাজ করব যে কাজে তিনি খুশী হন এবং সে কাজ ছাড়ব, যে কাজে তিনি নাখোশ হন। জীবন সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে আমি তাঁকে স্মরণ করব। তাঁর নিকটে সাহায্য চাইব এবং সর্বদা তাঁরই উপর ভরসা করব। তিনি সরাসরি আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন এবং গায়েবী মদদ করবেন। আমার কাজে কোন শ্রুতি ও প্রদর্শনী থাকবে না। যখন সকল মানুষ আমাকে পরিত্যাগ করবে, তখন আমি বলব, যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)। رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ - وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি জান যা কিছু আমরা গোপন করি এবং যা কিছু আমরা প্রকাশ করি। আর যমীন ও আসমানের কোন কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না' *(ইব্রাহীম ১৪/৩৮)*। তিনি পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে বলেছিলেন, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– 'হে আমার পালনকর্তা! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় (তার ব্যাপারে) তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইব্রাহীম ১৪/৩৬)*। একইভাবে নিজ কওম বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে নবী মূসা (আঃ) বলেছিলেন, رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ– 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি। অতএব তুমি আমাদের উভয়ের ও এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও' *(মায়েদাহ ৫/২৫)*। এ যুগে বিভিন্ন অনৈসলামী মতবাদ মুমিনকে সর্বদা পথচ্যুত করছে। এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলা ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য অপরিহার্য।

(৩) তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞান ও আখেরাত ভিত্তিক দূরদর্শিতা অর্জন :

সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য যথার্থ জ্ঞান ও দূরদর্শিতা আবশ্যক। 'জ্ঞান' বলতে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান এবং 'দূরদর্শিতা' বলতে আখেরাতে কল্যাণের দূরদর্শিতা বুঝায়। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ– 'তুমি বল এটাই

আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান এজন্য প্রয়োজন যে, এদু'টিই হ'ল অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস এবং সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড। এজ্ঞান মানুষকে আখেরাতে কল্যাণের পথ দেখায়। লৌকিক ও মানবীয় জ্ঞান যেকোন সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'তে পারে। যাকে এ দুই অভ্রান্ত সত্যের আলোকে যাচাই করতে হয়। অতঃপর আখেরাতে কল্যাণের দূরদর্শিতা এজন্য যে, লৌকিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দূরদর্শিতা কেবল দুনিয়াবী লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যা ভবিষ্যতে অনেক সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আখেরাতে কল্যাণ ভিত্তিক দূরদর্শিতা চিরন্তন মঙ্গলের পথ দেখিয়ে থাকে। আর যে জ্ঞান মানুষকে চিরন্তন কল্যাণের পথ দেখায়, সেটাই হ'ল 'জাগ্রত জ্ঞান'। সে পথেই কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে আহ্বান করে থাকে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবজাতিকে সেদিকে আহ্বান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। যুগে যুগে ইসলামের সনিষ্ঠ অনুসারীগণ সেদিকেই মানুষকে আহ্বান করেন।

উক্ত আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (১) মানুষকে স্রেফ আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে হবে। অন্য কারু পথে নয়। (২) আখেরাতে মুক্তির জন্য জাগ্রত জ্ঞান সহকারে ডাকতে হবে। বাপ-দাদা বা প্রচলিত প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সংকীর্ণ জ্ঞান সহকারে নয়। (৩) একাকী নয়। অনুসারীদের সাথে নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে সংস্কারের কাজ করতে হবে। এর মধ্যে সংগঠনের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। (৪) মুশরিকদের দলভুক্ত হওয়া যাবে না। অর্থাৎ কোনরূপ শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা ও সেক্যুলার মতাদর্শের অনুসরণ করা যাবে না।

আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন,

قَدْ كَانَ الأَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدِينَ كُلُّهُمْ يَحُثُّونَ أَصْحَابَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَقُولُونَ اِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمَنَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاضْرِبُوا بِكَلاَمِنَا الْحَائِطَ-

'মুজতাহিদ ইমামগণ সকলে তাদের শিষ্যদের কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তারা বলতেন, যখন তোমরা আমাদের কোন কথা কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত দেখবে, তখন তোমরা কিতাব ও সুন্নাহ্র উপর আমল করবে এবং আমাদের

কথা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'।[৯৮] উক্ত আদেশ লংঘন করে পরবর্তীকালে পতনযুগে কথিত মাযহাবী ফক্বীহগণ নিজেদের রায়ের অনুকূলে কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কুরআন সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের অনুকূলে নিজেদের রায় পরিবর্তন করেননি। ফলে তাদের সৃষ্ট বিদ'আতগুলি সুন্নাত বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ছূফীবাদীরা আখেরাতের গায়েবী বিষয়গুলির ভুল ব্যাখ্যা করে জীবিত মানুষগুলিকে মৃত মানুষের পূজায় নিয়োজিত করেছে। যা তাওহীদকে বরবাদ করে ফেলে আসা শিরকের পুনর্জীবন ঘটিয়েছে। অন্যদিকে সেক্যুলারগণ বৈষয়িক জীবন থেকে ইসলামী বিধানকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান সমূহ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এভাবে ধর্মনেতা ও বৈষয়িক নেতারা মানুষের উপর 'রব'-এর আসন দখল করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيَّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، قَالَ: فَطَرَحْتُهُ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ- رواه ابن جرير، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ-

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا- رواه ابن جرير ح/١٦٦٤١-

জগদ্বিখ্যাত দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র 'আদী বিন হাতেম তৎকালীন সময়ে ত্বাঈ গোত্রের নেতা ও বিখ্যাত খ্রিষ্টান পণ্ডিত ছিলেন। স্বীয় ভগিনী ও সম্প্রদায়ের লোকদের উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসেন। অতঃপর নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলাম এমতাবস্থায় আমার গলায় স্বর্ণ খচিত ক্রুশ (+) ঝুলানো ছিল। এটা দেখে তিনি আমাকে বললেন, তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। তখন আমি ওটা ফেলে দিলাম এবং তাঁর নিকটে গিয়ে বসলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবার ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

৯৮. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হিঃ) ১/৬০ পৃ.।

اِتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَآ أُمِرُوآ إِلاَّ لِيَعْبُدُوآ إِلَهًا وَّاحِدًا، لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তাওবাহ ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াত শোনার পর 'আদী বিন হাতেম বলে উঠলেন, إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা তাদের ইবাদত করি না'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ 'আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা কি তা হারাম করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম করেছ। আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা কি তা হালাল করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল করেছ। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'ব্যস ওটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।

ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ ঐসব আলেম-দরবেশ ও সমাজনেতাদের 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন'।[৯৯] অথচ ইসলামের দাওয়াত ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করা। জান্নাত পেতে গেলে তাই আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বর্ণযুগের বিশুদ্ধ ইসলামের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

---

৯৯. দ্র. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত : ১৯৮৬) ১০/৮০-৮১ পৃ.; হা/১৬৬৩২, ১৬৬৪১, ১৬৬৩০; তিরমিযী হা/৩০৯৫; বায়হাক্বী হা/২০৮৪৭, ১০/১১৬ পৃ. ।-

عَنِ الضَّحَّاكِ: {اتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ} [التوبة: ٣١] قَالَ: قُرَّاءَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ {أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [آل عمران: ٦٤] يَعْنِي: سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ، فَيُحِلُّونَ مَا أَحَلُّوهُ لَهُمْ مِمَّا قَدْ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُونَ مَا يُحَرِّمُونَهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُمْ- رواه ابن جرير ح/١٦٦٣٠-

(৪) সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ও মিথ্যার সাথে আপোষ না করা :

আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَّسْتَغِيثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِيْ الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا– ‘আর তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় (পুঁজ-রক্ত) দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল’ *(কাহফ ১৮/২৯)*। তিনি বলেন, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ– ‘এমনিভাবে আমরা আয়াত সমূহ সবিস্তার বর্ণনা করি, যাতে পাপাচারীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে’ *(আন‘আম ৬/৫৫)*।

উক্ত দু’টি আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীদের তরীকা ও অন্যদের তরীকা পৃথক। উভয় তরীকার মধ্যে আপোষ অসম্ভব। হেদায়াত স্পষ্ট এবং গুমরাহী স্পষ্ট। হেদায়াতের পরিণাম জান্নাত এবং গুমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম। মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে, যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করার। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– ‘আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক’ *(দাহর ৭৬/৩)*। একথাই বর্ণিত হয়েছে অন্যত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ‘দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ’তে স্পষ্ট হয়ে গেছে’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। অতএব ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের মধ্যে আপোষ সম্ভব নয়। সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে হবে। তাহ’লেই মানুষ সত্যকে চিনতে পারবে।

মুসলমান ইসলামে বিশ্বাসী। অতএব তাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্র বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের কিছু এবং শিরক ও কুফরীর কিছু মিলিয়ে জগাখিচুড়ী জীবন পরিচালনারও কোন অবকাশ নেই। বরং তাদের

কর্তব্য হ'ল, একমুখী হওয়া এবং কথায় ও কাজে ইসলামের সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এর ফলে মিথ্যা অবশ্যই পরাভূত হবে এবং সমাজ পরিশুদ্ধ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ– 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর তা ওটাকে চূর্ণ করে দেয়। ফলে তা মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা বল সেজন্য আফসোস' *(আম্বিয়া ২১/১৮)*।

শয়তান মানুষের দু'টি ত্রুটির সুযোগ নেয়। ১- তার যিদ ও হঠকারিতা। ২- তার অতি সরলতা ও সাধুতা। হঠকারীরা সত্য জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– 'আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই যিদের মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১৩৭)*। এদের পরিণতি ব্যাখ্যা করে আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ– ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ– 'এই সব লোকেরা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীকে এবং ক্ষমার বদলে শাস্তিকে খরিদ করেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এরা আগুনের উপর কতদিন টিকে থাকবে?' 'আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন সত্য সহকারে। কিন্তু যারা উক্ত কিতাবের বিষয়ে মতভেদ করেছে, তারা অবশ্যই দূরতম যিদের মধ্যে রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৭৫-৭৬)*।

পক্ষান্তরে অতি সরল ও সাধু চরিত্রের লোকেরা দু'ভাবে প্রতারিত হয়। ক- 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'। এভাবে তারা সবার কাছে ভাল থাকতে চায়। এই ফাঁকে তার সমর্থন নিয়ে শয়তান তাকে দিয়ে তার কপট উদ্দেশ্য হাছিল করে। খ- 'সবাই যেদিকে আমিও সেদিকে'। যুগে যুগে নবী-রাসূলদেরকে এভাবেই বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে মুশরিক নেতারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাল মুমিনও অনেক সময় উক্ত ধোঁকায় পড়ে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ– 'মুমিন আত্মভোলা ও দয়ালু হয়ে থাকে

এবং দুষ্ট ব্যক্তি প্রতারক ও নীচু স্বভাবের হয়ে থাকে'।[১০০] শয়তান উক্ত সরলতার সুযোগ নিয়ে মুমিনকে পথভ্রষ্ট করে। অতএব হক পিয়াসীরা সাবধান!

বস্তুতঃ ইসলামে হক ও বাতিল মিশ্রণের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না' *(বাক্বারাহ ২/৪২)*।

যুগে যুগে ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা শিরক ও বিদ'আত রূপে সর্বদা ইসলামে ভেজাল মিশানোর চেষ্টা করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম সর্বদা এগুলি প্রতিহত ও পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন এবং আজও করে চলেছেন। এরাই উত্তম। যদিও সংখ্যায় কম। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ– 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।[১০১] বস্তুতঃ হকপন্থীরা সর্বদা এই দলেই থাকেন। এরা না থাকলে আল্লাহ্র বিশুদ্ধ দ্বীন বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যেত। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেছেন, لَوْ لاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِىْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ– 'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[১০২] হযরত ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ– 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[১০৩]

---

১০০. আবুদাঊদ হা/৪৭৯০; তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫; ছহীহাহ হা/৯৩৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১০১. মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

১০২. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.), শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন) পৃ. ২৯।

১০৩. মুসলিম হা/১৯২০, 'ইমারত' অধ্যায় ৫৩ অনুচ্ছেদ।

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلاَ أَدْرِي مَنْ هُمْ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّة وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ– 'তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানিনা তারা কারা? কাযী ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেন, এর দ্বারা ইমাম আহমাদ আহলে সুন্নাতকে এবং যারা আহলুল হাদীছের মাযহাবের আক্বীদা পোষণ করে, তাদেরকে বুঝিয়েছেন' *(ঐ, শরহ নববী)*।

মানুষের তৈরী মতবাদগুলি সর্বদা সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থ ও ভেজালে পূর্ণ। যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কোটি মানুষের রক্ত ঝরলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনা সমাজতন্ত্র কখনোই এক ছিল না। আর পরবর্তীতে দু'টি দেশই চরম পুঁজিবাদী হয়ে গেছে। কিন্তু চীনারা তাদের নীতিভ্রষ্টতাকে সর্বদা কয়েকটি পরিভাষার কালো চাদরে ঢেকে রাখে। যেমন তারা বলে, Socialism with Chinese characteristics 'চীনা বৈশিষ্ট্য যুক্ত সমাজতন্ত্র'। আরেকটি হ'ল Principal contradiction & Non Principal 'প্রধান দ্বন্দ্ব ও অপ্রধান দ্বন্দ্ব'। প্রথম পরিভাষাটি চীনাদের নিকট আপ্তবাক্যের ন্যায় প্রচলিত। দ্বিতীয়টি নিয়ে তাদের তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর মতপার্থক্য। এদেশের কথিত ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলিও 'মাযহাবী বৈশিষ্ট্যযুক্ত ইসলাম' তথা Islam with Mazhabi characteristics কায়েম করতে চান। নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী হাযারো মতভেদ ও দলাদলি থাকলেও তাদের নিকট আইন রচনার উৎস হবে স্ব স্ব মাযহাবী ফিক্বহ ও তরীকাগত ব্যাখ্যা। কুরআন ও সুন্নাহ তাদের শ্লোগানের ভাষা। তা কখনোই তাদের আচরিত বিধান নয়। এছাড়া তাদের মধ্যেও ফরয বিধানগুলিকে প্রধান এবং অন্যগুলিকে অপ্রধান বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রকটভাবে বিদ্যমান। এমনকি শিরক ও বিদ'আত এবং হালাল-হারামের মত মৌলিক বিষয়গুলিতেও তাদের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই মাযহাবী সংকীর্ণতার কারণেই পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হয়নি। বাংলাদেশেও হবে না যদি না আল্লাহ্র বিশেষ রহমত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) বলেন,

ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق

فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر

'কেবল তাওহীদ ও সুন্নাহ হ'ল শান্তি ও স্থিতির পথ
তাক্বলীদের মাধ্যমে ফিৎনা-ফাসাদ ও লড়াই সৃষ্টি করো না'।

(৫) আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে মার্জিত ভাষায় দাওয়াত দেওয়া :

আল্লাহ স্বীয় নবী মূসা ও হারূণকে ফেরাঊনের নিকট প্রেরণের সময় বলেন, فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى– 'অতঃপর তার সাথে তোমরা দু'জন নরমভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৪)*। এতে বুঝা গেল যে, বাতিলের সামনে হক প্রকাশের সময় নিজের আক্বীদা দৃঢ় থাকবে ও আচরণ নম্র হবে। ভরসা পুরোপুরি আল্লাহ্র উপরে থাকবে। যেমন আল্লাহ মূসা ও হারূণকে উপদেশ দিয়ে বলেন, لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَى– 'তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*।

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বাতিল যেন হকপন্থীর আচরণে সন্তুষ্ট থাকে। যদিও সে হক কবুল করবে না।

(৬) মানুষের হেদায়াতের প্রতি আকাঙ্ক্ষী থাকা :

মানুষকে আল্লাহ্র পথে আনার জন্য নিজের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ্র তাওফীক প্রয়োজন। যাতে হকপন্থী ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে ডাকার জন্য নিজের ভিতর থেকেই উৎসাহ পান ও তাকীদ অনুভব করেন। এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা (Instinct) না থাকলে শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি সমাজ সংস্কারে ব্যর্থ হবে। নবীগণের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর ছিল। পৃথিবীর প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) তাঁর উম্মতকে দিন-রাত দাওয়াত দিতেন। পদে পদে বাধা পেতেন। ধিক্কার ও তাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হ'তেন। দৈহিকভাবে নির্যাতিত হ'তেন। এতদসত্ত্বেও পুনরায় তাদের কাছেই যেতেন ও দাওয়াত দিতেন। যার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَّنَهَارًا– فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِي إِلاَّ فِرَارًا– وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا– ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا– ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا– 'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি' *(৫)*। 'কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের

পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে' *(৬)*। 'আমি যতবারই তাদের আহ্বান করেছি, যাতে তুমি তাদের ক্ষমা কর, ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকেছে, যিদ করেছে এবং চূড়ান্ত অহংকার দেখিয়েছে' *(৭)*। 'অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি উঁচু স্বরে' *(৮)*। 'অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি প্রকাশ্যে ও গোপনে' *(নূহ ৭১/৫-৯)*।

অতঃপর সর্বশেষ রাসূল ও আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় দাওয়াতী জীবনে মানুষের শত বিদ্রুপ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا-

'নিশ্চয় আমার ও অন্য লোকদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তা চারদিকে আলোকিত করল, তখন চার পাশ থেকে পতঙ্গসমূহ এবং এইসব কীটসমূহ যারা আগুনে ঝাঁপ দেয়, তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আর লোকটি তাদের বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে পরাস্ত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সেইরূপ আমিও তোমাদের কোমর টেনে ধরেছি আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু লোকেরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে'।[১০৪]

তাঁর প্রত্যেক ছাহাবী ছিলেন এক একজন দাঈ ইলাল্লাহ। (১) এমনকি খেলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও ওমর ফারূক (রাঃ) দাওয়াতের মৌলিক দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বীয় খেলাফতকালে ১৫ হিজরীতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় উপলক্ষ্যে ফিলিস্তীন সফরে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তিনি ওযূর পানি তলব করেন। তখন রাস্তার পাশের এক বাড়ী থেকে তাঁকে পানি এনে দেওয়া হয়। তিনি ওযূ শেষে বললেন, কোথা থেকে এ পানি আনলে? আমি এমন সুমিষ্ট পানি পাইনি। রাবী বললেন, ঐ বৃদ্ধা খ্রিষ্টান মহিলার বাড়ী থেকে এনেছি। তখন ওমর (রাঃ) তার কাছে গেলেন ও বললেন, হে বৃদ্ধা! أَسْلِمِى تَسْلَمِى 'ইসলাম কবুল কর। (জাহান্নাম থেকে) বেঁচে যাবে। আল্লাহ মুহাম্মাদ

১০৪. বুখারী হা/৬৪৮৩; মুসলিম হা/২২৮৪; মিশকাত হা/১৪৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(ছাঃ)-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। তখন বৃদ্ধা তার মাথা আলগা করে দেখালো কাশফুলের মত ধবধবে সাদা একরাশ চুল। অতঃপর বলল, وَأَنَا اَمُوْتُ الْآنَ 'আমি এখন মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত'। একথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, اَللَّهُمَّ اشْهَدْ 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' (যে, আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি)। কুরতুবী বর্ধিতভাবে লিখেছেন, অতঃপর তিনি لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، আয়াতাংশটি পাঠ করলেন।[১০৫]

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, সে সময়কার খ্রিষ্টান বিশ্ব যে ওমরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং যখন ফিলিস্তীনের খ্রিষ্টান নেতারা তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত, সে অবস্থায় তিনি একজন খ্রিষ্টান বৃদ্ধার প্রতিও ইসলাম কবুলের জন্য চাপ দেননি। কেবল দাওয়াত দিলেন ও এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখলেন। কারণ দাওয়াত দেওয়া ফরয। কিন্তু দাওয়াতকে বিজয়ী করা ফরয নয়। বরং সে দায়িত্ব আল্লাহ্র।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) দাওয়াতী সফরে বেরিয়েছেন। কিছুদূর গিয়ে ছোট ভাই কুছাম (قُثَم) অথবা নিজ কন্যার (কুরতুবী) মৃত্যু খবর পেলেন। তখন তিনি ইন্না লিল্লাহ...পাঠ করলেন। অতঃপর রাস্তা থেকে একটু দূরে গিয়ে বাহন বসালেন। অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন ও দীর্ঘক্ষণ বসে রইলেন। অতঃপর উঠে স্বীয় বাহনের দিকে হেঁটে যেতে যেতে পাঠ করলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ– 'তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত'।[১০৬]

এতে শিক্ষণীয় এই যে, মাইয়েতের কাফন-দাফন অন্যেরা করতে পারবে। কিন্তু দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব রয়েছে তাঁর উপর। অতএব নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগেই তা সম্পন্ন করতে হবে। আল্লাহ্র পথের দাঈগণ উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি?

---

১০৫. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত; আল-বিদায়াহ ৭/৫৬; বায়হাক্বী 'তাহারৎ' অধ্যায় ১/৩২ পৃ.; দারাকুৎনী হা/৬০-৬১।

১০৬. বাক্বারাহ ২/৪৫; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত।

বস্তুতঃ ছাহাবীগণ দাওয়াত দিতেন কেবল আখেরাতে ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে, দুনিয়াবী লাভের জন্য নয়। কেননা এটি নবীগণের উত্তরাধিকার। আর নবীগণ এই দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ দুনিয়াবী স্বার্থ কামনা করতেন না। যেমন (১) হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেন, وَيَاقَوْمِ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ– 'আর হে আমার সম্প্রদায়! এ দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯)*।

(২) তিনি পুনরায় বলেন, وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– 'আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বপালকের নিকটেই রয়েছে' *(শো'আরা ২৬/১০৯)*। (৩) একই ভাষায় বলেছেন হূদ (আঃ) স্বীয় 'আদ কওমকে *(শো'আরা ২৬/১২৭)*, (৪) ছালেহ (আঃ) স্বীয় ছামূদ কওমকে *(শো'আরা ২৬/১৪৫)*, (৫) লূত (আঃ) স্বীয় সাদূম কওমকে *(শো'আরা ২৬/১৬৪)*, (৬) শূ'আইব (আঃ) স্বীয় মাদিয়ান কওমকে *(শো'আরা ২৬/১৮০)*।

(৭) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য দা'ঈ হিসাবে পাঠিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا– وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا– 'হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে' *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ– 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(সাবা ৩৪/২৮)*। তিনি অবিশ্বাসীদের ধমক দিয়ে স্বীয় রাসূলকে বলেন,– أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ 'নাকি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা সেই বোঝায় কাবু হয়ে পড়েছে?' *(তূর ৫২/৪০; ক্বলম ৬৮/৪৬)*।

অতঃপর দাওয়াতের নীতি ব্যাখ্যা করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– 'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং অবশ্যই তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শিরক ও বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী এবং দুনিয়ার লোভে দ্বীনের দাওয়াত দানকারী কোন ব্যক্তি কখনোই 'নবীগণের ওয়ারিছ' হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারেন না।[১০৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا– 'তোমরা ঘন অন্ধকার রাত্রি সদৃশ ফিৎনাসমূহে পতিত হওয়ার পূর্বেই দ্রুত সৎকর্মসমূহের দিকে ধাবিত হও। যখন ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠবে মুমিন অবস্থায় ও সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায়। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় ও সকালে উঠবে কাফির অবস্থায়। সে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দ্বীনকে বিক্রি করবে'।[১০৮] এর অর্থ প্রকৃত কাফের অথবা কাফেরের ন্যায় কাজ করা দু'টিই হ'তে পারে *(মিরক্বাত)*।

নিঃস্বার্থ দাওয়াতের পুরস্কার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا– 'যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ পাপ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের পাপে কোন কমতি করা হবে না'।[১০৯]

---

১০৭. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ– তিরমিযী হা/২৬৮২; আবুদাঊদ হা/৩৬৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২১২।

১০৮. মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১০৯. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

এমনকি খায়বর যুদ্ধকালে সেনাপতি হিসাবে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণের সময় তাকে যুদ্ধের পূর্বে ইহূদীদের প্রতি ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাতে নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ– 'আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য সর্বোত্তম লাল উট কুরবানী করার চাইতে উত্তম হবে'।[১১০] যুদ্ধের ময়দানে এরূপ আহ্বানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শান্তিবাদী নীতি ফুটে ওঠে।

(৭) হক প্রকাশে ইতস্তত না করা এবং হক বিরোধীদের এড়িয়ে চলা :

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ– إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ– 'অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর'। 'বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট' *(হিজর ১৫/৯৪-৯৫)*। এজন্যই দেখা যায় যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় কওমের সমর্থনের অপেক্ষা না করে সমমনা ইয়াছরিববাসীদের আমন্ত্রণে সেখানেই হিজরত করেন। মক্কায় তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ– 'যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পর আর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না' *(আন'আম ৬/৬৮)*। সেখানে আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের নিদর্শন হিসাবে বলা হয়েছিল, وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا– 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। মদীনাতেও একই নির্দেশ দিয়ে বলা হয়,

---

১১০. বুখারী হা/৩৭০১, ২৯৪২; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০, রাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ)।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا– 'আর তিনি কুরআনের মধ্যে তোমাদের উপর এই আদেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা লোকদের থেকে কুরআনের আয়াত সমূহে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ গণ্য হবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*। অতএব কোন অবস্থাতেই ইসলামকে উপহাসকারী কাফির-মুনাফিকদের সঙ্গে উঠা-বসা করা যাবে না। এক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে মুসলিম তথা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর ভাষায় বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*।

(৮) সহনশীল হওয়া এবং দ্রুত ফল লাভের আশা না করা :

আব্দুল ক্বায়েস প্রতিনিধিদল ইসলাম কবুল করে মদীনায় আগমন করলে এবং কাফেলার মালামাল গুছিয়ে সকলের শেষে উপস্থিত হ'লে তাদের নেতা আশাজ্জ আল-'আছরী (الأَشَجُّ العَصْرِيُّ)-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ– قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللهُ جَبَلَنِى عَلَيْهِمَا قَالَ : بَلِ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا– قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَبَلَنِى عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ– 'নিশ্চয় তোমার মধ্যে দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ পসন্দ করেন, সহনশীলতা ও দূরদর্শিতা' (অর্থাৎ কোন কাজের ফল লাভে ব্যস্ততা প্রদর্শন না করা এবং লক্ষ্যে দৃঢ় থাকা ও সুফলের অপেক্ষা করা *(মির'আত)*। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি উক্ত দু'টি গুণ দ্বারা ভূষিত হয়েছি, নাকি আল্লাহ আমাকে উক্ত দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, বরং আল্লাহ তোমাকে উক্ত দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা। যিনি আমাকে এমন দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন, যে দু'টি গুণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন' *(আবুদাঊদ হা/৫২২৫)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুন্দর চরিত্র মূলতঃ স্বভাবগতভাবেই হয়ে থাকে। যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র রহমতেই লাভ করা সম্ভব। এদিক দিয়ে মানুষকে চারভাগে ভাগ করা যায়।-

(১) জন্মগতভাবে চরিত্রহীন। ফলে দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমেও যার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। (২) জন্মগতভাবে চরিত্রবান। কিন্তু সে দাওয়াত ও পরিচর্যা পায়নি। (৩) জন্মগত চরিত্রবান নয়। কিন্তু দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে চরিত্রবানদের দলভুক্ত হয়েছে। (৪) জন্মগত চরিত্রবান। অতঃপর দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে তা সমৃদ্ধ হয়েছে। উক্ত চারজনের মধ্যে প্রথম দু'জন যেকোন সময় পদস্খলিত হ'তে পারে। তৃতীয় জন তার চেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হবে। কিন্তু সচেষ্ট না থাকলে পদস্খলিত হবে। আর চতুর্থ জন সর্বোত্তম।

প্রথম দলের উদাহরণ আবু জাহল ও তার অনুসারীরা। দ্বিতীয় দলের উদাহরণ ঐসব লোক, যারা জন্মগতভাবে সৎ। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত পায়নি কিংবা পেয়েও কোন কারণবশে কবুল করেনি। এদের সংখ্যা সকল যুগে অগণিত। তৃতীয় দলের উদাহরণ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুসারী মুনাফিক, ফাসিক ও মুরতাদের দল। চতুর্থ দলের উদাহরণ আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী প্রমুখ বিশ্বসেরা মানুষ ও যুগে যুগে তাঁদের যথার্থ অনুসারীগণ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ শুরুতেই দাওয়াত কবুল করেছেন। যেমন স্ত্রী খাদীজা, ভাই আলী, আবুবকর প্রমুখ ছাহাবীগণ। কেউ দাওয়াত পেয়েও কারণবশে কবুল করেননি, পরে করেছেন। যেমন চাচা আব্বাস (রাঃ) ও অন্যেরা। কেউ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে আজীবন শত্রু হয়েছে। যেমন চাচা আবু লাহাব ও অন্যেরা। কেউ মুনাফিক ও ফাসেক হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুসারীরা। এমনকি কেউ ইসলাম ছেড়ে 'মুরতাদ' হয়ে গেছে। যুগে যুগে এটা হবে। কেননা দাওয়াতদাতা ভবিষ্যতের খবর রাখেন না। আর হেদায়াতের মালিক আল্লাহ।

দু'টি কারণে দাওয়াত দেওয়া অপরিহার্য। (১) দাওয়াত দানের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়ত পেশ করা। (২) অন্যদের বিরুদ্ধে দলীল কায়েম করা। যেন তারা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত পাইনি।

অতএব ব্যক্তি ও সমাজ পরিশুদ্ধির জন্য সর্বাবস্থায় সহনশীলতা ও দূরদর্শিতা আবশ্যক। সেই সাথে সর্বদা আত্মশুদ্ধিতা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা

যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,–بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ ‘আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য’ *(হাকেম হা/৪২২১)*। যেজন্য তিনি সর্বদা স্বীয় ছাহাবীগণকে উপদেশ ও পরিচর্যার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। সংস্কারক ব্যক্তি ও নেতাদের মধ্যেও উক্ত প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক।

(৯) ঐসব কাজ হ’তে বিরত থাকা, যার কারণে দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয় :

যেমন ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় জনৈক অসন্তুষ্ট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ– ‘হে মুহাম্মাদ! ন্যায় বিচার করুন! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! আমি যদি ন্যায়বিচার না করি, তবে কে ন্যায়বিচার করবে? যদি আমি ন্যায়বিচার না করি, তাহ’লে তুমি নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে’। তখন ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ– ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই’। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ– ‘আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই! লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করছি। নিশ্চয় এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা কুরআন তেলাওয়াত করে। যা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন শিকার হ’তে তীর বেরিয়ে যায়’।[১১১] উক্ত ব্যক্তি যুল-খুইয়াইছিরাহ তামীমী-কে পরবর্তীতে আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৩৫-৪১ হিঃ) সৃষ্ট চরমপন্থী জঙ্গী দল ‘খারেজীদের মূল’ (أَصْلُ الْخَوَارِجِ) বলা হয়।[১১২]

---

১১১. মুসলিম হা/১০৬৩ (১৪২), রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৩ পৃ.।

১১২. কুরতুবী, সূরা তওবা ৫৮ আয়াতের ব্যাখ্যা; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৫ পৃ.।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই নীতি অবলম্বন করেন প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলকারী মুনাফিকদের প্রতি। যারা ৩য় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধকালে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধকালে, ৯ম হিজরীতে তাবূক অভিযানকালে প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় অভিযানের খবর ফাঁসকারী ব্যক্তিকেও তিনি ক্ষমা করে দেন, মুসলিম হওয়ার কারণে। যাতে অন্যেরা না বলতে পারে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করছেন। যদি তিনি মুনাফিক ও ফাসিক মুসলমানদের নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করতেন, তাহ'লে মুসলিম সমাজের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হ'ত এবং তাতে দ্বীনের দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হ'ত।

(১০) নিজেকে ও নিজ সাথীদেরকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা এবং যাবতীয় কপটতা হ'তে বিরত থাকা :

কুরআনের বাহক মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। যেমন এক প্রশ্নের উত্তরে মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ– 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন'।[১১৩] আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি ও তাঁর সাথী ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ– 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকুকারী ও সিজদাকারী। তাদের চেহারা সমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*। অর্থাৎ তারা শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে কঠোর ও আপোষহীন। তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্যকে সত্য বলে ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলে। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকে ও তাঁর উপরেই ভরসা করে।

---

১১৩. আহমাদ হা/২৫৩৪১, ২৫৮৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।

কেবল ব্যক্তি নয়, বরং সংগঠনের সকলে একই বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ– 'মানুষ তার বন্ধুর রীতির উপরে থাকে। অতএব তোমরা দেখ সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে'।[১১৪] সৎকর্মশীল ঈমানদার নেতা ও কর্মীদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। যেমন তিনি বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,– خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ– 'শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'ল আমার যুগের। অর্থাৎ ছাহাবীগণ। অতঃপর তার পরের যুগের। অর্থাৎ তাবেঈগণ। অতঃপর তার পরের যুগের'। অর্থাৎ তাবে-তাবেঈগণ।[১১৫] এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন পরবর্তী যুগের মুসলমানদের নিকট অনুসরণীয় ও বরণীয়।

মুসলমানদেরকে মুত্তাক্বীদের আদর্শ হওয়ার ও মুত্তাক্বী সন্তান কামনা করার জন্য আল্লাহ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনায় বলেন, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا– 'আর যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

---

১১৪. তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।
১১৫. বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৩৭৬৭, রাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ); মিরক্বাত।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) নিজের জন্য দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ– 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কর'।[১১৬]

(১১) যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের প্রতি দরদী হওয়া :

সকল নবীই উক্ত গুণের অধিকারী ছিলেন, যাতে তারা হক শ্রবণ করে ও তা কবুল করে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াপরায়ণ' *(তওবা ৯/১২৮)*। এমনকি কওমের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ– 'তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেনা বিধায় তুমি হয়ত মর্মবেদনায় নিজেকে শেষ করে ফেলবে' *(শো'আরা ২৬/৩)*।

(১২) সর্বাবস্থায় খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় দৃঢ় থাকা :

খেজুর গাছে ঢিল মারলে সেখান থেকে খেজুর পতিত হয়। একইভাবে আল্লাহ্র পথের দাঈকে কষ্ট দিলে উত্তম ছবরের বিনিময়ে তার আমলনামায় ছওয়াব যুক্ত হয়। একেই বলা হয়, تُلْقَى بِالْحَجَرِ وَتَلْقِى بِالتَّمْرِ 'পাথর নিক্ষিপ্ত হয় ও খেজুর পতিত হয়'।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের বললেন, তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষ সম্পর্কে বল, যার পাতা পড়ে না এবং অমুক অমুকগুলি পতিত হয় না। যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে থাকে। ইবনু ওমর বলেন, আমার মনে হ'ল, এটি খেজুর গাছ হবে। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আবুবকর ও ওমর কিছুই বলছেন না। ফলে আমি কিছু বলাটা অপসন্দনীয় মনে করলাম। যখন তারা

১১৬. মুওয়াত্ত্বা হা/৭৩৮, ২/৩০৬ পৃ.।

কিছুই বললেন না, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটি হ'ল খেজুর গাছ। অতঃপর যখন আমরা উঠলাম, তখন আমি ওমরকে বললাম, হে আব্বা! আল্লাহ্র কসম! আমার মনে একথাই উদয় হয়েছিল যে, ওটা খেজুর গাছ। তখন তিনি আমাকে বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ– 'কোন বস্তু তোমাকে বলতে নিষেধ করেছিল?' আমি বললাম, আপনারা কিছু বলছেন না দেখে আমি কিছু বলাটা অপসন্দনীয় মনে করেছিলাম। তখন ওমর বললেন, لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا– 'তোমার বলাটা আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ছিল অমুক অমুক বস্তুর চাইতে' *(বুখারী হা/৪৬৯৮)*। ইবনু ওমর বলেন, أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ– 'আমি ধারণা করি, তিনি বলেছিলেন, সর্বোত্তম লাল উট কুরবানী করার চাইতে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪৩)*।

এর মধ্যে কতগুলি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন (১) শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া। (২) ছাত্র বা শিষ্যদের মেধা যাচাই করা। (৩) কঠিন বিষয়ে বুঝ হাছিলে উৎসাহিত করা। (৪) সঠিক উত্তর প্রদানে লজ্জা না করা। (৫) খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড, মাথা, পাতা, ফল, রস সবই যে বরকত মণ্ডিত সেটা বর্ণনা করা। (৬) খেজুর গাছ ঝোড়া জায়েয প্রমাণিত হওয়া। কেননা এটি অপচয় নয়, বরং সেখান থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। (৭) এই বৃক্ষের সাথে কালেমা ত্বইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সামঞ্জস্য বর্ণনা করা। কারণ এই কালেমায় বিশ্বাসের উপর মুমিনের জীবন দণ্ডায়মান থাকে। যেমন খর্জুর বৃক্ষ স্বীয় কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। (৮) এই বৃক্ষের সাথে মুমিনের জীবনের তুলনা করা। কারণ শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও খেজুর গাছের শাখা পতিত হয় না। তেমনি শত বিপদেও মুমিনের জীবন থেকে ঈমান ও নেক আমল বিচ্যুত হয় না। (৯) খেজুর গাছের মাথায় ঢিল মারলে খেজুর পতিত হয়। মুমিনকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলে এবং তাতে আল্লাহ্র জন্য ছবর করলে তার জন্য আল্লাহ্র রহমত পতিত হয়। (১০) খর্জুর বৃক্ষের সবকিছু অন্যের কল্যাণে সৃষ্ট। তেমনিভাবে মুমিন জীবনের সবটাই সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত।

(১৩) কথায় ও কাজে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া :

আল্লাহ বলেন, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ– 'সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই

সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৪৭; আলে ইমরান ৩/৬০)*। তিনি আরও বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার কওমের নিকট 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) হিসাবে পরিচিত ছিলেন *(ইবনু হিশাম ১/১৯৮)*। আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ– 'আমরা জানি যে, তারা যেসব কথা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ– كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না?' 'আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?' *(ছফ ৬১/২-৩)*। অতএব সমাজ সংস্কারক দাঈকে কথায় ও কাজে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হ'তে হবে।

(১৪) হক-এর উপর দৃঢ় থাকা ও আচরণ নম্র হওয়া :

হক আক্বীদার উপর দৃঢ় থাকা এবং আচরণ নম্র হওয়া দাঈর সবচেয়ে বড় গুণ। আল্লাহ স্বীয় রাসূল-কে বলেন, وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ– 'আর তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেভাবেই অবিচল থাক। তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তুমি বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি' *(শূরা ৪২/১৫)*। তিনি বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ– 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের মার্জনা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

তবে যদি কেউ ভুল ধরিয়ে দেয় এবং সেটি যদি হক হয়, তাহ'লে বিনা দ্বিধায় তা কবুল করে নেওয়া সংস্কারক দাঈ-র জন্য একান্ত আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ- الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ- 'তুমি সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের'। 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ- 'অহংকার হ'ল দম্ভভরে হক প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[১১৭] আর কোন অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ- 'যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(ঐ)*।

(১৫) ছোট-বড় সকল বিষয়ে সংস্কারের চেষ্টা করা :

আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ- 'আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন' *(হূদ ১১/১১৭)*। এখানে مُصْلِحُونَ অর্থ 'সংস্কারক ও সৎকর্মশীল'। যারা নিজেদেরকে ও সমাজকে কল্যাণের পথে সংস্কার করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَآءِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ- 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যারা সংস্কার করে'।[১১৮] এর ব্যাখ্যা 'আমর বিন 'আওফ (রাঃ)-এর

---

১১৭. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

১১৮. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুছ ছগীর হা/২৯০, রাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ); ছহীহাহ হা/১২৭৩।

বর্ণনায় এসেছে,– اَلَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَّتِى ‘আমার পরে লোকেরা যেসব সুন্নাতকে বিনষ্ট করে, সেগুলিকে যারা সংস্কার করে’।[১১৯]

হাদীছটির সনদ ‘যঈফ’ হ’লেও পূর্ববর্তী ছহীহ হাদীছের সমার্থক বিধায় মর্ম ছহীহ। আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَّعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُّطِيعُهُمْ– ‘অনেক মন্দ লোকের মধ্যে এরা কিছু সৎলোক হবে। তাদের কথা মান্যকারীর তুলনায় বিরুদ্ধাচরণ কারীদের সংখ্যা বেশী হবে’।[১২০]

একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : يَأْتِى اللهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَحْنُ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : لاَ وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ– ‘আমি একদিন সূর্যোদয়ের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এসময় তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে একদল লোক আসবে, যাদের জ্যোতি সূর্যের কিরণের ন্যায় হবে। তখন আবুবকর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তারা? তিনি বললেন, না। তোমাদের রয়েছে বহু কল্যাণ। বরং তারা হবে ঐসব নিঃস্ব ও মুহাজিরগণ, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে জমা হবে’।[১২১] উপরের হাদীছগুলির মর্মার্থ একটাই যে, হকপন্থী মুমিন সর্বদা সংস্কারবাদী হবেন। আর এ কারণেই তাদের সংখ্যা সকল যুগে কম হবে এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদের সংখ্যা বেশী হবে। তবে জান্নাতের সুসংবাদ কেবল তাদের জন্যই।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতের ইহকালীন ও পরকালীন প্রয়োজনীয় ছোট-বড় সবকিছু বিষয়ে অবহিত করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ

১১৯. তিরমিযী হা/২৬৩০; মিশকাত হা/১৭০, সনদ যঈফ।
১২০. আহমাদ হা/৬৬৫০; ছহীহাহ হা/১৬১৯।
১২১. আহমাদ হা/৭০৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৮৮।

يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– 'হে লোক সকল! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয়ে আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করেছি'।[১২২]

একজন মুমিন তার জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংস্কার করবে। যেমন প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে মুশরিকদের কিছু লোক ঠাট্টা করে বলে, قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ 'তোমাদের নবী কি তোমাদের সবকিছু বিষয়ে এমনকি পেশাব-পায়খানার মত বিষয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলামুখী হ'তে নিষেধ করেছেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৩৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা টয়লেটের মধ্যে হ'লে জায়েয আছে।[১২৩] তিনি আমাদেরকে ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, তিনটির কমে ঢেলা না নিতে এবং শুকনা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন'।[১২৪] অন্য বর্ণনায় কয়লার কথা এসেছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯)*।

উল্লেখ্য যে, পানি পেলে কুলূখের প্রয়োজন নেই।[১২৫] কুলূখ নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই।[১২৬] কুলূখের জন্য তিন বা বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করবে।[১২৭]

মোটকথা ছোট-বড় সকল বিষয়ে তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ (اَلتَّزْكِيَةُ وَ التَّرْبِيَةُ) তথা পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যাই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের মূল ভিত্তি। যা ব্যতীত শুধুমাত্র দাওয়াত কখনো ফলপ্রসূ হয় না এবং সমাজও পরিবর্তিত হয় না।

---

১২২. বায়হাক্বী শো'আব হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।
১২৩. বুখারী হা/৩১০২; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫, আবুদাঊদ হা/১১; মিশকাত হা/৩৭৩।
১২৪. মুসলিম হা/২৬২; আহমাদ হা/২৩৭৭০; মিশকাত হা/৩৩৬, মিরক্বাত।
১২৫. তিরমিযী হা/১৯; মির'আত ২/৭২।
১২৬. আবুদাঊদ হা/৪০; নাসাঈ হা/৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৪৯; মির'আত ২/৫৮ পৃ.।
১২৭. মুসলিম হা/২৬২; মিশকাত হা/৩৩৬; বুখারী হা/১৬১; মুসলিম হা/২৩৭; মিশকাত হা/৩৪১।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র বৈশিষ্ট্য সমূহ

(১) আল্লাহওয়ালা হওয়া :

আলেম, ফক্বীহ, বিচারক, শাসক ও সমাজনেতা সকলের জন্য উক্ত গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، 'কোন মানুষের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তাকে আল্লাহ কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত দান করেন। অতঃপর সে লোকদের বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। বরং সে বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও' *(আলে ইমরান ৩/৭৯)*।

(২) মধ্যপন্থী হওয়া :

যেমন (ক) ইখলাছের ক্ষেত্রে রিয়া ও শ্রুতি এবং হক প্রকাশ ও হক দাওয়াতের মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা। (খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধিতার বাড়াবাড়ি ও বাহ্যিক আমলগত বিষয়ে বাড়াবাড়ির মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা। (গ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা। অথচ তাঁর জান্নাত কামনা না করা। যেমন কিছু ভণ্ড ছূফীর অবস্থা। (ঘ) জান্নাতের সুখ-শান্তি কামনা করা, কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা না করা। যেমন কিছু কালাম শাস্ত্রবিদ ভণ্ড দার্শনিকের অবস্থা। (ঙ) আবেদগণকে নিষ্পাপ মনে করা ও আলেমগণকে হীন ধারণা করার মধ্যবর্তী উভয়কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা। (চ) কবীরা গোনাহগার মুমিনকে কাফের অথবা পূর্ণ মুমিন ধারণা করার মধ্যবর্তী তাকে ফাসেক মুমিন গণ্য করা। অর্থাৎ চরমপন্থী খারেজী ও শৈথিল্যবাদী মুরজিয়ার মধ্যবর্তী আক্বীদা অবলম্বন করা। (ছ) ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অধিক উদারতা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে দৈহিক কৃচ্ছ্রতা ও ইবাদতে অবহেলার মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা।

(৩) সালাফী পথের অনুসারী হওয়া :

সালাফী পথ অর্থ পূর্বসূরীদের পথ। শারঈ পরিভাষায় ছাহাবায়ে কেরামের পথ। মুমিনের কর্তব্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হওয়া এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করা। হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ- وَفِى رِوَايَةٍ عن جَابِرٍ : وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)-

‘একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের (ফজরের) ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বলে মর্মস্পর্শী উপদেশ দিলেন। তাতে আমাদের চক্ষুসমূহ সিক্ত হ’ল ও হৃদয়সমূহ বিগলিত হ’ল। এসময় একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং আমীরের আদেশ শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি থেকে দূরে থাকবে। কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা।[১২৮] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ‘আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’ *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَآءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ- ‘আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি স্বচ্ছ দ্বীনের উপর। যার রাত্রি হ’ল দিবসের ন্যায়। আমার পরে যে কেউ এথেকে পথভ্রষ্ট হবে, সে ধ্বংস হবে’...।[১২৯]

---

১২৮. আহমাদ হা/১৭১৮৫; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

১২৯. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একবার ওমর (রাঃ) এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমরা ইহূদীদের অনেক কাহিনী শুনি যা আমাদের চমৎকৃত করে। আপনি কি অনুমতি দিবেন যে, আমরা সেসব থেকে কিছু লিখে রাখি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي– 'তোমরা কি দিকভ্রান্ত হয়েছ যেমন ইহূদী-নাছারারা হয়েছে? অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট এসেছি একটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে। যদি আজকে মূসা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁর কোন উপায় থাকত না আমার অনুসরণ করা ব্যতীত'।[১৩০]

উপরের হাদীছগুলিতে স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে যে, (১) আল্লাহভীরুতাই হ'ল ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করাই হ'ল সামাজিক ঐক্য ও শৃংখলার রক্ষা কবচ। (৩) মতভেদ দূরীকরণে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বুঝই হবে অগ্রাধিকার যোগ্য। (৪) শরী'আত ব্যাখ্যার নামে ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবন থেকে দূরে থাকতে হবে। (৫) রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া দ্বীন ছিল পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। যেকোন মূল্যে সেই স্বচ্ছ দ্বীনের দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সেটাই হ'ল সালাফী পথ বা ছিরাতে মুস্তাক্বীম।

একারণেই ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর শিষ্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে বলেছিলেন, إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحابه دِينًا لَّمْ يَكُنِ الْيَومَ دينًا– 'নিশ্চয় যে সকল বিষয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের যুগে দ্বীন ছিল না, এযুগে তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না'। তিনি আরও বলেন, مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْإِسْلاَمِ بِدْعَةً فَرَآهَا حَسَنَةً، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صـــ قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ– 'যে ব্যক্তি ইসলামে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, অতঃপর তাকে উত্তম মনে করল, সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতে খিয়ানত করেছেন' । কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا– 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।[১৩১]

---

১৩০. আহমাদ হা/১৫১৯৫; দারেমী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১৭৭, ১৯৪; ইরওয়া হা/১৫৮৯।
১৩১. আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী, আল-ইনছাফ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি) পৃ. ৩২।

আল্লাহ রহম করুন ইমাম মালেক-এর উপর। তিনি কত সুন্দরই না বলতেন, لاَ يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا– 'এই উম্মতের শেষের লোকদের অবস্থা সংশোধিত হবে না ঐ বস্তুর মাধ্যমে ব্যতীত, যা তার প্রথম যুগের লোকদের অবস্থা সংশোধন করেছিল (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ)'।[১৩২] ছাহাবীগণ কিতাবুল্লাহকে জানতেন, যেমনভাবে তা নাযিল হয়েছিল। সুন্নাহকে জানতেন যেমনভাবে তা পৌঁছেছিল। আল্লাহ চান যে, এই উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকুক, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার উপর বিজয়ী থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় নিন্দিত পরবর্তী যুগে শরী'আত ব্যাখ্যার নামে যে সীমাহীন মতভেদের ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বাঁচার একটাই পথ, ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যার সামনে আত্মসমর্পণ করা। তাদের সামনেই অহী নাযিল হয়েছে এবং তাঁরাই ছিলেন অহি-র বাস্তব রূপকার। নিঃসন্দেহে সেটাই ছিল 'হক'। আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ– 'বস্তুতঃ যদি সত্য তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হ'ত, তাহ'লে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমরা তাদেরকে উপদেশ (কুরআন) প্রদান করেছি। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(মুমিনূন ২৩/৭১)*।

বাস্তবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মতভেদের উৎস হ'ল ধারণা ও কল্পনা। যা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ– 'ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*। আর একারণেই মুসলিম সমাজ তাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত।

(৪) শরী'আতের নির্দেশ পালনে অগ্রণী হওয়া :

কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ মান্য করার ব্যাপারে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে সর্বদা ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় দ্রুত সেটি আমল করার চেষ্টা করা। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন কাজ দেখলে কিভাবে তা দ্রুত সম্পাদন

১৩২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/২৪১ পৃ.।

করতেন, তার অন্যতম নমুনা এই যে, (ক) একবার জুতার নীচে নাপাকী আছে মর্মে অহি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় নিজের জুতা জোড়া খুলে বাম দিকে রাখেন। এটি দেখে মুক্তাদী ছাহাবীগণ স্ব স্ব পায়ের জুতা খুলে ফেলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি মুক্তাদীদের নিকট বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর বলেন, যখন তোমরা মসজিদে আসবে, তখন দেখবে তার জুতার তলায় কোন নাপাকী আছে কি-না। থাকলে সেটা মুছে ফেলবে। অতঃপর ঐ জুতা নিয়ে ছালাত আদায় করবে'।[১৩৩]

(খ) মুযার গোত্রের লোকেরা জীর্ণ-শীর্ণ ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় এলে রাসূল (ছাঃ) নিজের ঘরে কিছু না পেয়ে বেলালকে আযান দিতে বলেন। অতঃপর লোকেরা এলে তিনি তাদের সাথে নিয়ে (যোহরের) ছালাত আদায় করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে সূরা নিসার প্রথম আয়াত ও সূরা হাশর ১৮ আয়াত পাঠ করেন। তখন জনৈক আনছার ছাহাবী একটি ভারী থলে নিয়ে আসেন। যা তিনি বহনে অক্ষম হচ্ছিলেন। তারপর একে একে সবাই দান করতে থাকে। ফলে সেখানে খাদ্য ও বস্ত্রের দু'টি উঁচু স্তূপ হয়ে যায়। যা দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অতঃপর তিনি বললেন,

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ-

'যে ব্যক্তি ইসলামে একটি সুন্দর রীতি চালু করল, তার জন্য সে নেকী পাবে এবং তার উপর যারা আমল করবে, তাদের সকলের নেকী সে পাবে। অথচ অন্যদের নেকীতে কোন কমতি করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করল, তার পাপ তার উপরে বর্তাবে এবং উক্ত রীতির উপর যারা চলবে তাদের সকলের পাপ তার উপর চাপানো হবে। অথচ অন্যদের পাপভার আদৌ কম করা হবে না'।[১৩৪] অতএব যেকোন নেকীর কাজ সবার আগে শুরু করার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত। যেন অন্যদের নেকীগুলি নিজের আমলনামায় যুক্ত হয়।

উপরোক্ত হাদীছে বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সাইয়েআহ অর্থাৎ সুন্দর বিদ'আত ও মন্দ বিদ'আতের দলীল খোঁজা অবান্তর মাত্র। কেননা এটি ছিল সুন্নাতে হাসানাহ। যা পূর্ব থেকেই চালু ও বৈধ ছিল। অথচ বিদ'আতের কোন

১৩৩. আবুদাঊদ হা/৬৫০; দারেমী হা/১৩৭৮; মিশকাত হা/৭৬৬।
১৩৪. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়, রাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ)।

ভিত্তি শরী'আতে থাকে না। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর দ্বীনের মধ্যে যেকোন নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত। আর সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হি.) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقُولُ قَلِيلاً وَيَعْمَلُ كَثِيرًا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَثِيرًا وَيَعْمَلُ قَلِيلاً– 'মুমিন কথা কম বলে, আমল বেশী করে। আর মুনাফিক কথা বেশী বলে, আমল কম করে'।[১৩৫] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যখন ঈমানের শাখা সমূহ একত্রিত হয়, তখন তুমি সেটাকে অগ্রাধিকার দাও, যেটাতে আল্লাহ বেশী খুশী হন। অনেক সময় অনুত্তম ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি অপেক্ষা সৎকর্মে অধিক অগ্রণী হয় এবং সে উত্তম ব্যক্তির চাইতে বেশী নেকী অর্জন করে। অতএব সর্বোত্তমটি করার চাইতে যেটি সবচেয়ে উপকারী সেটাই করা উত্তম।... যেমন কোন ব্যক্তি যদি রাত্রিতে কুরআন তেলাওয়াত ও তা অনুধাবনে বেশী উপকৃত হন এবং ছালাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ তার জন্য ভারী হয়, তবে সে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত ও তা অনুধাবন করবে'।[১৩৬] অনেকের উপর আল্লাহ সৎকর্মের দুয়ার সমূহ একটির বদলে আরেকটি খুলে দেন। কারুর উপরে সবধরনের দুয়ার খুলে দেন। ফলে তিনি অধিক নেকী অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। তিনি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের আটটি দরজা থেকে আহূত হবেন। আর এটি হ'ল আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী এটি দান করে থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) এভাবে আহূত হবেন বলে হাদীছে এসেছে। যেমন আমাদের মধ্যে কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবেন কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) আবুবকরকে বলেন,–نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ 'হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৩৭]

অতএব নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কারই হবে সালাফী পথের অনুসারীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। যেমন জান্নাতের সর্বোচ্চ 'তাসনীম' ঝর্ণার পানি মিশ্রিত শরাব পানের জন্য উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ বলেন,–وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 'আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*।

---

১৩৫. আবু নু'আইম আল-ইছফাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি.), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫ হি.) ৬/১৪২ পৃ.।

১৩৬. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*-এর ব্যাখ্যা ৭/৬৫১।

১৩৭. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায় 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তারবিয়াহ্র প্রকারভেদ

(১) জ্ঞানগত পরিচর্যা :

যাতে মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও বুঝ শক্তি বৃদ্ধি পায় সর্বদা সে চেষ্টা করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তাঁর নিকট দো'আ করতে বলেছেন, وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا– 'তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। এজন্য সর্বদা বিশুদ্ধ দ্বীনী ইলমের চর্চা করতে হবে। অশুদ্ধ, অবিশ্বস্ত ও সন্দেহযুক্ত দ্বীনী সাহিত্য ও বক্তব্য সমূহ পরিহার করতে হবে। একই সাথে সেক্যুলার সাহিত্য ও বক্তব্য সমূহ থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের গৃহকে বিশুদ্ধ দ্বীন বিরোধী সকল প্রকার সাহিত্য ও প্রচারণা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(২) চেতনা সৃষ্টির পরিচর্যা :

যা মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা হ'তে ভীত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। এজন্য সর্বদা মানুষকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন মূলক আয়াত ও হাদীছ সমূহ শুনাতে হবে। সেই সাথে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের বিগত ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে। সাথে সাথে জান্নাতের সুখ-শান্তির আয়াত ও হাদীছ সমূহ পেশ করতে হবে।[১৩৮]

(৩) কর্মগত পরিচর্যা :

এর মাধ্যমে বাস্তব সম্মত কর্মপন্থা বিষয়ে মুমিনকে সচেতন করে তুলতে হবে। যা মুসলমানদের সমাজ ও জনপদকে অন্যায় প্রতিরোধে সক্ষম করে তুলবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ– 'নিশ্চয় আমাদের বাহিনীই হ'ল বিজয়ী' *(ছাফফাত ৩৭/১৭৩)*। আল্লাহ্র এই বাহিনী ফেরেশতাগণের মধ্য

১৩৮. এজন্য হা.ফা.বা প্রকাশিত 'নবীদের কাহিনী' ১, ২, ৩ নিয়মিতভাবে পাঠ করুন - প্রকাশক।

থেকে হ'তে পারে। কিংবা শত্রু-মিত্র যেকোন মানুষের মধ্য থেকে হ'তে পারে। বান্দার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে হক-এর বিজয়ে কাজ করে যাওয়া। আর আল্লাহ্র দায়িত্ব হকপন্থী বান্দাকে সাহায্য করা। যেমন তিনি বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'আমরা তোমার পূর্বে রাসূলগণকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ (মো'জেযা সমূহ) নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর যারা পাপাচারী ছিল আমরা তাদের বদলা নিয়েছি। আর আমাদের উপর দায়িত্ব হ'ল মুমিনদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭)*। এক্ষণে তিনি সেটি কিভাবে করবেন, কার মাধ্যমে করবেন, সেটি তাঁর এখতিয়ার।

(৪) ঈমানী পরিচর্যা :

ঈমান যাতে তাযা থাকে এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা যাতে সর্বদা বৃদ্ধি পায়, সেজন্য নেতা-কর্মীকে নিজ নিজ তাকীদে নিজের ও সাথীদের ঈমানী পরিচর্যা করতে হবে। নিয়মিত ছহীহ আক্বীদা ও আমলের বই ও পত্রিকা পাঠ করা, নিজের গৃহ ও পরিবারকে ঈমানী দুর্গে পরিণত করা একান্তভাবেই আবশ্যক। এজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন আদর্শবাদী আমীরের আনুগত্য করা ও তাঁর সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকা।

তারবিয়াহ্র বাধাসমূহ

(১) আক্বীদার বিষয়গুলিকে হালকা মনে করা। (২) সুন্নাতকে ছোট-খাট বিষয় বলে হীন গণ্য করা। (৩) নিজের সিদ্ধান্তের উপর হঠকারিতা করা। (৪) শিরক ও বিদ'আত এবং সেক্যুলার আদর্শের সাথে আপোষ করা। (৫) অলসতা, বিলাসিতা ও অপচয় করা। (৬) আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া। (৭) আমীরের নেকীর আদেশকে যেনতেন অজুহাতে অমান্য করা। (৮) আখেরাতের লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করা। (৯) পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলার চিন্তা হ'তে দূরে থাকা। (১০) আত্মম্ভরিতা ও কৃপণতা অবলম্বন করা এবং মানুষের সাথে আর্থিক লেন-দেন ও সামাজিক আচরণ সুন্দর না হওয়া। (১১) সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল হারামকে হালাল করার প্রবণতা। যা সাধারণতঃ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ও ঋণ দানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন নগদ বিক্রিতে কম দাম এবং বাকী বা কিস্তির বিক্রিতে বেশী দাম,

বন্ধকী জমি আবাদ করে লাভবান হওয়া, বিভিন্ন অত্যাচারমূলক খাজনা ও ট্যাক্স নির্ধারণ করা ইত্যাদি। এটি আরও মারাত্মক গোনাহের কারণ হয় যখন শিরক ও বিদ'আত সমূহকে ধর্মের নামে বৈধ গণ্য করার হীলা-বাহানা করা হয়। যেমন হুলূল ও ইত্তিহাদ, অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ, সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার অংশ সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করা অথবা সেগুলিকে বান্দার গুণাবলীর ন্যায় মনে করা, নিজেদের মনগড়া আইনকে ইসলামী আইনের উপরে স্থান দেওয়া বা তার সম পর্যায়ের মনে করা, ধর্মের নামে মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-চেহলাম, ছবি-মূর্তি ও স্থানপূজা, ব্যক্তি ও কবরপূজা, ইবাদতের নামে বিশেষ সময়ে ও বিশেষ রাতে দলবদ্ধভাবে অনুষ্ঠান করা ও সরবে রাত্রি জাগরণ করা, দেহকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধনা এবং যিকরের নামে ফানাফিল্লাহ-বাক্বাবিল্লাহ্র কসরত করা ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে এসব ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও মন্দ রীতি-নীতি হ'তে মুক্ত করে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দেওয়া সংস্কারক নেতা-কর্মীদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

উপসংহার :

এভাবে তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ তথা পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যার মাধ্যমে নিজেকে ও নিজ পরিবার ও সমাজকে গড়ে তুলতে পারলে জীবনের প্রতিটি শাখায়-প্রশাখায় ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করবে। গাছের গোড়ায় ঈমানের বারি সিঞ্চন না থাকলে এবং তার কাণ্ডে ও পত্রে ইসলামের সজীবতা না থাকলে, সর্বোপরি ঈমানের পবিত্র বৃক্ষটি নিখুঁত না হ'লে তা থেকে নিখুঁত ফল আশা করা যায় না। সেটি করার আগেই দ্রুত ফল লাভের আশা করলে তাতে ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেমন ব্যর্থ হয়েছেন যুগে যুগে অনেক রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চাভিলাষী সমাজনেতাগণ। যদিও সাময়িক টোটকা অনেক সময় প্রয়োজন হয় এবং তা ভাল ফল দেয়। যদি না সেখানে আগেই পরিবেশ অনুকূলে থাকে। আর সেটার জন্যও প্রয়োজন নিয়মিত দাওয়াত ও পরিচর্যা। সেকারণ মিসরীয় বিদ্বান ক্বাযী হাসান আল-হুযায়বী (১৩০৯-১৩৯৩ হি./১৮৯১-১৯৭৩ খৃ.) বলেছেন,-أَقِيموا دَولَةَ الإسلامِ في قُلوبِكُم، تُقَمْ لَكُم في أرضِكُم 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে'।[১৩৯] এর চেয়ে উত্তম হ'ল আল্লাহ্র বাণী যেখানে তিনি বলেছেন, وَقُلِ

১৩৯. আলবানী, তাখরীজুত ত্বাহাবী ৬৯ পৃ.।

اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– ‘তুমি বল, তোমরা কাজ করে যাও। অচিরে তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ। আর নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন’ *(তওবা ৯/১০৫)*। বস্তুতঃ সমাজের সর্বব্যাপী জাহেলিয়াত দূর করার জন্য একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আদর্শবাদী আমীরের নেতৃত্বে জামা‘আতবদ্ধভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কেননা আমীর বিহীন জীবন বিচ্ছিন্ন বকরীর মত। যাকে দ্রুত নেকড়ে ধরে ফেলে’।[১৪০] অতএব জান্নাত পিয়াসীগণ সাবধান!

পরিশেষে আল্লাহ স্বীয় কালেমাকে সমুন্নত করুন এবং নিয়মিত পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যার মাধ্যমে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলার জন্য তার নেককার বান্দাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

প্রশ্নমালা

১. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী কয়টি কী কী?
২. তাযকিয়া ও তারবিয়াহর মাধ্যমগুলো কী কী?
৩. তাযকিয়া ও তারবিয়াহ-এর নীতি সমূহের ব্যাখ্যা কী?
৪. তাযকিয়া ও তারবিয়াহ-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ কী কী?
৫. তারবিয়াহ্র প্রকারভেদ কয়টি ও কী কী?
৬. তারবিয়াহ্র বাধা সমূহ কী কী?

১৪০. আহমাদ হা/২৭৫৫৪; আবুদাঊদ হা/৫৪৭; নাসাঈ হা/৮৪৭; মিশকাত হা/১০৬৭।

দাওয়াত ও জিহাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম প্রকাশ : ১৯৯৩ খৃ.
৫ম সংস্করণ : মে ২০২৪ খৃ.

بسم الله الرحمن الرحيم

দাওয়াত ও জিহাদ

[১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল মোতাবেক ১৩৯৮ সালের ১২ ও ১৩ই বৈশাখ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ময়দানে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দু'দিনব্যাপী ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও (তৎকালীন) কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মুহতারাম আমীর জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ]*

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ-

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জাতীয় সম্মেলন ১৯৯১ ও তাবলীগী ইজতেমার সম্মানিত সভাপতি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, সুধীমণ্ডলী, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে আগত ভাই ও ভগিনীগণ এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তরুণ কর্মী ও সাথীবৃন্দ!

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল মোতাবেক ১৩৮৬ সালের ২২ ও ২৩শে চৈত্র শনি ও রবিবার রাজধানী ঢাকাতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১ম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলনের দীর্ঘ এগার বছর পরে বাংলাদেশের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত যেলা শহর রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে আজকের অভূতপূর্ব সম্মেলনে মিলিত হ'তে পেরে আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলি 'আলহামদুলিল্লাহ'। এই স্থানেই ১৩৫৫ সালের ২৮শে ফাল্গুন মোতাবেক ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ শনিবার 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ'-এর ১ম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

---

* বর্তমানে উক্ত স্থানটিতে মারকাযের ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার পাশ দিয়ে বেলপুকুর-আম চত্বর, কাশিয়াডাঙ্গা-চাঁপাই বাইপাস সড়ক নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে বড় পুকুরটি ভরাট করে সেখানে বিআরটিএ অফিস স্থাপিত হয়েছে। *-প্রকাশক*।

হয়েছিল।[১৪১] সেদিন সেই কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মেযবানের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন নওদাপাড়া এলাকার আহলেহাদীছ জনগণ। আজও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার মেযবানের মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে রাজশাহী ও নওদাপাড়া এলাকার ভাইগণ তাঁদের পুরানো ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন- এজন্য তাঁদেরকে জানাই অসংখ্য মুবারকবাদ। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলের এই খালেছ দ্বীনী খিদমত কবুল করেন এবং ইহকাল ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা প্রদান করেন-আমীন!

বন্ধুগণ! উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশ অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টিকারী খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ্ব হ'তে শতবর্ষ ব্যাপী পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মহান নেতৃবৃন্দকে। আমরা স্মরণ করি ১৮২১ সালে হজ্জের সফরে বাংলাদেশ অঞ্চলে পদার্পণকারী ইতিহাসের অমর নায়ক সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬ হি./১৭৮৬-১৮৩১ খৃ.) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হি./১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.)-এর নিকট বায়'আতকারী মহান সংগঠক চাঁপাই নবাবগঞ্জের পাকা নারায়ণপুরের কৃতি সন্তান বহরমপুর জেলের বীর কয়েদী রফী মোল্লাকে ও তাঁর পাঁচজন মুজাহিদ শাগরিদ, পুত্র মৌঃ আমীরুদ্দীন নারায়ণপুরী, মৌঃ আসীরুদ্দীন নারায়ণপুরী, মৌঃ আব্দুল করীম বাসুদেবপুরী, মৌঃ আব্দুল কুদ্দূস মোল্লাটুলী ও মৌঃ ইব্রাহীম মণ্ডল দিলালপুরী প্রমুখ আহলেহাদীছ আন্দোলনের

১৪১. গৃহীত: এসতেকবালিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হামিদের লিখিত অভিভাষণ এবং 'আহলেহাদীস পরিচিতি' পৃ. ৪৬ ও ১১২; উক্ত অভিভাষণ থেকে জানা যায় যে, ঐ দিন জনাব আব্দুল হামিদের প্রস্তাব মতে পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র (১৮৭৬-১৯৪৮ খৃ.) নামানুসারে নওদাপাড়ার নাম রাখা হয় 'জিন্নাহ নগর'। এখানে তিনি হামিদপুর নওদাপাড়া পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়)। এছাড়া বর্তমানে উক্ত স্থানে গার্লস স্কুল ও নওদাপাড়া বাজার জামে মসজিদ স্থাপিত। উল্লেখ্য যে, জনাব আব্দুল হামিদ (১৮৮৭-১৯৭৬) ছিলেন রাজশাহী মুসলিম লীগের সভাপতি ও পূর্ব পাকিস্তান লেজিসলেটিভ এসেম্বলি তথা আইন সভার সদস্য (এমএলএ)। তাঁর পিতা হাজী লাল মোহাম্মাদ সরদার (১৮৪৮-১৯৩৬ খৃ.) দুই মেয়াদে অবিভক্ত বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (এমএলসি) ছিলেন। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। জনাব আব্দুল হামিদের পুত্র এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান (১৯২৬-১৯৭৫) স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান (২০২১ খৃ.) মেয়র এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান লিটন (জন্ম : ১৪ আগস্ট ১৯৫৯) এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। হাজী লাল মোহাম্মাদের অপর পুত্র আব্দুছ ছামাদ (১৯১৩-২০০৫) ছিলেন ১৯৪১ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বছর রাজশাহী আদালতের প্রথম শ্রেণীর অনারারী (অবৈতনিক) ম্যাজিস্ট্রেট। এছাড়াও তিনি ১৯৫২ সালে পাক্ষিক 'প্রবাহ' অতঃপর ১৯৬১ সালে প্রথমে পাক্ষিক ও পরে সাপ্তাহিক 'রাজশাহী বার্তা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একান্ত হিতাকাংখী ছিলেন।

মহান পূর্বসূরীদেরকে। আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জিহাদ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের বীর সেনাপতি পাটনার মাওলানা এনায়েত আলীকে (১২০৭-১২৭৪ হি./১৭৯২-১৮৫৮ খৃ.), যিনি দু'বারে প্রায় একযুগ ধরে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা এবং বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলে ও পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণা ও মালদহ অঞ্চলে ব্যাপক দাওয়াত ও জিহাদের প্রচার চালিয়ে শিরক ও বিদ'আত অধ্যুষিত অত্র এলাকাসমূহে হেদায়াতের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তীকালে আমীরুল মুজাহিদীন আমীর আব্দুল্লাহ্র (১২৭৮-১৩২০ হি./১৮৬২-১৯০২ খৃ.) নির্দেশক্রমে কুমিল্লার বুড়িচং উপযেলার পারুয়ারা গ্রামের মুজাহিদ সন্তান মাওলানা আকরাম আলী খান (১৮৫৫-১৯৩৭ খৃ.) বর্তমান পাকিস্তান ও আফগান সীমান্ত অঞ্চলের মূল মুজাহিদ কেন্দ্র 'আসমাস্ত' হ'তে রাজশাহীর দুয়ারীতে এসে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জিহাদের অন্যতম কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যা আজকের সম্মেলন স্থল হ'তে মাত্র তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

আমরা স্মরণ করব মাওলানা এনায়েত আলীর অন্যতম খলীফা সপুরা মিয়াঁপাড়ার স্বনামধন্য নেতা ঝাবু সরদার ও ঝাগু সরদার নামক প্রভাবশালী দু'ভাইকে। যাঁদের প্রচেষ্টায় রাজশাহীতে ৩৬ জাতির হিন্দু সবাই মুসলমান হয়ে যায় এবং রাজশাহী শহরে আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়। যাঁর পুত্র মাওলানা গাযী মুনীরুদ্দীনের আমলে বর্তমান সপুরা সরকারী হাউজিং এষ্টেটের দখলীভুক্ত ২৪ বিঘা জমির উপরে বিরাট মাদ্রাসা বনাম মুজাহিদ ট্রেনিং ও রিক্রুটিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাঁদের প্রতিষ্ঠিত জামে মসজিদটি এখন রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত মসজিদ হিসাবে বর্তমান আছে।[১৪২]

আমরা স্মরণ করব মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০ হি./১৮০৫-১৯০২ খৃ.) কীর্তিমান ছাত্র রাজশাহীর জামিরা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কারামাতুল্লাহ ও তৎপুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ও তাঁদের সম-সাময়িক যমুনা পারের মৌলভী এলাহী বখ্শ শরীফপুরী (জামালপুর), মৌলভী নে'মাতুল্লাহ বর্ধমানী (চাপড়া, বাগমারা, রাজশাহী), মৌলভী ইসহাক দৌলতপুরী (কুষ্টিয়া), মৌলভী আসীরুদ্দীন নদীয়াভী (মালদহ) প্রমুখ ওলামায়ে কেরামকে, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে বৃহত্তর রাজশাহীর বিস্তীর্ণ এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার হয় ও অগণিত মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন, *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। এছাড়াও স্মরণ করি বাংলার গ্রামে-গঞ্জের জানা-অজানা অসংখ্য মুজাহিদ, গাযী

১৪২. ১৯৯২ সালের প্রথম দিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। যার অনতিদূরে লেখক-এর উদ্যোগে তাঁর সংগঠন কর্তৃক ১৯৯৪ সালে আলীশান সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *-প্রকাশক*।

ও শহীদানকে, যাঁদের জান ও মালের অতুলনীয় ত্যাগের বিনিময়েই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্ভেজাল ইসলামের এ মহান আন্দোলন।

অতঃপর আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করব 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র এককালের তরুণ ছাত্র কর্মী ঢাকার সাজ্জাদুল করীম ও টাংগাইলের আবুল কাসেম-এর প্রতি। ১৯৮০ সালের জুন মাসে কবরপূজার বিরুদ্ধে 'যুবসংঘে'র মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় কবর পূজারীদের হামলায় ঢাকার রাজপথে যাদের প্রথম রক্ত গড়িয়েছিল। আমরা শ্রদ্ধা জানাই কুমিল্লার 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সেই তরুণ তিনটি ভাইকে[১৪৩], ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে যারা চক্রান্তকারীদের হামলায় পিষ্ঠ হয়। ফয়যুল নামের ১৫ বছরের তরুণ ভাইটি হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান থেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসে। এমনিভাবে গত দু'বছরে অলস মস্তিষ্ক নেতাদের দ্বারা অপমানিত ও বিভিন্নমুখী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বা আজও হচ্ছেন, অথচ অসীম ধৈর্যের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সেই সকল কর্মী ও উপদেষ্টা ভাইদের প্রতি রইল আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম দো'আ। বিশেষ করে সাবেক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও আজকের প্রধান অতিথি ভাই আব্দুল মতীন সালাফীর কথা বলতে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, যাঁকে এই সব তথাকথিত নেতাদের ষড়যন্ত্রে মাত্র তিন ঘণ্টার সরকারী নোটিশে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়।[১৪৪] আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকল প্রকার ত্যাগ ও কুরবানীর উত্তম জাযা ইহকালে ও পরকালে দান করেন-আমীন!

---

১৪৩. ফয়যুল ইসলাম (গোয়ালজুর, কানাইঘাট, সিলেট), রুস্তম আলী (জগৎপুর, কুমিল্লা), আব্দুল কবীর (ভৈষেরকুট, কুমিল্লা)। ঘটনাস্থল: দেবীদ্বার উপযেলাধীন ভৈষেরকুট প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখে, ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে। এরা তখন জগৎপুর মাদ্রাসার ছাত্র ও যুবসংঘের 'কর্মী' ছিল। উক্ত স্থানে তারা মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর (১৯২১-২০০১ খৃ.) জালসায় ওয়ায শুনতে গিয়েছিল।

১৪৪. আব্দুল মতীন সালাফী (১৯৫৪-২০১০ খৃ.) সঊদী সরকারের অধীনে চাকুরীরত মাবঊছ হিসাবে ১লা জানুয়ারী ১৯৮০ হ'তে ২রা জুলাই ১৯৮৯ পর্যন্ত ৯ বছর ৭ মাস ২ দিন বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। এই সময় তিনি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ভারতের পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর যেলার করণদীঘি থানার অন্তর্গত ভুল্কী গ্রামে। স্বদেশে ফিরে গিয়ে বিহারের কিষাণগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে খাগড়া এলাকায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক দু'টি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সমাজ কল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখেন। ২০১০ সালের ১৬ই জানুয়ারী শনিবার কিষাণগঞ্জে নিজ বাড়ীতে তিনি ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং নিজ গ্রাম ভুলকীতে সমাহিত হন। =দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী ১৩/৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১০। আব্দুল মতীন সালাফী ভিসা নিয়ে ঢাকা হয়ে এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন ও ভাষণ দিয়েছিলেন। রাজশাহী টেক্সটাইল মিল্সের গেষ্ট হাউসে তাঁকে রাখা হয়। তাঁর যাতায়াতে সরকারী নিরাপত্তার ব্যাপারে অন্যতম উপদেষ্টা পাবনার মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলামের একক অবদান ছিল।

পরিশেষে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে আগত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র আন্দোলন পাগল ভাই-বোন ও তাদের শুভাকাংখী মুরব্বিয়ান ও অন্যান্য সুধী মণ্ডলীকে এবং শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামকে, যাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত আগমনে রাজশাহী মহানগরীর জনপদ আলোড়িত হয়েছে এবং বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন জোয়ারের শুভ সূচনা হয়েছে।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ভাই ও বোনের নিঃস্বার্থ দ্বীনী খিদমত যা কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত, তুমি তা কবুল কর এবং ইহকালে ও পরকালে জাযায়ে খায়ের আতা কর- আমীন! ইয়া রব্বাল 'আলামীন!!

আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বন্ধুগণ!

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে প্রধানত দু'ভাবে। এক- ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের নেতৃত্বে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে এবং দুই- আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে।

ভূমধ্যসাগর হ'তে আরব সাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে আরব বণিকগণ ভারতবর্ষ হয়ে সুদূর চীন দেশে বাণিজ্য করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তাদের মাধ্যমে এই দীর্ঘ সমুদ্র পথের কুলে কুলে অবস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তাদের অনেকে এসব স্থানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কেউ কেউ স্থায়ী বসতি স্থাপন করে জীবন অতিবাহিত করেন। ইন্দোনেশিয়ার মশলাকেন্দ্র মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে আরব বণিকদের যাতায়াত ছিল খুব বেশী। বলা চলে মালাক্কা কেন্দ্র থেকেই ইসলাম আরব বণিকদের মাধ্যমে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অত্র অঞ্চলের বৌদ্ধরা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে কোনরূপ সামরিক অভিযান ছাড়াই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের মিন্দানাঁও প্রভৃতি এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। এ অঞ্চলের মুসলমানগণ 'শাফেঈ' বলে খ্যাত। তবে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলাই শ্রেয়। একই যাত্রাপথে আরব বণিকগণ চট্টগ্রাম বন্দরেও

আসতেন। যা তখনকার দিনে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল না। জাহায ডুবির কারণে বা অন্যান্য কারণে তারা চট্টগ্রাম এলাকায় নিজেদের মধ্যকার নির্বাচিত আমীরের দ্বারা স্বশাসিত কিছু এলাকাও সৃষ্টি করেছিলেন। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু লোকের চেহারার সঙ্গে আরবদের চেহারার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ এলাকার লোকদের ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দের আধিক্য, আলেম-ওলামার সংখ্যাধিক্য, নারীদের কড়া পর্দাপ্রথা ইত্যাদি তাদের প্রাচীন আরব রক্তের ছিটেফোঁটা স্বভাব হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীছ গ্রন্থের[১৪৫] বর্ণনামতে হিন্দের (বাংলার) শাসক রাহ্মী বংশের জনৈক রাজা আরবদেশে শেষনবীর আগমনের সংবাদে খুশী হয়ে আরব বণিকদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এক কলস আদা (زَنْجَبِيلٌ) উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে তা নিজে খেয়েছিলেন এবং ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে টুকরা টুকরা করে বণ্টন করেছিলেন'। অনেক বিদ্বান বর্তমান কক্সবাজার যেলার রামু উপযেলাকে প্রাচীন রাহ্মী রাজাদের স্মৃতিবাহী এলাকা বলে মত প্রকাশ করে থাকেন।

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচীকে যেমন আমরা উপমহাদেশীয় বিচারে 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের দ্বার বলি। যেমনভাবে মক্কা থেকে মুহাদ্দিছগণের আগমন ও অবতরণস্থল হিসাবে দক্ষিণ ভারতের গুজরাটকে 'বাব মক্কা' বা মক্কার দ্বার বলা হয়, তেমনিভাবে আমরা বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের জন্য 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের দ্বার বলতে পারি।

বন্ধুগণ!

আরব বণিকদের মাধ্যমে ও তাঁদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আগত মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তা ছিল অবিমিশ্র ও নির্ভেজাল ইসলাম। সেখানে কোন শির্ক ও বিদ'আত ছিল না। ছিল না বাতিল রায় ও ক্বিয়াসের ছড়াছড়ি, ছিল না কোনরূপ মাযহাবী দলাদলি, ছিল না কোন তরীক্বা ও পীর মুরীদীর ভাগাভাগি। প্রতিটি ধর্মীয় ব্যাপারেই তাঁরা সরাসরি হাদীছ থেকে সমাধান তালাশ করতেন। যার প্রভাব আমরা আজও দেখতে পাই। এখনও কোন বস্তুর সন্ধান না পেলে আমরা বলি 'জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না'। সম্ভবত প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়া ও

১৪৫. হাকেম হা/৭১৯০, ৪/১৫০ পৃ.; আল-ইক্বদুছ ছামীন ২৪ পৃ.; থিসিস পৃ. ৪২৫ টীকা-২।

মালয়েশিয়ার বৌদ্ধদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের প্রভাবে অথবা স্থানীয় হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং পাশাপাশি ইসলামের বিরল সাম্যের বাণী ও মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় বাংলাদেশে অগণিত মুসলমানদের বসবাস ছিল। ছিল ইসলামের পক্ষে ব্যাপক গণ সমর্থন।

এই সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে এতদঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাক বা না পাক তাদের আক্বীদা ও আমলে ঘটতে শুরু করল এক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী বিপর্যয়, যা ইন্দোনেশিয়াতে ঘটেনি। ঘটেনি অসংখ্য মুহাদ্দিছের আগমনে ধন্য গুজরাট, মালাবার তথা দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের আক্বীদা ও আমলে। আমরা এক্ষণে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করব।

বিপর্যয়ের কারণ :

৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে আফগান বিজেতা শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী (১১৮৬-১২০৬ খৃ.) কর্তৃক দিল্লী জয় ও একই সময়ে তাঁর তুর্কী গোলাম ও সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা জয়ের ফলে উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়াভিযান শুরু হয়। বখতিয়ার খিলজীসহ উপমহাদেশে যে সকল বিজেতা সামরিক নেতার আগমন ঘটে, তাঁদের মধ্যে আলপ্তগীন, সবুক্তগীন, কুতুবুদ্দীন আইবেক, ইলতুত্‌মিশ প্রমুখ সকলেই ছিলেন নও মুসলিম অনারব তুর্কী গোলাম ও মাযহাবের দিক দিয়ে 'হানাফী'। পরবর্তীতে নও মুসলিম মোগল শাসকরাও ছিলেন তুর্কীদেরই একটি শাখা। এঁরা বিজেতা হ'লেও ইসলামের প্রকৃত নমুনা ছিলেন না। তাঁদের শাসন ব্যবস্থাও ইসলামী ছিল না। তাঁদের সঙ্গে আসা ভাগ্যান্বেষী পীর-ফকীরদের ত্যাগী চরিত্র ও অভিনব প্রচার কৌশলে এদেশের বহু লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু এসব বিজেতাদের এবং তাঁদের অনুসরণীয় ছূফী ও দরবেশদের মাধ্যমে যে ইসলাম এ দেশে প্রচারিত হয়, তা ছিল মূল আরবীয় ইসলাম থেকে অনেক দূরে। এখানে রায় ও ক্বিয়াসের বাড়াবাড়ি ছিল। ছিল পীরপূজা ও কবরপূজা সহ নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। আলেমদের প্রচারিত

বিদ'আতে হাসানাহ্র সুযোগে এখানে অনুপ্রবেশ ঘটে প্রতিবেশী হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহু কিছু অনুষ্ঠান ইসলামের লেবাস পরিধান করে। ফলে বখতিয়ার খিলজীর সামরিক বিজয়ের প্রায় পৌনে ৬০০ বছর পূর্ব থেকে বাংলাদেশের মুসলমান যে মূল ও অবিমিশ্র আরবীয় ইসলামে অভ্যস্ত ছিল, তা থেকে তারা ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে এবং ছূফীদের ও শাসকদের চালু করা বিকৃত ইসলামকে যথার্থ ইসলাম ভাবতে শুরু করে। যদিও ব্যতিক্রম সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে।

দক্ষিণ ভারতীয় উপকূল ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের বিকৃতি কম ছিল। পক্ষান্তরে দিল্লী হ'তে বাংলা পর্যন্ত বিশাল উত্তর ও পূর্বভারতীয় এলাকায় প্রধানত তুর্কী, আফগান ও মোগল শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের আমলে মাযহাবী আলেমদের দুঃখজনক অনুদারতা, ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসে কুরআনের তাফসীর ও ইলমে হাদীছের বদলে মাযহাবী ফিক্বহ, মানতেক-ফালসাফা, ইলমে কালাম তথা তর্কশাস্ত্র ও মা'কূলাতের কেতাবসমূহ সিলেবাসভুক্ত করা, সরকারী চাকুরীতে হানাফী ফিক্বহে দক্ষতা অর্জনের শর্তারোপ ও আহলেহাদীছ আলেমদের সংখ্যাল্পতার কারণে কুরআন ও হাদীছের নির্ভেজাল ইসলাম শাব্দিক অর্থেই সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে থেকে যায় বলা চলে। দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.)-এর সময়কাল পর্যন্ত কুরআনের তরজমা 'গুনাহে কবীরা' বলে গণ্য করা হ'ত। আজ থেকে পৌনে দু'শ বছর আগে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯ হি./১৭৪৭-১৮২৪ খৃ.)-এর মাদ্রাসায় সেই সময়ে মাত্র দু'খানা বুখারী শরীফ ছিল। যার ছিন্নপত্র সমূহ পাঠদানের সময় ছাত্রদের নিকটে সরবরাহ করা হ'ত। অতঃপর পাঠদান শেষে জমা নেওয়া হ'ত। দিল্লীর যে মাদ্রাসা রহীমিয়াহ ছিল তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, তার অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য এলাকার অবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভারতের মুসলমানেরা কি কারণে হাদীছের ইলম থেকে দূরে ছিল, নিম্নের সময়চিত্র দ্বারা কিছুটা অনুধাবন করা যাবে।

হাদীছের কিতাবসমূহের আগমন :

১. হাদীছের কিতাব সমূহের মধ্যে ভারতে সর্বপ্রথম যে কিতাবের আগমন ঘটে, তার নাম 'মাশারেকুল আনওয়ার'। ইমাম রাযিউদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ

ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০ হি./১১৮১-১২৫২ খৃ.) কর্তৃক ছহীহ বুখারী ও মুসলিম হ'তে চয়নকৃত ২২৫৩ টি ক্বওলী হাদীছের এই গুরুত্বপূর্ণ সংকলনটি সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে দিল্লীতে আসে। নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫ হি./১২৩৬-১৩২৫ খৃ.) এই সংকলনটি মুখস্থ করেন। অষ্টম শতাব্দী হিজরীতে মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৭৫২ হি./১২৩৫-১৩৫২ খৃ.) দিল্লীতে এই সংকলনটির মাত্র একটি কপি মওজুদ ছিল।

২. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম :

সপ্তম শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে সর্বপ্রথম আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী (মৃ. ৭০০/১৩০০ খৃ.) কর্তৃক বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁয়ে আনা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে বুখারী ও মুসলিমের দরস দেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর যাবত সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্বা-লাল্লাহু ও ক্বা-লার রাসূলের অমিয় সুধা পান করিয়ে বাংলা, বিহার ও আশপাশের অগণিত জ্ঞানপিপাসু মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বার ভূঁইয়াদের রাজত্বকাল (৯০০-৯৪৫/১৪৯২-১৫৩৮ খৃ.) পর্যন্ত প্রায় আড়াইশত বৎসর সোনারগাঁও ইলমে হাদীছের মারকায বা কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সময় বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (৯০০-৯২৪/১৪৯৩-১৫১৮ খৃ.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার সাথে সাথে ইলমে কুরআন ও ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ৯০৭ হিজরীর রামাযান মোতাবেক ১৫০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মালদহ যেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে বড় ধরনের দু'টি মাদ্রাসা কায়েম করেন এবং সিলেবাসে ইলমে হাদীছকে অবশ্যপাঠ্য করে দেন। রাজধানী একডালার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলে) জন্য ছহীহ বুখারী তিন খণ্ডে সংকলন করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে মুহাদ্দিছগণকে তিনি রাজধানী একডালাতে সমবেত করেন। ইলমে হাদীছের প্রতি এই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁকে সমসাময়িক দক্ষিণ ভারতের গুজরাট রাজ্যের মুযাফফরশাহী সালত্বানাতের (৮৬৩-৯৮০ হি./১৪৫৮-১৫৭২ খৃ.) সঙ্গে তুলনা করা হয়।

বস্তুত বর্তমান রাশিয়ার বোখারা থেকে আগত মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ও তাঁর পরবর্তী হাদীছ পিপাসু ছাত্র ও শাসকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মানুষ পুনরায় তাদের হারানো ঐতিহ্য তথা হাদীছ অনুযায়ী

আমলের জাযবা ফিরে পায়। এজন্যই যথার্থভাবে বলা চলে যে, উত্তর ও পূর্বভারতীয় উপমহাদেশে ছহীহায়নের প্রথম শিক্ষাদাতা হিসাবে 'বাংলাদেশ' সত্যিই একটি গৌরবধন্য দেশ। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

৩. মাছাবীহ : ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসায়েন বিন মাস'ঊদ আল-বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হি.) সংকলিত 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' ৮ম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে হিন্দুস্থানে আসে।

৪. মিশকাত : ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব তাবরেযী (মৃ. ৭৩৯ হি.) সম্পাদিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ' ৯ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে জৌনপুর কুতুবখানায় আসে।

৫. সুনানে আরবা'আহ : নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এবং সুনানে বায়হাক্বী, মুস্তাদরাকে হাকেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থ ৯ম শতাব্দী হিজরীতে বিহারের খ্যাতনামা মনীষী সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার জামাতা আল্লামা শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২ হি./১২৬০-১৩৮১ খৃ.) হেজায থেকে আনিয়ে নেন।

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে, ৭ম শতাব্দী হ'তে ৯ম শতাব্দী হিজরী সময়কালের মধ্যেই উত্তর ও পূর্বভারতে সর্বপ্রথম প্রচলিত হাদীছ গ্রন্থ সমূহের আগমন ঘটে। কিন্তু ছাপার ব্যবস্থা না থাকায়, সরকারী চাকুরীতে এসবের কোন প্রয়োজন না হওয়ায়, শিক্ষার সিলেবাসে তাফসীর ও হাদীছ না থাকায় এবং আহলেহাদীছ আলেমদের সংখ্যাল্পতা ও সর্বোপরি রাজনৈতিক অনুদারতার কারণে এতদঞ্চলের মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীছের মূল ইসলাম হ'তে অনেক দূরে চলে যায়। এসব গ্রন্থাবলীর দু'একটি হস্তলিখিত কপি বিশেষ বিশেষ আহলেহাদীছ আলেমদের নিকটেই মাত্র পাওয়া যেত, যা ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে। ফলে 'পপুলার' (Popular) ও রেওয়াজী ইসলামকেই মানুষ প্রকৃত ইসলাম ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এর বিরোধী কিছু দেখলেই তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠতে থাকে। যেমন বিখ্যাত সাধক ও মাশারেকুল আনওয়ার হাদীছ গ্রন্থের হাফেয শায়েখ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫ হি./১২৩৬-১৩২৫ খৃ.) যখন সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের সময়ে (১৩২০-১৩২৫ খৃ.) দিল্লীর সেরা আলেমদের সঙ্গে একটি মাসআলায়

হাদীছ থেকে জওয়াব দিতে থাকেন, তখন তারা পরিষ্কার বলে দেন যে, ہند میں فقہی روایات کی قانونی حیثیت خود احادیث سے بھی زیادہ ہے، آپ ابو حنیفہ کی رائے پیش کیجئے– 'ভারতে ইসলামী আইনশাস্ত্রে হাদীছের চাইতে ফিক্বহের গুরুত্ব অধিক। অতএব আপনি আবু হানীফার রায় পেশ করুন'। তৎকালীন ভারতবর্ষের সেরা ফক্বীহদের এই আচরণ দেখে শায়েখ নিযামুদ্দীন আউলিয়া দুঃখ করে দরবার থেকে বেরিয়ে যান এই বলে যে, ایسے ملک میں مسلمان کب تک باقی رہینگے جہاں ایک فرد کی رائے کو احادیث پر فوقیت دیجاتی ہے؟ 'এমন দেশে মুসলমান কতদিন টিকে থাকবে, যে দেশে একজন ব্যক্তির রায়কে হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়?'

আলাউদ্দীন খালজীর সময়ে (৬৯৫-৭১৫ হি./১২৯৬-১৩১৬ খৃ.) খ্যাতনামা মিসরী মুহাদ্দিছ শামসুদ্দীন তুর্ক হাদীছের কিতাব সমূহ নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু মুলতানে এসে জানতে পারেন যে, সুলতান আলাউদ্দীন খালজী ছালাতে অভ্যস্ত নন এবং তাঁর শাসনাধীনে ভারতীয় ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে ইলমে হাদীছকে বাদ দিয়ে স্রেফ হানাফী ফিক্বহ চালু রাখা হয়েছে। তিনি দুঃখ করে আলাউদ্দীন খালজীকে একটি চিঠি পাঠিয়ে মুলতান থেকে মিসরে ফিরে যান। ঐ সময়ে ভারতের ৪৬ জন সেরা আলেমের মধ্যে শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া (মৃ. ৭৪৭ হি./১৩৪৬ খৃ.) নামক মাত্র একজন আলেমের মধ্যে ইলমে হাদীছের প্রতি কিছুটা আগ্রহ ছিল। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) যখন কুরআনের প্রথম ফার্সী তরজমা 'ফাৎহুর রহমান' লেখেন, তখন দিল্লীর আলেমরা কুরআন বিকৃতির ধুয়া তুলে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। শায়েখ নিযামুদ্দীন আউলিয়া ও শাহ অলিউল্লাহ্র বিরুদ্ধে রায় ও মাযহাবপন্থী আলেমদের যে দুঃসাহস আমরা দেখেছি, তা কেবল সে যুগের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, আজও যাঁরা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টায় রত আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ইসলামের নামে এই দুষ্টু প্রকৃতির আলেমরা ও তাদের অন্ধভক্তরা সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে।

তিনটি যুগ

উপমাহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমরা তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত করতে পারি।- প্রাথমিক যুগ (২৩-৩৭৫ হি.), অবক্ষয় যুগ (৩৭৫-১১১৪ হি.) ও আধুনিক যুগ (১১১৪ হি. থেকে বর্তমান যুগ)।

১. প্রাথমিক বা স্বর্ণযুগ :

যা ২৩ হিজরী থেকে ৩৭৫ হিজরী (৬৪৩-৯৮৫ খৃ.) পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই যুগে উমাইয়া খেলাফতের শেষ (১৩২ হি./৭৫০ খৃ.) পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ১৮ বা ২৫ জন ছাহাবীসহ ২৪৫ জন তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ হিন্দুস্থানে আগমন করেন। সর্বশেষ ছাহাবী সিনান বিন সালামাহ আল-হুযালী ৪৮ হ'তে ৫৩ হিজরী পর্যন্ত দামেস্কের উমাইয়া খলীফার পক্ষ হ'তে সিন্ধুর গভর্ণর ছিলেন। তিনি বেলুচিস্তানে শাহাদাত বরণ করেন। হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন,

وَكَانَ فِىْ عَسَاكِرِ بَنِىْ أُمَيَّةَ وَجُيُوْشِهِمْ فِى الْغَزْوِ الصَّالِحُوْنَ وَالأَوْلِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ، فِىْ كُلِّ جَيْشٍ مِّنْهُمْ شَرْذِمَةٌ عَظِيْمَةٌ يَنْصُرُ اللهُ بِهِمْ دِيْنَهُ-

'উমাইয়া যুগে প্রত্যেক জিহাদী কাফেলার সাথে নেককার ও সাধু ব্যক্তিগণ এবং উঁচুদরের তাবেঈ বিদ্বানগণের একটি বিরাট দল থাকতেন, যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেছেন'।[১৪৬] তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগে সিন্ধু এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩ হিজরী মোতাবেক ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম (৭২-৯৫ হি./৬৯৫-৭১৫ খৃ.) যখন সিন্ধু জয়ে আসেন, তখন কেবলমাত্র মুলতানের মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে সেখানে ৫০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করতে হয়। যেরুযালেমের বিখ্যাত মুসলিম ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী আল-মাক্বদেসী (মৃ. ৩৮০ হি.) পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম এলাকা ভ্রমণ শেষে ৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের তৎকালীন ইসলামী রাজধানী বর্তমান করাচীর সন্নিকটবর্তী সিন্ধুর মানছূরাতে এলেন, তখন সেখানকার মুসলমানদের 'মাযহাব' বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় ভ্রমণগ্রন্থে বলেন, أَكْثَرُهُمْ أَصْحَابُ حَدِيْثٍ- *'আকছারুহুম আছহা-বু হাদীছিন'* অর্থাৎ

১৪৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৯৩ পৃ. 'সমরকন্দ বিজয়' অনুচ্ছেদ।

'তাদের অধিকাংশ অধিবাসী হ'লেন আহলেহাদীছ'।[১৪৭] বলা আবশ্যক যে, মাক্বদেসী নিজে ছিলেন 'হানাফী'। শুধু সিন্ধু বা ভারতবর্ষ নয়, ঐ সময় পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম এলাকাতেও আহলেহাদীছ জনসংখ্যার আধিক্য ছিল। যেমন ইরাকের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবু মানছূর আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী (মৃ. ৪২৯ হি.) মাক্বদেসীর প্রায় ৫০ বৎসর পরে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ায় আহলেহাদীছগণের অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

ثُغُوْرُ الرُّوْمِ وَالْجَزِيْرَةِ وَثُغُوْرُ الشَّامِ وَثُغُوْرُ آذَرْبَيْجَانَ وَبَابُ الْأَبْوَابِ كُلُّهُمْ عَلَي مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَكَذَالِكَ ثُغُوْرُ أَفْرِيْقِيَّةَ وَأَنْدَلُسَ وَكُلُّ ثِغَرٍ وَرَاءِ بَحْرِ الْمَغْرِبِ أَهْلُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَكَذَالِكَ ثُغُوْرُ الْيَمَنِ عَلَي سَاحِلِ الزَّنْجِ وَأَمَّا ثُغُوْرُ أَهْلِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ فِيْ وُجُوْهِ التُّرْكِ وَالصِّيْنِ فَهُمْ فَرِيْقَانِ: إِمَّا شَافِعِيَّةٌ وَإِمَّا مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ-

'রূম সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব বা মধ্য তুর্কিস্থান প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। অমনিভাবে আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদ্বর্তী দেশ সমূহের সমুদয় মুসলিম 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। একইভাবে ইথিওপিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামন সীমান্তের সকল অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। অবশ্য তুর্কিস্থান ও চীন অভিমুখী নহরপার এলাকার মুসলমানেরা দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল শাফেঈ ও একদল হানাফী'।[১৪৮] লক্ষণীয় যে, মাক্বদেসীর ন্যায় আব্দুল ক্বাহির বাগদাদীও এখানে হানাফী ও শাফেঈদের থেকে পৃথকভাবে 'আহলেহাদীছ'-এর বর্ণনা দিয়েছেন।

২. অবক্ষয় যুগ

৩৭৫ হিজরী হ'তে ১১১৪ হিজরী (৯৮৫-১৭০৩খৃ.) পর্যন্ত প্রায় সোয়া ৭ শত বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই যুগে ইলমে হাদীছ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে নেমে আসে অত্যাচার, নির্যাতন ও রাজনৈতিক অনুদারতার এক দীর্ঘ বিভীষিকাপূর্ণ গাঢ় অমানিশা। ৩৭৫ হিজরীর পরপরই সিন্ধুর মানছূরার (করাচীর) শাসন ক্ষমতা আহলেহাদীছদের নিকট থেকে কট্টর হিংসুক ইসমাঈলী শী'আরা ছিনিয়ে নেয়। তারা মুলতানের জামে মসজিদ বন্ধ করে দেয়। সমস্ত সুন্নী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়। মুহাদ্দিছগণকে সিন্ধু থেকে

১৪৭. মাক্বদেসী, আহসানুত তাক্বাসীম ৪৮১ পৃ.।
১৪৮. আব্দুল ক্বাহের বাগদাদী, কিতাবু উছূলিদ্দীন ১/৩১৭ পৃ.।

বের করে দেয়। ইলমে হাদীছ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে মক্কা, মদীনা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যদিও পরবর্তীতে মুহাম্মাদ ঘোরী এই এলাকা জয় করেন ও তাঁর প্রতিনিধি নাছিরুদ্দীন কোবাচা এই এলাকা শাসন করেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হিজরীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এখানে ইসমাঈলী সামারু শী'আদের আধিপত্য বজায় ছিল।

অন্যদিকে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আফগান নেতা মু'ইয্যুদ্দীন ওরফে শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরীর মাধ্যমে দিল্লীতে ও বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে বাংলাদেশে 'আহলুর রায়' হানাফী শাসন কায়েম হয়। যাদের হাদীছ বিদ্বেষ ও মাযহাব প্রীতির কথা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। তখন থেকেই সিন্ধু হ'তে বাংলা পর্যন্ত কখনও তুর্কী, কখনও গযনবী, কখনও আফগান ও কখনো মোগলদের দ্বারা উপমহাদেশ শাসিত হয় এবং মূল আরবীয় ইসলামী শাসন থেকে উপমহাদেশ চিরবঞ্চিত হয়। ফলে একদিকে রাজনৈতিক অনুদারতা, অন্যদিকে তাক্বলীদপন্থী আলেমদের সংকীর্ণতা, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও আহলেহাদীছ আলেমদের স্বল্পতার কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষে স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবু এই সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যেও আল্লাহ পাক তাঁর অবিমিশ্র দ্বীনকে কিছু সংখ্যক হাদীছপন্থী আলেম ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁচিয়ে রাখেন।

অন্ধকারে আলো

অবক্ষয় যুগে পাঁচজন ছূফী মুহাদ্দিছের মাধ্যমে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র পরিচালিত হয়। (১) শায়েখ নিযামুদ্দীন আউলিয়া মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন 'আলী (৬৩৪-৭২৫ হি./১২৩৬-১৩২৫ খৃ.) দিল্লীতে (২) সাইয়িদ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (৫৭৮-৬৬৬ হি./১১৮০-১২৬৭ খৃ.) মুলতানে (৩) আমীর কবীর সাইয়িদ 'আলী ইবনু শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬ হি./১৩১৪-১৩৮৫ খৃ.) কাশ্মীরে (৪) মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী (মৃ. ৭০০ হি./১৩০০ খৃ.) বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে এবং (৫) তাঁর কীর্তিমান ছাত্র ও জামাতা মাখদূমুল মুল্ক শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২ হি./১২৬৩-১৩৮১ খৃ.) বিহারে 'মুনীর' নামক স্থানে। অবশ্য শায়েখ আহমাদ সারহিন্দী 'মুজাদ্দিদে আলফে ছানী' (৯৭১-১০৩৪ হি./১৫৬৪-১৬২৪ খৃ.)-কেও আমরা এই কাতারে শামিল করতে পারি। এছাড়াও দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালওয়া, খান্দেশ, সিন্ধু, লাহোর, ঝাঁসি, কাল্পী, আগ্রা, লাক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে ইলমে হাদীছের কেন্দ্র ছিল।

অবক্ষয় যুগে যে সকল মহান শাসক ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তাঁরা হ'লেন, (১) সুলতান মাহমূদ গযনবী (মৃ. ৪২১ হি./১০৩০ খৃ.), যিনি হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে 'আহলেহাদীছ' হন এবং ৩৯২ হিজরীতে লাহোর জয় করে গযনবী শাসন কায়েম করেন। অতঃপর ৪৪৩ হিজরীতে শী'আদের হাতে গযনবী শাসনের পতন ঘটে। (২) দাক্ষিণাত্যের বাহমনী শাসক সুলতান মাহমূদ শাহ (৭৮০-৭৯৯ হি./১৩৭৮-১৩৯৭ খৃ.), সুলতান ফীরোয শাহ, সুলতান আহমাদ শাহ যিনি 'অলিয়ে বাহমনী' নামে খ্যাত ছিলেন প্রমুখ হাদীছভক্ত শাসকদের যুগ চলে ৮৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৪৮১ খৃ. পর্যন্ত ১০৩ বৎসর ব্যাপী। অতঃপর (৩) পার্শ্ববর্তী গুজরাটের মুযাফফরশাহী সুলতানগণ ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্যাতি লাভ করেন। যদিও মোগল বাদশাহ হুমায়ূন (৯৪১-৪২ হি./১৫৩৪-৩৫ খৃ.) ১৩ মাস ব্যাপী গুজরাট অবরোধ করে রাখার ফলে 'কান্যুল উম্মালের' স্বনামধন্য সংকলক মুহাদ্দিছ 'আলী মুত্তাকী জৌনপুরী (মৃ. ৯৭৫ হি./১৫৬৭ খৃ.) ও মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ সিন্ধী (মৃ. ৯৯৩ হি./১৫৮৫ খৃ.)-এর ন্যায় খ্যাতনামা মুহাদ্দিছগণ গুজরাট ছেড়ে হেজায চলে যেতে বাধ্য হন।

উল্লেখ্য যে, মুযাফফরশাহী সালত্বানাতের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মাহমূদ বেগরহা (৮৬৩-৯১৭ হি./১৪৫৮-১৫১১ খৃ.) ও তাঁর পরবর্তী সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আরব দেশ হ'তে বহু মুহাদ্দিছ গুজরাটে আগমন করেন। ফলে ৯৮০ হিজরী মোতাবেক ১৫৭২ খৃ. পর্যন্ত ১১৪ বৎসর ব্যাপী সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার থাকে। এই সময় গুজরাটকে 'বাব মক্কা' বা 'মক্কার দ্বার' বলা হ'ত। (৪) দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও মুযাফফরশাহী যুগের সমসাময়িক বাংলাদেশেও আল্লাহ পাক তাঁর এক শাসক বান্দাকে ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কবুল করেন। তিনি হ'লেন বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসায়েন শাহ বিন সাইয়িদ আশরাফ মাক্কী (৯০০-৯২৪ হি./১৪৯৩-১৫১৮ খৃ.), যাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোকপাত করে এসেছি।

৩. আধুনিক যুগ :

১১১৪ হিজরী হ'তে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত। উপরোল্লেখিত মুহাদ্দিছ ও শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অবক্ষয় যুগে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দীপশিখা নিবু নিবু করে হ'লেও জ্বলছিল। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে এসে আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবানীতে ফাতাওয়া আলমগীরীর অন্যতম সংকলক দিল্লীর বিখ্যাত মাদ্রাসা রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আব্দুর রহীমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেন উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নীরব বিপ্লব সৃষ্টিকারী বিশ্ববিখ্যাত আলেম

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'র অমর লেখক শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.)। তাঁর শাণিত যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনী জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাঁর পরে তদীয় স্বনামধন্য চার পুত্র শাহ আব্দুল আযীয, শাহ আব্দুল কাদের, শাহ আব্দুল গণী ও শাহ রফীউদ্দীনের শিক্ষাগুণে ও তাঁদের পরে অলিউল্লাহ পরিবারের গৌরবরত্ন মুজাহিদে মিল্লাত শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আব্দুল গণী (১১৯৩-১২৪৬ হি./১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.) পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলনে'র মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, যা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে বসবাস রত প্রায় ৫ কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই আদর্শিক জোয়ারেরই ফসল বলা চলে। এ জোয়ারে কখনও কখনও ভাটা আসলেও স্রোত কখনও থেমে যায়নি। আজও বহু ভাগ্যবান ব্যক্তি তাক্বলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার শপথ নিয়ে 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন, *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। যে আহলেহাদীছদের রক্তে-মাংসে, অস্থি ও মজ্জায় বালাকোট, বাঁশের কিল্লা, পাঞ্জতার, সিত্তানা, মুল্কা, আম্বেলা, আসমাস্ত, চামারকান্দ ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতি সমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতন, গাযী ও শহীদী রক্তের অমলিন ছাপ সমূহ আজও ভাস্বর হয়ে আছে।

নিকট অতীতের কয়েকজন স্মরণীয় মুজাহিদ*

(১) সীমান্তের 'আসমাস্ত' কেন্দ্রের ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজাহিদ পাবনা হেমায়েতপুরের গাযী মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সালাফী, যিনি 'রাহাতুল্লাহ' ছদ্মনামে উক্ত কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। গত ১৯৭২ সালের ৬ই জানুয়ারী পাবনায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। (২) মালদহের কারবোনার গাযী মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব সালাফী ওরফে 'মূসা কমাণ্ডার' গত ১৯৮৯ সালে ঠাকুরগাঁও যেলার রাণীশংকৈলের দিহোট গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। যিনি আমীর রহমাতুল্লাহ্র

* ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় তৎকালীন ইসলামী মূল্যবোধের জামায়াত-বিএনপি চার দলীয় জোট সরকার নওদাপাড়া মারকাযের বাসা থেকে লেখককে গ্রেফতারের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ঢাকায় ১ম জেআইসি রিম্যাণ্ডে নেওয়া হয়। সেখানে অত্র বইয়ের এই স্থানে মার্কারী কলম দিয়ে চিহ্নিত করে লেখককে দেখানো হয়। উদ্দেশ্য, লেখক ও তার সাথীদের জঙ্গী প্রমাণ করা *(দ্র. সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি' বই ২৮-২৯ পৃ.)*। সেদিন লেখক জওয়াবে বলেছিলেন, জিহাদের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন হয়েছে। আমরা কোন জিহাদ চাই, সেটা 'জিহাদ' অধ্যায়ে দেখুন।

(১৯২১-১৯৪৯খৃ.) নির্দেশক্রমে ইংরেজ বড়লাটকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে আসমাস্ত কেন্দ্র হ'তে দিল্লী যাওয়ার পথে পাঞ্জাবের রাজধানী অমৃতসরে পৌঁছে যখন শুনলেন যে, এখানকার স্বর্ণমন্দিরের পুরোহিত শিখগুরু ঈশ্বর সিং পবিত্র কুরআনের উপরে পা রেখে বক্তৃতা করে, তখন তিনি ও তাঁর চারজন সাথী যশোরের গাযী আব্দুর রশীদ, ঢাকার গাযী আলীমুদ্দীন ও অপর দু'জন অবাংগালী মুজাহিদ সর্বপ্রথম এই শয়তানটাকে খতম করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরিকল্পনা মোতাবেক গাযী মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব নিজেই ছদ্মবেশে গিয়ে ঈশ্বর সিংয়ের মাথা কেটে আনেন বলে শ্রুতি আছে। নিজের জীবনের এই সোনালী স্মৃতি রোমন্থনের সময় গাযী ছাহেব নাকি প্রায়ই বলতেন, 'আমার আমলনামায় কিছুই নেই ঈশ্বর সিংয়ের খুন ব্যতীত'।

অমৃতসর হ'তে দিল্লী আসার পর তাঁরা শুনলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদ্রুপকারী 'রংগীলা রসূল' বইয়ের গুমনাম লেখক-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৫-১৯২৬ খৃ.) দিল্লী আসছেন। আবার প্রতিজ্ঞা নিলেন যশোরের গাযী আব্দুর রশীদ। দুর্দান্ত সাহস নিয়ে একাই শ্রদ্ধানন্দের কক্ষে প্রবেশ করে সেখানেই তাকে শেষ করে দিয়ে খুশী মনে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। শ্রদ্ধানন্দের আরদালী তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। দিল্লীর মুসলমানেরা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে বললেন আমরা আব্দুর রশীদকে তার ওযনে সোনা দিয়ে খরিদ করে নিব, ওকে মুক্তি দিন। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'ওকে শুধু এটুকু বলতে বলুন যে, মারের কথা আমার মনে নেই'। কিন্তু না, জান্নাত পাগল আব্দুর রশীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন,

میرے عملنامہ میں کوئی نیکی نہیں ہے بجز رسول کو ہجو کرنیوالا اس دشمن کے خون بہانے کے، میں کبھی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔

'আমার আমলনামায় কোন নেকী নেই কেবলমাত্র রাসূলকে বিদ্রুপকারী এই দুশমনটার খুন ছাড়া। আমি এই খুনকে কখনো অস্বীকার করতে পারি না'। *সুব্হা-নাল্লাহ...*। ফাঁসি হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দু'জন অবাংগালী মুজাহিদ পুলিশের কাছ থেকে তাঁর লাশ ছিনিয়ে এনে ছদর বাযারের মুসলমানদের সহায়তায় দিল্লীর শাহী গোরস্থানে দাফন করেন। মুজাহিদদের এই ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার আমীর রহমাতুল্লাহ্র সঙ্গে সন্ধি করেন ও তাঁদের নিকটে জিহাদ ফাণ্ডের দশ হাযার টাকা সহ বন্দী পাবনার গাযী আবুল কাসেম ওরফে কাসেম ও নীলফামারী জলঢাকার কচুয়া গ্রামের গাযী মাওলানা মুজাহিদকে বিনাশর্তে মুক্তি দেন। যে গাযী মাওলানা মুজাহিদ হ'লেন রাজশাহী নওহাটার জনাব মকবুল চেয়ারম্যানের আপন পিতামহ (দাদা)।

(৩) 'আসমাস্ত' কেন্দ্রের 'বড়ী জামা'আতের যিম্মাদার' কমাণ্ডার রাজশাহী বাগমারার গাযী মাওলানা আনোয়ারুদ্দীন যিনি 'আব্দুল হাই' ছদ্মনামে কেন্দ্রে থাকতেন ও পরবর্তীতে 'আব্দুল হাই আনোয়ারী' নামে নিজদেশে পরিচিত হন, তিনি তো মাত্র গত ১৯৯০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে নিজ গ্রাম শেরকোলে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করলেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'ঊন)*। (৪) রাজশাহী কাকনহাটের নিকটবর্তী পাঁচগাছিয়ার গাযী আব্দুল জাব্বার, যিনি নিজের ও অন্যের দেওয়া চাঁদা সহ মোট ৬০,০০০/= টাকা নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্তে পাড়ি দিয়েছিলেন, আর দেশে ফেরেননি। 'আসমাস্ত' কেন্দ্রেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (৫) রাজশাহীর বাগমারার তাহেরুদ্দীন গাযী, যিনি আমীর নে'মাতুল্লাহ শহীদ হওয়ার পর তাঁর পুত্র বরকতুল্লাহকে আসমাস্ত কেন্দ্রে নাবালক অবস্থায় দেখাশুনা করতেন (পরিশিষ্টে মূল চিঠির কপি দ্রষ্টব্য)। (৬) রাজশাহী গোদাগাড়ীর খাজিরাগাতি গ্রামের গাযী মাওলানা আব্দুস সোবহান সপরিবারে জিহাদে চলে গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ নয় বৎসর আসমাস্ত কেন্দ্রে অবস্থান করে দেশে ফিরে এসে মারা যান।

(৭) বগুড়া সোন্দাবাড়ী কেন্দ্রের শহীদ ফক্বীর মাহমূদ-এর নাম অনেকেই জানেন। সোন্দাবাড়ী মাদ্রাসার পার্শ্বে অবস্থিত 'মুজাহিদ কবরস্থান' আজও তাঁদের বিগত ত্যাগ ও কুরবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে নয়জন মুজাহিদের কবর রয়েছে। (৮) বগুড়ার কাঁটাবাড়িয়ার বেলাল গাযী ছিলেন স্বয়ং 'আসমাস্ত' মুজাহিদ কেন্দ্রে আমীর নে'মাতুল্লাহ্র (১৯১৫-১৯২১খৃ.) দেহরক্ষী। যিনি মাত্র কিছুদিন পূর্বে মারা গেলেন।[১৪৯] (৯) সাতক্ষীরার স্বনামধন্য গাযী মাখদূম হোসাইন ওরফে 'মার্জ্জুম হোসেন' ব্যবহৃত ১২০০ গ্রাম ওযনের তামার 'বদনা' এখনো জিহাদের স্মৃতি নিয়ে আমাদের সামনে মওজুদ আছে। বৃটিশ ফরমানের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের হিড়িকের মধ্যেও গাযী মাখদূম হোসায়েন দুর্বার সাহস নিয়ে শিয়ালকোটের এক মসজিদে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করেছিলেন। ফলে সাথে সাথেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, সেযুগে ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন ছিল 'ওয়াহ্হবী' ধরার বড় একটি নিদর্শন। অতঃপর বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে ফাঁসির দড়ি তিন তিনবার ছিঁড়ে গেলে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। গাযী মাখদূম হোসায়েন তাঁর একমাত্র সম্বল তামার বদনাটি নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় নিজ গ্রাম সাতক্ষীরার ভালুকা চাঁদপুর এসে পৌঁছেন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আজ সাতক্ষীরার গুণাকরকাটিতে পীরের যে আস্তানা হয়েছে, ওখানকার সমস্ত লোক এক সময় এই গাযী মাখদূম

১৪৯. সম্ভবত ১৯৮১ সালে নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেন।

হোসায়েনের ওয়ায শুনে ও কেরামতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই নিকটে 'আহলেহাদীছ' হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাতক্ষীরার আলীপুর গ্রামের মক্তবের শিক্ষক 'পীর' নামধারী জনৈক আব্দুল আযীযের প্ররোচনায় তারা পুনরায় 'হানাফী' হয়ে যায়। তবে যে বাড়ীতে ওয়ায হয়েছিল তারা সহ এখনো সেখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক আহলেহাদীছ আছেন ও তাদের একটি জামে মসজিদও রয়েছে।[১৫০]

(১০) গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা উপযেলার ঝাড়াবর্ষা গ্রামের তিনজন শহীদ ভাই সমীরুদ্দীন, যমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ্র শোকে অভিভূত হয়ে তাঁদের ভাতিজা আব্দুল বারী কাযী যে শোকগাথা রচনা করেন, তাও আজ আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। যারা তাদের মোট ৮০ বিঘা জমির মধ্যে একে একে ৪২ বিঘা জমি বিক্রি করে জিহাদের ফাণ্ডে দান করেছিলেন। (১১) একই উপযেলার বারকোনা গ্রামের মাওলানা ওয়াসে'উর রহমান মাত্র সাত দিনের পুত্র সন্তান ইব্রাহীম সরকারকে রেখে বালাকোট জিহাদে যোগদান করে শহীদ হয়ে যান। (১২) ময়মনসিংহের মাওলানা আতাউল্লাহ বালাকোট জিহাদে অংশগ্রহণ শেষে গাইবান্ধার সাঘাটা উপযেলার চিনিরপটল গ্রামে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (১৩) একই উপযেলার ধনারুহা গ্রামের আদি বাসিন্দা গাযী আব্দুল হালীম, আব্দুল হাকীম ও ফহীমুদ্দীন মণ্ডল বালাকোট জিহাদ থেকে ফিরে এসেও বৃটিশের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অবশেষে গাযী আব্দুল হালীম ঘর ছেড়ে রংপুর হারাগাছের সেরুডাঙ্গা জংগলে ৩/৪ বৎসর নির্জন বাসের পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'ঊন)*। (১৪) ১৭ বৎসর বয়সে জিহাদে অংশগ্রহণকারী এবং সীমান্ত হ'তে বাংলাদেশে হিজরতকারী গাইবান্ধা শহরের হক্কানী পরিবারের প্রাণপুরুষ আলহাজ্জ এফাজুদ্দীন হক্কানী, যিনি ১৯৮৩ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে ১৩৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন এবং আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর ব্যবহৃত তরবারী, জিহাদের পোষাক ও ব্যাজ, জিহাদী প্রেরণার উৎস হিসাবে।[১৫১]

(১৫) চাঁপাই নবাবগঞ্জের নারায়ণপুরের কীর্তিমান সন্তান সম্ভবত মাওলানা এনায়েত আলীর (১২০৭-৭৪ হি./১৭৯২-১৮৫৮ খৃ.) খলীফা রফী মোল্লার পুত্র ও খলীফা মৌঃ আমীরুদ্দীন তাবলীগের জামা'আত নিয়ে কানসাট এলাকার তেররশিয়া দুর্লভপুর গ্রামে গেলে এবং সেখানকার একটি বিদ'আতী প্রথার প্রতিবাদ করলে স্থানীয় বিদ'আতী মুসলমানেরা তাঁকে 'ওয়াহ্হাবী' বলে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেয়। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হ'লে শহীদ হওয়ার

---

১৫০. লেখকের উদ্যোগে তাঁর সংগঠনের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে উক্ত মসজিদটি নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫১. বর্তমানে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে তরবারী, ব্যাজ, বদনা ও শোকগাথা রক্ষিত আছে।

আনন্দে তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে ওঠেন। ইংরেজ বিচারক এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেন ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা হয়। মূলত এটি ছিল আহলেহাদীছদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের ব্যাপারে নিরুৎসাহ করার একটি শয়তানী কৌশল মাত্র। ১১ বৎসর আন্দামানের কালাপানিতে বন্দীজীবন কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি পেয়ে তিনি ১৮৮৩ সালে দেশে ফেরেন। তাঁর আনীত কালাপানি বন্দীদশার স্মৃতিবাহী ৭ ইঞ্চি লম্বা ঝিনুক, প্রায় ১ ফুট দৈর্ঘ্যের শামুক, ১০ ইঞ্চি লম্বা ও ৯ ইঞ্চি ব্যাসের কড়ি আজও বিহারের ছাহেবগঞ্জের আগলই নারায়ণপুরের গিয়াছুদ্দীন মাস্টারের নিকটে এবং বড় বাক্সটা চাঁপাই নবাবগঞ্জের রহনপুরের আনারপুর গ্রামের বাহারুল্লাহ মোল্লার নিকটে রক্ষিত আছে, আমাদের জন্য জিহাদ ও কুরবানীর অমলিন স্মৃতি হিসাবে। *আল্লাহু-স্মাগ্ফির লাহুম অরহাম্হুম অ'আ-ফেহিম অ'ফু 'আনহুম। -আমীন!*

যুলুম ও নির্যাতনের আগুনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী জামা'আতে আহলেহাদীছ তাই চিরকালীন জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম।

আল্লাহ বলেন, – وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৩৯)*। উল্লেখ্য যে, জিহাদ আন্দোলনে বাংলাদেশের লোকেরাই অধিকহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র রহমতে বর্তমান পৃথিবীতে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা বাংলাদেশেই সর্বাধিক এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে বৃহত্তর রাজশাহীতেই তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ হাম্দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহ্।**

---

* ১৯৯২ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পেশোয়ারের মুরীদকে ময়দানে ৫ লক্ষাধিক মানুষের মহা সমাবেশে একমাত্র বাঙ্গালী বক্তা হিসাবে উক্ত ভাষণ দেওয়ার এক পর্যায়ে পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে ওজস্বিনী ভাষায় লেখক তার উর্দূ ভাষণে আসমাস্ত, চামারকান্দ, সিত্তানা, আম্বেলা, বালাকোট প্রভৃতি জিহাদ কেন্দ্রের নাম ও সেখানে বাঙ্গালী শহীদদের নাম একের পর এক বলার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, বাঙ্গালী আহলেহাদীছদের রক্তেই আজ স্বাধীন পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেছে। এসময় মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। এমনকি সভাপতি সহ মঞ্চের সবাই উঠে হাত উঠিয়ে উক্ত তাকবীরে শামিল হন ও ভাষণকে স্বাগত জানান।

মুক্তির একই পথ
দাওয়াত ও জিহাদ
(طريق النجاة، الدعوة والجهاد)

বন্ধুগণ!

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১ম ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলন ও ইসলামী সেমিনারে আমাদের পঠিত 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক নিবন্ধে আমরা সার্বিক জীবনে তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ ও অনুশীলনের জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম।[১৫২] আজকের এ বাধা সংকুল পরিবেশে আমরা আপনাদেরকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্ত জিহাদের পথ বেছে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি দাওয়াত ও জিহাদ ব্যতীত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও জাহান্নাম হ'তে মুক্তির আর কোন পথ মুমিনের জন্য খোলা নেই। আর এই জিহাদ অর্থ কোন অবস্থাতেই বাতিলের সঙ্গে আপোষ না করা। নিরন্তর দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ বুঝাতে হবে ও সাথে সাথে সমাজ সংস্কারের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নূহ (আঃ)-এর প্রায় সাড়ে নয়শত বছরের দিন-রাতের অবিরাম প্রচেষ্টার কথা মনে রাখতে হবে। নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল যুগের আম্বিয়ায়ে কেরাম মূলত আল্লাহ্র পথের দাঈ বা আহ্বানকারী ছিলেন। তাঁদের স্ব স্ব যুগের প্রচলিত জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তাঁরা সর্বদা মানুষকে ইলাহী হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁরা সমাজে ধিকৃত ও নিগৃহীত হয়েছেন। মেজরিটির (Majority) সমর্থন হারিয়েছেন। সমাজ বিরোধী, ধর্মবিরোধী, ঐক্য বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। জন্মভূমি হ'তে বিতাড়িত হয়েছেন। মান-সম্মান, জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন। এমনকি বিশ্বস্ত আমানতদার 'আল-আমীন' মুহাম্মাদ (ছাঃ) জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী 'কায্যাব' বলে অভিহিত হয়েছেন

১৫২. ভাষণটি বই আকারে হাফাবা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে হাফাবা-১১৩; ১ম প্রকাশ নভেম্বর ২০২০।

(ছোয়াদ-মাক্কী ৩৮/৪)। তথাপি হক-এর দাওয়াত হ'তে তিনি আদৌ বিরত হননি। আমাদেরকেও এ নশ্বর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস হক–এর দাওয়াতে ব্যয় করতে হবে। সকল দুনিয়াবী প্রলোভন ও স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে যেতে হবে। এজন্য সকল কষ্ট ও মুছীবতকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে।

দুনিয়াবী সুখ-শান্তির চাইতে জান্নাতের সুখ–শান্তি অনেক বড়। আমাদের জীবনের মালিক যেমন আমরা নই, আমাদের সম্পদের মালিকও তেমনি আমরা নই। বরং আসমানেই আমাদের হায়াত-মউত, রিযিক ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্র দেওয়া জান ও মাল আল্লাহ্র পথেই ব্যয় করতে হবে, শয়তানের পথে নয়। জান্নাতের বিনিময়ে তিনি মুমিনের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। আমরা তার খরিদা গোলাম মাত্র। তাই গোলামের কোন অধিকার নেই মালিকের বিরুদ্ধে কাজ করার বা মালিকের সম্পদ নিজের খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করার। যদি করি তাহ'লে জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ চান বান্দা সর্বদা তাঁর পথে মানুষকে ডাকুক। যেমন তিনি তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، (القصص ٨٧)– 'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং অবশ্যই তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(ক্বাছাছ-মাক্কী ২৮/৮৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ، (المائدة ٦٧)–

'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৬৭)*। কি সাংঘাতিক ধমকি। এখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নেই। তাঁর উম্মত হিসাবে আমাদেরকেই সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতঃপর দাওয়াতের তিনটি স্তর সম্পর্কে এক্ষণে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।-

দাওয়াতের তিনটি স্তর

১. দাওয়াত ফরযে ‘আয়েন :

প্রত্যেক মুমিনের উপরে যেটা ফরয, তাকে ‘ফরযে আয়েন’ বলা হয়। যা পালন না করলে কঠিন গুনাহ্গার হ’তে হয় এবং অস্বীকার করলে কাফের হ’তে হয়। যেমন ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ইত্যাদি। আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য ‘ফরযে আয়েন’ তখন হয়, যখন সমাজে অন্যায়-অনাচার বিজয় লাভ করে এবং নেকী ও ন্যায়নীতি পরাভূত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، (آل عمران ١١٠)– ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে’ *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১১০)*। এখানে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেকের উপরে দাওয়াত ফরয করা হয়েছে, যা লংঘন করলে গুনাহগার হ’তে হবে।

২. দাওয়াত ফরযে কেফায়াহ :

সমাজের কিছু মুমিন দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের জন্য যেটা যথেষ্ট হয়, তাকে ‘ফরযে কেফায়াহ’ বলে। যেমন জানাযার ছালাত। হাযারো মুমিনের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন জানাযা ও কাফন-দাফনে অংশ নিলে বাকীদের ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ অংশ গ্রহণ না করলে প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে। তখন ওটা ‘ফরযে আয়েন’-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে।

দাওয়াত ‘ফরযে কেফায়াহ’ তখনই হবে, যখন সর্বত্র নেকী ও ন্যায়নীতি বিজয় লাভ করবে, অন্যায় ও দুর্নীতি পরাভূত হবে। এই সময় কিছু লোক দাওয়াতের কাজ করলে বাকীদের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– (آل عمران ١٠٤)–

'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা আবশ্যক, যারা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১০৪)*।

৩. দাওয়াত মুবাহ :

'মুবাহ' অর্থ যে কাজ করলে ছওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। যখন সমাজে নেকী ও ন্যায়নীতি বিজয়ী থাকবে, অন্যায় ও দুর্নীতি কদাচিৎ হবে এবং সমাজের পক্ষ হ'তে কিছু লোক সর্বদা দাওয়াতের কাজে নিযুক্ত থাকবে, তখন অন্যদের জন্য দাওয়াতের কাজ 'মুবাহ' পর্যায়ভুক্ত হবে। দাওয়াত দিলে তারা ছওয়াব পাবেন, না দিলে গুনাহগার হবেন না। আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْآ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ- (التوبة ١٢٢)-

'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবাহ-মাদানী ৯/১২২)*।

বর্তমান যুগে অন্যায়-অবিচার সমাজে চূড়ান্তভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। ন্যায়নীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। দুর্নীতি বুকটান করে এগিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের উপর 'ফরযে আয়েন' হয়ে গেছে। যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, সর্বাবস্থায় দাওয়াতের ফরয আদায় করতে হবে। বাপ-ভাইয়েরা তাদের কর্মস্থলে, ছেলে-মেয়েরা তাদের শিক্ষাঙ্গনে, মা-বোনেরা তাদের সংসার জীবনে স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবেন। নিজ গৃহকে ইসলামের দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলুন। আপনার গৃহে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা যাতায়াত করুক, এমন পরিবেশ তৈরি রাখুন।

দাঈ-র জন্য অপরিহার্য একটি দায়িত্ব

আল্লাহ্র পথের দাঈ বা মুবাল্লিগের অপরিহার্য দায়িত্ব এতটুকু যে, তিনি তার শ্রোতাদের জন্য প্রিয়বস্তু নির্ধারণ করে দিবেন, তারা আল্লাহ্কে 'অলি' বা

অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবেন, না ত্বাগূত-কে? যদি আল্লাহ্কে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেন তবে যে কাজ করলে তিনি খুশী হন, সব কিছুর বিনিময়ে সে কাজই তাকে করতে হবে। তার জীবনের সকল কর্মচাঞ্চল্য আল্লাহ্র ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে। এইভাবে প্রিয়বস্তু পরিবর্তনের মাধ্যমেই আসবে জীবন ও সমাজের পরিবর্তন। আসবে কাংখিত সমাজ বিপ্লব। উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি অনুধাবন করুন। আল্লাহ বলেন,

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ- (البقرة ٢٥٦-٢٥٧)-

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে ও আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে এমন এক মযবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা কখনোই ভাঙ্গবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(২৫৬)*। 'আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ'তে আলোর পথে বের করে আনেন। আর শয়তান হ'ল অবিশ্বাসীদের বন্ধু। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৫৬-২৫৭)*। অতঃপর শ্রবণ করুন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় হব'।[১৫৩]

১৫৩. বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭, রাবী আনাস (রাঃ)।

হক ও বাতিল পন্থীদের চারটি স্তর

হক ও বাতিল পন্থীদের মধ্যে সাধারণত চারটি স্তর দেখা যায়। (১) যিনি হক বুঝেন কিন্তু হক অনুযায়ী আমল করেন না (২) যিনি হক বুঝেন ও হক অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু হক-এর দাওয়াত দেন না (৩) যিনি হক বুঝেন, সে অনুযায়ী আমল করেন, হক-এর দাওয়াত দেন, কিন্তু হক-এর জন্য ঝুঁকি নেওয়ার সৎসাহস নেই (৪) যিনি হক বুঝেন, সে অনুযায়ী আমল করেন, হক-এর দাওয়াত দেন এবং এজন্য যে কোন ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকেন। নিঃসন্দেহে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে শেষোক্ত ব্যক্তির জন্যই *(ছফ-মাদানী ৬১/১০-১৩)*। বলা বাহুল্য, বাতিল পন্থীদের মধ্যেও অনুরূপ চারটি স্তর রয়েছে।

এক্ষণে আল্লাহ্র পথে দাঈর কর্তব্য হবে এই যে, তিনি একজন বাতিলপন্থীকে শুরুতে **১ম** স্তরের হকপন্থী হবার দাওয়াত দিবেন। অতঃপর ধীরে ধীরে তাকে ৪র্থ স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করবেন। এজন্য যেসব কষ্ট ও মুছীবতের সম্মুখীন তাকে হ'তে হবে, তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্বার্থে হাসিমুখে বরণ করে নেবার উপদেশ দিবেন। সামান্য একজন নারী বা পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার জন্য মানুষ যেখানে সর্বস্ব ত্যাগ করে, সেখানে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

দাওয়াত দান না বিজয় সাধন?

দ্বীনের দাওয়াত দান না বিজয় সাধন, কোন্টি মুমিনের উপরে ফরয এ নিয়ে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয় । অথচ মুমিনের উপরে ফরয হ'ল দ্বীনের দাওয়াত দান, বিজয় সাধন নয় *(ক্বাছাছ-মাক্কী ২৮/৮৭)*। এমনকি জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়েও রাসূল (ছাঃ) প্রতিপক্ষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন।[১৫৪] কেননা হেদায়াত দান বা বিজয় সাধন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন *(ক্বাছাছ-মাক্কী ২৮/৫৬)*। যদি আমাদের দাওয়াত আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়ে যায়, তাহ'লে তিনি এ দাওয়াতের বিনিময়ে দুনিয়াতেই দ্বীনের বিজয় দান করতে পারেন। নইলে আখেরাতের বিজয় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির বিষয়ে তো আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছেই *(ছফ-মাদানী ৬১/১০)*।

---

১৫৪. যেমন ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধে এবং ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন *(দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)*।

আল্লাহ বলেন, وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ– ‘বস্তুত সাহায্য কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। যিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১২৬)*। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ– ‘যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হবে না’ *(আলে-ইমরান-মাদানী ৩/১৬০)*।

এক্ষণে যদি দ্বীনের বিজয় সাধনকে আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে সেখানে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনটি মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। (১) দাওয়াতকে আল্লাহ্র পসন্দনীয় বানাবার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়বে (২) বিজয় সাধনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে ও দাওয়াতের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে (৩) আল্লাহ না করুন যদি দুনিয়াবী বিজয় না আসে, তাহ’লে দাঈর মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্য দেখা দিবে। পরিশেষে হয়তবা সে হক-এর দাওয়াত থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিবে। অবশ্য ইসলামের সার্বিক বিজয় সাধনের লক্ষ্য নিয়েই দাঈ-কে কাজ করে যেতে হবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পথেই তাকে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ– (الصف ٩)–

‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও অংশীবাদীরা এটি অপসন্দ করে’ *(ছফ-মাদানী ৬১/৯)*।

এই বিজয় প্রাথমিকভাবে অবশ্যই আক্বীদাগত এবং আমলগত বিজয়, যাকে আধুনিক পরিভাষায় সাংস্কৃতিক বিজয় বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম ও মতাদর্শ অবশ্যই ইসলামের নিকটে পরাজিত, এতে কোনই সন্দেহ নেই। অতঃপর পৃথিবীতে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবুও থাকবে না যেখানে ইসলামের দাওয়াত প্রবেশ করবে না। হয় তারা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে, নয় ইসলামের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হবে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ

إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا، قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ- رواه أحمد-

মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবুও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী প্রবেশ করাবেন না- সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (জিযিয়া দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে। আমি বললাম, তাহ'লে তো দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে' (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয় লাভ করবে)।[১৫৫] এই হাদীছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। এজন্য প্রত্যেক দাঈকে আক্বীদা ও আমলে উত্তম নমুনা হ'তে হবে। যার মাধ্যমে অমুসলিমদের হৃদয় জয় করা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক বিজয় লাভ করার জন্য যা আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

জিহাদ*

জাহান্নামের কঠিন আযাব হ'তে বাঁচার দ্বিতীয় শর্ত হ'ল 'জিহাদ'। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে 'জিহাদ' বলে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ- تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- (الصف ١٠-١١)-

'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে? *(১০)* 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ-মাদানী ৬১/১০-১১)*।

---

১৫৫. আহমাদ হা/২৩৮৬৫ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩।

* এজন্য লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বইটি পাঠ করুন।

অন্য অর্থে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে এবং মুশরিক-মুনাফিক ও ফাসেকদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও যবান দিয়ে লড়াই করাকে 'জিহাদ' বলে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ– 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা' *(তওবাহ-মাদানী ৯/৭৩; তাহরীম-মাদানী ৬৬/৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্র দিয়ে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান ও অন্যান্য কঠোরতার মাধ্যমে'। ইবনু মাসঊদও একইরূপ বলেন।[১৫৬]

(ক) নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ

নফস কলুষিত হয় ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব বস্তুবাদী সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম, আলোচনা মজলিস, ক্লাব, সমিতি, দল ও সংগঠন হ'তে এবং ইসলামের নামে সকল প্রকার শিরকী ও বিদ'আতপন্থী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। দৈনিক দেহের খোরাক জোগানোর ন্যায় রূহের ঈমানী খোরাক জোগাতে হবে। সর্বদা বিশুদ্ধ দ্বীনী আলোচনা, দ্বীনী আমল ও প্রশিক্ষণ এবং দ্বীনী পরিবেশের মধ্যে উঠাবসার মাধ্যমে রূহকে তাযা রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– (الكهف ٢٨)–

'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের জৌলুশ কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করোনা যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে' *(কাহ্ফ-মাক্কী ১৮/২৮)*।

১৫৬. কুরতুবী, সূরা তওবাহ ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ৮/১৮৭, ৮/২০৪ পৃ.।

(খ) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

আল্লাহ বা তাঁর প্রেরিত শরী'আতের কোন বিধান সম্পর্কে মনের মধ্যে যখনই কোন খটকা দেখা দিবে, তখনই তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। যেমন (১) ইসলামের বিধান সমূহ এযুগে অচল (২) ইসলামী শরী'আতের চাইতে মানুষের রচিত বিধান অধিক কল্যাণকর (৩) হাদীছ সন্দেহযুক্ত, কুরআনই যথেষ্ট (৪) হাদীছে কোন ছহীহ-যঈফ নেই, সব হাদীছই ছহীহ (৫) ইমাম-মাযহাব বা পীর মানাই যথেষ্ট, হাদীছ মানার প্রয়োজন নেই ইত্যাকার শয়তানী ধোঁকা সমূহ। নিজের ঘরের জানালা পথে চোর উঁকি মারলে যেমন আমরা তার পিছু নেই, তেমনি মনের জানালা পথে অহি-র বিধানের বিরুদ্ধে কোনরূপ সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মারলে তাকেও প্রথম আঘাতে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে। অহেতুক খটকা ও যুক্তিবাদের ধূম্রজাল সৃষ্টিকারী অতি বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে এবং বে-দলীল অন্ধ অনুসারীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوْا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ-

'যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পর আর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না' *(আন'আম-মাক্কী ৬/৬৮)*।

(গ) কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

হাত দ্বারা, জান দ্বারা, মাল দ্বারা ও অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে সর্বত্র ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও ফিস্ক্ব-ফুজূরীর বিরুদ্ধে মুমিনের গৃহকে লৌহ কঠিন দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। মুমিনের চিন্তা-চেতনা, কথা ও কলম, আয় ও উপার্জন সবকিছুই সর্বদা নিয়োজিত থাকবে বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধার মত। প্রত্যেক গ্রামে ও মহল্লায় আল্লাহ্র সেনাবাহিনী হিসাবে বয়স্ক ও তরুণদের একটি জামা'আতকে সংগঠিত হ'তে হবে, যারা আমীরের নির্দেশনা মোতাবেক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হবেন। হকপন্থী এই মানুষদের সংখ্যা কোন স্থানে যদি তিনজনও থাকেন, তবুও তাদেরকে

আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে ও ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে। তথাপি ত্বাগূতী শক্তির নিকটে যাওয়া যাবে না বা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ إِلاَّ أُمِّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ– 'তিন জন লোকের জন্যও হালাল নয় কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নিযুক্ত না করা পর্যন্ত'।[১৫৭]

আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوآ أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً– (النساء ٥٩)–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা-মাদানী ৪/৫৯)*।

অত্র আয়াতে রাসূলের আনুগত্যের সাথে আমীরের আনুগত্যকে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূলের মৃত্যুর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের রেখে যাওয়া দ্বীন বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব থাকবে 'আমীর'দের উপর। আর আমীরের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের শর্তাধীন। অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাক বা না থাক মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সর্বাবস্থায় 'আমীর' থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[১৫৮]

---

১৫৭. আহমাদ হা/৬৬৪৭; আবুদাঊদ হা/২৬০৮; ছহীহুল জামে' হা/৫০০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৬০।

১৫৮. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

সকল প্রকার মা'রূফ বা শরী'আত অনুমোদিত কাজে আমীরের নির্দেশ পালন করা মামূরের জন্য অপরিহার্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

وَمَنْ يُّطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'...যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল'।[১৫৯]

সম্ভবত এত কড়া হুকুমের কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর দাফন কার্যের পূর্বেই 'আমীর' নিয়োগের প্রতি এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং যে জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন কার্য প্রায় ৩২ ঘন্টা বিলম্বিত হয়। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকলে খলীফাদের মনোনীত আমীরের নিকট আনুগত্যের বায়'আত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করতে হবে। 'জাহেলিয়াতের মৃত্যু' বলতে জাহেলী যুগের ন্যায় বিশৃংখল জীবনের মৃত্যু বুঝানো হয় *(ফাৎহুল বারী)*। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সকল কাজে যোগ্য আমীরের অধীনে জামা'আত গঠন করে ইসলামী বা অনৈসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত ও সংগঠন পরিচালনার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে বাকী হাদীছগুলিতে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লায় যখন একদল সৎসাহসী মুজাহিদ তরুণ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং সমাজের সকল কল্যাণ কর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন, তখন সংখ্যায় যত কমই হৌক না কেন আল্লাহ্র সাহায্যে তারাই জয়লাভ করবেন। বস্তুতপক্ষে এটাই হ'ল 'জিহাদ'। আর এর মাধ্যমেই আসে কাংখিত 'সমাজ বিপ্লব'।

সমাজে চিরকাল বাতিলপন্থীর সংখ্যা বেশী ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই অধিকাংশ বাতিলের ভোট নিয়ে হক প্রতিষ্ঠা করা বিলাসী চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়। নবীগণ কখনোই এপথে যাননি। তাঁদের পথ ছিল দাওয়াত ও জিহাদের পথ, নছীহত ও প্রতিরোধের পথ। নবীগণ সমাজের সংখ্যালঘু হকপন্থীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে আল্লাহ্র নামে বায়'আতের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। আর তাদের মাধ্যমেই এসেছিল সমাজের আমূল পরিবর্তন। আজও সেই পথ ধরে এগোতে হবে; ইহূদী-নাছারাদের দেখানো পথ ধরে নয়।

---

১৫৯. বুখারী হা/৭১৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক প্রশাসন যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয়, তবে তা একটি ত্বাগূত ছাড়া কিছুই নয়। মুমিন কখনোই ত্বাগূত দ্বারা শাসিত হ'তে পারে না। সে কোন অবস্থাতেই ত্বাগূতের নিকটে তার বিচার-ফায়ছালার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে না *(নিসা-মাদানী ৪/৬০, ৬৫)* বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত *(তাগাবুন-মাদানী ৬৪/১৬)*। ঐ ত্বাগূতী সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য মুমিনকে তাই সর্বদা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। এজন্য তাকে সর্বদা রাসূলের দেখানো পথে চলতে হয়। কেননা তাঁর দেখানো পথই শ্রেষ্ঠ পথ।[১৬০] কিন্তু এ পথে কাফির-মুশরিকদের চাইতে মুনাফিকরাই সবচেয়ে বড় বাধা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا- (النساء ٦١)-

'যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে যে, তারা তোমার থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিবে' *(নিসা-মাদানী ৪/৬১)*।

বলা বাহুল্য, এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অপশক্তির বিরুদ্ধে উত্থান করতে গিয়েই উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬ হি./১৭৮৬-১৮৩১ খৃ.) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের (১১৯৩-১২৪৬ হি./১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.) আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'জিহাদ আন্দোলন', মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী তীতুমীরের (১১৯৭-১২৪৬ হি./১৭৮২-১৮৩১ খৃ.) 'মোহাম্মাদী আন্দোলন', হাজী শরী'আতুল্লাহ্র (১১৯৬-১২৫৬ হি./১৭৮১-১৮৪০ খৃ.) 'ফারায়েযী আন্দোলন' প্রভৃতি। সমস্ত দেশকে বা সমস্ত মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার দুঃস্বপ্ন তাঁরা দেখেননি কিংবা প্রতিষ্ঠিত বাতিল শক্তিকে উৎখাত করতে পারবেন এ অবাস্তব চিন্তাও তাঁরা করেননি। দুনিয়াবী নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব লাভের মোহও তাঁদের ছিল না। বরং যে কয়জন আল্লাহভীরু নিবেদিত প্রাণ ভাইকে তাঁরা সাথে পেয়েছিলেন, সেই কয়জন মর্দে মুজাহিদকে নিয়েই তাঁরা স্বীয় যুগের ত্বাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন

---

১৬০. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১ 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

মাত্র। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজও আমরা সেটাই করতে চাই।

আমাদের হৃদয়ের কান্না হ'ল এদেশে ইসলাম তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাক। বাংলার ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে উঠুক। যালেম নিরত হৌক, মযলূমের মুখে হাসি ফুটে উঠুক। আসুন! আমরা আমাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী গড়ে তুলি। সমাজের অন্যান্য ভাইকে নিরন্তর দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনি এবং যেখানেই থাকি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র নামে জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। আল্লাহ বলেন,

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- (التوبة ٤١)-

'তোমরা বেরিয়ে পড় অল্প সংখ্যায় হও বা অধিক সংখ্যায় হও এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো' *(তওবাহ-মাদানী ৯/৪১)*। ছাহাবী আবু ত্বালহা এর অর্থ বলেন, যুবক হও বা বৃদ্ধ হও। অতঃপর তিনি ছেলেদের বললেন, আমি মনে করি, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ চাচ্ছেন যে, আমরা যুবক ও বৃদ্ধ সর্বাবস্থায় জিহাদে বের হই। অতএব তোমরা আমাকে জিহাদে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। ছেলেরা বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূলের সাথে, অতঃপর আবুবকরের সাথে, অতঃপর ওমরের সাথে জিহাদে গিয়েছেন। তাঁরা এখন মৃত। অতএব আপনি বিরত হৌন! আমরাই আপনার পক্ষ থেকে যুদ্ধে যাব। বৃদ্ধ পিতা আবু ত্বালহা ছেলেদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। অতঃপর যুদ্ধে গিয়ে মারা গেলেন। সাগরে সাত বা নয় দিন তার লাশ ভাসতে থাকে। কিন্তু লাশের কোন পরিবর্তন হয়নি। অবশেষে লাশটি এক দ্বীপে গিয়ে ঠেকলে ছেলেরা তাকে সেখানেই দাফন করে।[১৬১]

ছাহাবী আবু ত্বালহার ন্যায় ইবনু আব্বাস, ইকরিমা, আবু ছালেহ, হাসান বাছরী, শামর বিন আত্বিইয়া, মুক্বাতিল বিন হাইয়ান, শা'বী, যায়েদ বিন আসলাম, মুজাহিদ, যাহহাক প্রমুখ বিদ্বানগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যুবক হও বা বৃদ্ধ হও' *(ইবনু কাছীর)*।

১৬১. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৪১।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত কালে (৪১-৬০ হি.) ৫২ হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে প্রথম রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়। উক্ত অভিযানে ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) মারা যান ও কনস্টান্টিনোপলের প্রধান ফটকের মুখে তাঁকে দাফন করার অছিয়ত করেন এবং বলেন, তাঁর কবর যেন কোনরূপ ঘেরা-বেড়া ছাড়াই উন্মুক্ত থাকে। অতঃপর সেভাবেই তাঁকে দাফন করা হয়। বর্ণিত আছে যে, রোমকরা পরে ঐ কবরের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'।[১৬২]

আল্লাহ বলেন, لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً، وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا- (النساء ٩٥)- 'অক্ষম ব্যতীত ঘরে বসা মুমিনগণ ঐসব মুজাহিদগণের সমান নয়, যারা তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। যারা মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মর্যাদা ঘরে বসা মুমিনদের উপরে এক দর্জা বৃদ্ধি করেছেন। আর উভয়ের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদগণকে ঘরে বসা মুমিনদের উপর মহা পুরস্কারের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(নিসা-মাদানী ৪/৯৫)*। অর্থাৎ জিহাদে যেতে আগ্রহী অক্ষম উপবিষ্টগণ যেমন অন্ধ, খঞ্জ, রোগী প্রভৃতি এবং জিহাদে গমনকারীগণ উভয়ের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ্র চূড়ান্ত ঘোষণা শ্রবণ করুন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ- (آل عمران ١٤٢)- 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো (প্রমাণসহ) জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল?' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৪২)*।[১৬৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ، رواه أبوداؤد والنسائى والدارمى بإسناد صحيح- 'তোমরা জিহাদ

১৬২. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৯২৪-এর আলোচনা ৬/১০৩ পৃ.। ইবনুল আছীর এটাকে ৪৯ অথবা ৫০ হিজরী বলেছেন *(আল-কামিল ফিত-তারীখ ৩/৫৬ পৃ.)*।

১৬৩. একই মর্মে সূরা তওবাহ ৯/১৬, মুহাম্মাদ ৪৭/৩১।

কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[১৬৪] 'যবান' অর্থ কথা ও কলম সবই।

তিনি আরো এরশাদ করেন, مَنْ مَّاتَ وَ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ জিহাদ করল না কিংবা অন্তরে কখনও জিহাদের চিন্তাও করল না, সে এক ধরনের মুনাফেকীর হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[১৬৫]

তিনি বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَ هُمْ كَذَالِكَ– 'চিরদিন আমার উম্মতের একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[১৬৬]

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর হকপন্থী মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন- আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

উপসংহার

১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে আমরা সমাজ বিপ্লবের তিনটি ধারার উপরে আলোচনার সাথে সাথে এ দেশে প্রচলিত তিনটি মতবাদ সম্পর্কে সকলকে হুঁশিয়ার করেছিলাম। জানিনা বিগত সোয়া চার বছরে আমরা এক্ষেত্রে কতটুকু এগোতে পেরেছি। তবে গত ১৯৮৯ ও ৯০-এর পৌনে দু'বছরে আমাদের উপর দিয়ে ঈমানের যে পরীক্ষা চলেছে,

১৬৪. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৩১ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়; রাবী আনাস (রাঃ)।

১৬৫. মুসলিম হা/১৯১০; মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৬৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০; 'ইমারত' অধ্যায়-৩৩, অনুচ্ছেদ-৫৩; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ ঐ, দেউবন্দ ছাপা শরহ নববী ২/১৪৩ পৃঃ; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১ 'ইল্ম' অধ্যায় ও হা/৭৩১১-এর ভাষ্য 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা।

তাতে অনেক সামনের কর্মী পিছনে গিয়েছেন, অনেক পিছনের কর্মী সামনে এসেছেন। কেউবা ছিটকে পড়েছেন। সমাজ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীগণ এগুলিকে স্রেফ পরীক্ষা বলে মনে করেন। সমাজ বিপ্লবের জন্য আমরা সেদিন দু'টি বিষয়কে আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে নির্ধারণ করেছিলাম।-

১- আক্বীদায় বিপ্লব আনা ২- নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদায় বিশ্বাসী নিবেদিত বিপ্লবী কর্মীদের একটি জামা'আত গঠন করা। প্রথমোক্ত বিষয়টির সহজ সরল ব্যাখ্যা হ'ল মুসলিম হিসাবে আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক পরিচালিত হবে, ত্বাগূতের বিধান অনুযায়ী নয়, এ আক্বীদা দৃঢ়ভাবে পোষণ করা। জীবনের একটি দিক অহি-র বিধান মোতাবেক হবে, আরেকটি দিক ত্বাগূতী বিধান মোতাবেক হবে, এই দ্বিমুখী আক্বীদা ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। এই নির্ভেজাল ঈমান ও আক্বীদাকে দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে না। মসজিদে ছালাত আদায়ের সময়ে যেমন আমরা ছহীহ হাদীছের সঙ্গে কোন মাযহাবী ফিক্বহের আপোষ করি না, রাজনীতির ময়দানে তেমনি আমরা পাশ্চাত্যের শিরকী তন্ত্র মন্ত্রের সাথে আপোষ করতে পারি না। আপোষ করতে পারি না অর্থনীতির ময়দানে ধিকৃত পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে। আমরা নির্ভেজাল ইসলামী রাজনীতি চাই, রাজনৈতিক ইসলাম নয়। আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্ভেজাল ইসলাম চাই, মিশ্রিত ইসলাম নয়। বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজে অভ্যস্ত বর্তমান মুসলিম সমাজ ও সরকার ইসলামের যে অংশটুকু পালনে বাধা দেয়, সেটুকু আমরা পালন করি না, কিংবা অজুহাত দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করি। অথচ ইসলামের দাবী ছিল সমাজ ও সরকারের নিকটে আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আক্বীদাকে বিকিয়ে দেব না। আমরা আমাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবনের জন্য দু'জন রাসূল দাবী করতে পারি না। বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেই আমরা আমাদের একমাত্র নবী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে বিশ্বাস করি।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা চলে যে, চিরকাল অল্পসংখ্যক যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির দ্বারাই অধিক সংখ্যক মানুষ পরিচালিত হয়েছে। ঐ নিবেদিতপ্রাণ মানুষগুলি যখন বাতিলপন্থী হয়, তখন সমাজে বাতিল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকী ৯৫ শতাংশ লোক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদের অনুসারী হয়। আর যখন তারা হকপন্থী হয়, তখন সমাজে হক প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' প্রতিষ্ঠার পিছনে

আমাদের মূল প্রেরণা ছিল এটাই। এর বাইরে আমরা তখন কিছুই জানতাম না। আজও জানিনা। তবে আমাদের আন্দোলন যে ইতিমধ্যে বাতিলের হৃদয়ে দুরু দুরু কম্পনের সৃষ্টি করেছে, তা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। এতদিন বাইরের হুমকি মুকাবিলা করছিলাম, এখন আভ্যন্তরীণ হুমকি মুকাবিলা করতে হচ্ছে। ১৯৪৯ সালে এই নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ' কনফারেন্সে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় সেনানী মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০ খৃ.) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলন আন্দোলনের পরিবর্তে একটি ফের্কায় পরিণত হয়েছে। এই জামা'আতের যে কিছু করণীয় আছে বা এর অস্তিত্বের যে কোন প্রয়োজন আছে, তা অনুমান করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে'। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ নামধারী আমাদের অনেক বন্ধুর এ আন্দোলন সম্বন্ধে ধারণা একান্ত অস্পষ্ট ও ধুম্রাচ্ছন্ন-তন্দ্রাবিজড়িতের স্বপ্নবৎ। কেউ কেউ এ আন্দোলনের মূলনীতিতেই বিশ্বাস করেন না। কেউ কেউ আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তসিঞ্চিত এই আমানতের নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। আমাদের মধ্যে কর্মবিমুখতা ও দায়িত্বহীনতার সঙ্গে তাক্বলীদ ও দলবন্দীর অভিশাপ প্রবেশ করেছে'।[১৬৭] মাওলানার অভিজ্ঞতা লব্ধ এই বাস্তব ও তিক্ত সত্য কথাগুলি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য আমরা সকল পর্যায়ের আহলেহাদীছগণের নিকটে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতি ও আজকের সম্মেলনের সার্বিক সফলতার জন্য আল্লাহ্র তাওফীক প্রার্থনা করে আল্লাহ্র নামে এই মহতী জাতীয় সম্মেলন'৯১ ও তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।*

---

১৬৭. আহলেহাদীস পরিচিতি (ঢাকা: ৯৮ নওয়াবপুর রোড, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩ ইং), ৯৭ ও ১০৫ পৃ.; বাস্তবতা এই যে, মাওলানা কাফী প্রতিষ্ঠিত জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর দাবীদার লোকেরাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সবচেয়ে বড় বাধা।

* ভাষণ শেষ হলে হড়গ্রামের মুরব্বী সুলতান মুহাম্মাদ মানছূর বলেছিলেন, জ্বর ও মাথাব্যথা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কখন যে কিভাবে দেড়ঘণ্টা পার হ'ল বুঝতেই পারলাম না। এদিন মঞ্চে সাতক্ষীরা ইটেগাছার দেছারুদ্দীন মুহুরী ছিলেন। এদিনই প্রথম শফিকুলের প্রাণ উজাড় করা জাগরণী 'জাগরে যুবক নওজোয়ান' (জাগরণী পৃ. ৩৯) জাগরণীটি শ্রোতাদের মোহিত করে দেয়। ঐদিন বগুড়ার আব্দুর রহীমের ও তার সাথীদের গগণবিদারী কণ্ঠ পুরা মজলিস মাতোয়ার করে ফেলে।

পরিশিষ্ট

আমীর বরকতুল্লাহর পত্রের নমুনা

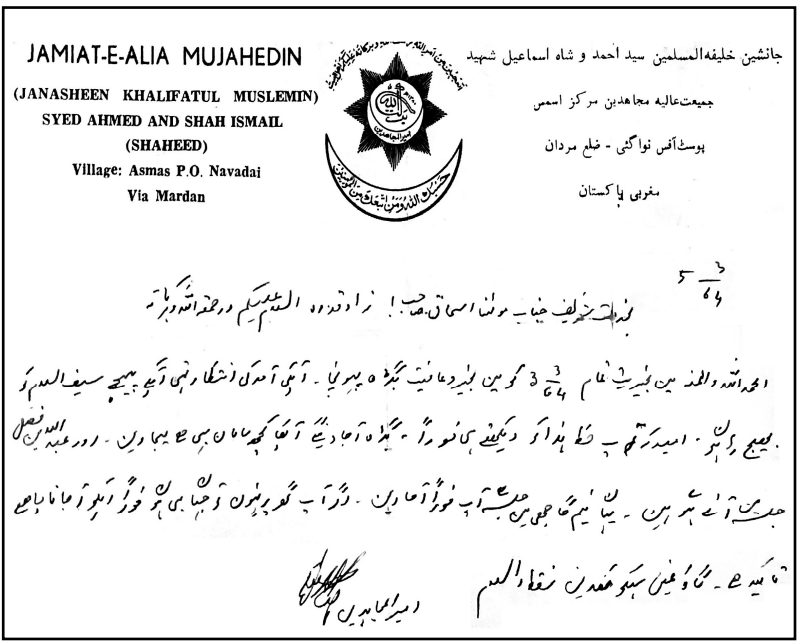

JAMIAT-E-ALIA MUJAHEDIN
(JANASHEEN KHALIFATUL MUSLEMIN)
SYED AHMED AND SHAH ISMAIL
(SHAHEED)
Village: Asmas P.O. Navadai
Via Mardan

جانشین خلیفۃالمسلمین سید احمد و شاہ اسماعیل شہید
جمیعت عالیہ مجاھدین مرکز اسمس
پوسٹ آفس نواگئی - ضلع مردان
مغربی پاکستان

আমীর বরকতুল্লাহ সম্পর্কে তথ্য : থিসিস ৩১২, ৩৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাং ৬.৭.২০১৭ ইং বৃস্পতিবার বাদ যোহর। স্থান : দারুল ইমারত, রাজশাহী।

পত্রটি হস্তান্তরকারীদের বক্তব্য : আমার দাদা মাওলানা ইসহাক যিনি ৯০ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালে মারা গেছেন। তাঁর কাছে আমীর বরকতুল্লাহ ৫.৩.১৯৬৪ ইং সালে বগুড়া থেকে উপরে প্রদত্ত যে চিঠি লেখেন, সেটা এযাবত আমার কাছে সংরক্ষিত ছিল। যা আজ এনে আপনাকে দিলাম। উনি ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর বগুড়া জেলখানা থেকে মুক্তি পান ও ভারতে চলে যান। আমাদের এলাকা থেকে প্রথম জিহাদে যান তনু প্রামাণিক। তিনি আসমাস্তে বিয়ে করেন ও সেখানেই স্বাভাবিকভাবে মারা যান বৃটিশ আমলে।

উনি তার ভাতিজা মাওলানা আব্দুর রহমানকে জিহাদে নিয়ে যান এবং নিজের মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দেন। সেখানে খলীলুর রহমান নামে তার একটি পুত্র

সন্তান জন্ম লাভ করে। আব্দুর রহমান বৃটিশ আমলে দেশে ফেরেন এবং পাকিস্তান আমলে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। পুলিশের কোন ঝামেলা হয়নি। সেসময় পাল্লাপাড়ার আইয়ুব আলী জিহাদে যান। যার নাম থিসিসে আছে (পৃ. ৪২১; নং ১০৬)। এই তিনজন ছাড়া আর কেউ জিহাদে গিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই।

অন্যান্য তথ্য : আমাদের বাপ-দাদারা বহু পূর্ব থেকেই আহলেহাদীছ। আমাদের দাদার নাম ছিল মুন্সী বেলায়েত আলী। যার নামানুসারে আমাদের পাড়াটি বালিয়াদীঘি মুন্সীপাড়া বা ফরাযীপাড়া বলা হয়। তনু প্রামাণিক আমার দাদার বড় ভাই ছিলেন। আমাদের গ্রামে সবাই শুরু থেকে অদ্যাবধি আহলেহাদীছ। মাওলানা খলীলুর রহমান ইমাম ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে আমি আমাদের ঈদগাহ মাঠের ইমাম এখনও আছি প্রায় ২৫ বছর থেকে। ৭ বছর থেকে মসজিদের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। বর্তমানে পাল্লাপাড়ায় একটি দাখিল মাদ্রাসা আছে। যা পাকিস্তান আমলে ফুরক্বানিয়া হিসাবে শুরু হয়। গ্রামে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র শাখা আছে।

বিবৃতিদাতা :

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (৭০); পিতা : মাওলানা ইয়াকূব আলী

সাং : বালিয়াদীঘি ফরাযীপাড়া (মুন্সীপাড়া); পোঃ চৌমুহনী, থানা : দুঁপচাচিয়া, বগুড়া। ২. দাঊদ শাকের উল্লাহ (৭৫) পিতা : ইলিয়াস আলী; সাং : ঐ। ৬.৭.২০১৭ ইং

❁❁❁❁

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك–

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

❁❁❁❁

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানী

প্রশ্নমালা

১. উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে কিভাবে?

২. উপমহাদেশে কীভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসার ঘটে?

৩. উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আক্বীদা ও আমলে বিপর্যয়ের কারণ কী ছিল?

৪. উপমহাদেশে কখন হাদীছের কিতাবসমূহের আগমন ঘটে?

৫. উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিধারাকে কয়টি যুগে বিভক্ত করা যায়?

৬. জিহাদ আন্দোলনে দূর অতীতের মুজাহিদগণ কীভাবে আত্মত্যাগ করেছেন?

৭. দাওয়াতের স্তর কয়টি ও কী কী?

৮. দ্বীনের দাওয়াত প্রদান ও বিজয় সাধনের মধ্যে কোন্‌টি মুমিনের উপরে ফরয?

৯. হক ও বাতিলপন্থীদের স্তর কয়টি ও কী কী?

১০. জিহাদ কত প্রকার ও কী কী?

নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম প্রকাশ : ১৯৯৩ খৃ.
২য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃ.

بسم الله الرحمن الرحيم

[১০ ও ১১ই সেপ্টেম্বর '৯২ রাজশাহী নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।]

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

প্রাণপ্রিয় সাথীবৃন্দ!

যে কোন আন্দোলন সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক কর্মপন্থা ও তা বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীবাহিনী। এটা যেমন বাস্তব সত্য, তেমনি আরও সত্য হ'ল সর্বাগ্রে সেই আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে কর্মীদের সঠিক জ্ঞান হাছিল করা ও তা হৃদয়মূলে দৃঢ় বিশ্বাস আকারে গ্রথিত হওয়া। আন্দোলন সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান যার নেই, হৃদয়ে তার কোন আকুতি সৃষ্টি হয় না। আর যে আন্দোলন হৃদয় থেকে উত্থিত হয় না সে আন্দোলন কখনোই টিকে থাকতে পারে না। যত বড় বিদ্বান বা সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী কিংবা আন্দোলনের যে কোন স্তরের কর্মী তিনি হউন না কেন হৃদয়ের গভীরে আন্দোলনের শিকড় প্রোথিত না থাকলে দুনিয়াবী স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তিনি আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়বেন- এতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষণে আমরা দেখব আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি কি?

নৈতিক ভিত্তি

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। পরকালীন মুক্তির চেতনার উপরেই এই ভিত্তি স্থাপিত। আর এই চেতনা থেকেই মুমিন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। অন্যকেও এই মহান আন্দোলনে শরীক করার জন্য পাগলপরা হয়ে উঠেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তুষ্টির বিনিময়ে দুনিয়ার সবকিছুকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অবশ্যই ইসলামী চেতনা রয়েছে। কিন্তু সেখানে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের সম্মুখে তাক্বলীদে শাখছীর এক কঠিন পর্দা ঝুলানো রয়েছে, যা ছিন্ন করে সরাসরি ও নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা তাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দানের জন্য তাঁরা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের নির্ধারিত উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিংবা সম্পূর্ণ নতুন ভাবেই বিভিন্ন যুগের আলেমদের মাধ্যমে কিছু ব্যাখ্যা চালু হয়ে গেছে- যা তাঁদের অনুসারীগণ শরী'আত ভেবে পালন করে থাকেন। ফলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নামে সেখানে চালু হয়ে গেছে তাক্বলীদে ইমাম ও তাক্বলীদে অলি-র গোলক ধাঁধা। ইমামত ও বেলায়াতের পর্দা ছিন্ন করার মত সৎসাহস অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তেমন দৃষ্ট হয় না। আর সম্ভবতঃ সেই দুর্বলতা থেকেই তাঁরা বলতে বাধ্য হন যে, 'দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী, সে মাযহাব অনুযায়ী সেখানে শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক'। এটি একজন সাধারণ গণতান্ত্রিক নেতার বক্তব্য হ'লে শোভা পায়। কারণ গণতন্ত্রে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন লাভই বড় কথা।

পক্ষান্তরে ইসলামী আন্দোলনে অধিকাংশের সমর্থন বা সন্তুষ্টি লাভের চাইতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। যা অনেক সময় অধিকাংশ লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হ'তে পারে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ কেবলমাত্র নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের উপরেই নির্ভর করে। আহলেহাদীছ আন্দোলন মুসলিম সমাজে তাক্বলীদে শাখছীর বদলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জাযবা সৃষ্টি করে। বিদ্বানগণের উদ্ভাবিত উছূল বা আইন সূত্রের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্কে বিচার না করে এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের আলোকে যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দানের জন্য প্রতি যুগের যোগ্য আলেমগণকে আহ্বান জানিয়ে থাকে।

আজকের পৃথিবীতে যে সকল সামাজিক সমস্যা বিরাজ করছে সম্ভবতঃ তার সবটাই পুরাতন সমস্যাবলীর নূতন রূপ। এই সকল সমস্যাবলী মুকাবিলা করে আধুনিক পৃথিবীকে শান্তির পৃথিবীতে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন মতাদর্শের সমাজ বিজ্ঞানী ও সমাজ নেতাগণ তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাও প্রয়োগ করছেন। কিন্তু উন্নত ও উন্নয়নশীল নামে বিভক্ত বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই প্রকৃত

অর্থে সামাজিক শান্তি নেই বললেই চলে। এর কারণ হিসাবে বলা চলে যে, প্রত্যেক দেশের নেতৃবৃন্দ তাদের স্ব স্ব চিন্তাধারার আলোকে সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে কেউ-ই নন, তাই আইন রচনার সময় যেমন দুর্বলতা থেকে যায়, আইন প্রয়োগের সময় দেখা দেয় আরো বেশী গা বাঁচানোর প্রচেষ্টা।

বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতা হারানোর পরে যে সকল রাষ্ট্রপ্রধান বছরের পর বছর কারা ভোগ করছেন কিংবা বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা ক্ষমতায় থাকাকালে বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করেছেন। আইনের যেসকল ধারা ক্ষমতা হারানোর পরে তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয়েছে, ক্ষমতায় থাকাকালে কিন্তু তা প্রয়োগ করা হয়নি। এইভাবে সরকারী দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে সমাজ বিরোধী দুর্নীতিবাজরা দোর্দণ্ড প্রতাপে ভদ্র মুখোশে তাদের নোংরা উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করে গেছে বা এখনও যাচ্ছে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের হোতারাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেওয়ালে লিখে ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাস্তায় মিছিল করে। আইয়ামে জাহেলিয়াতের গোত্র-দ্বন্দ্ব আজকের বিশ্বে রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে।

প্রাচীনকালে ইহুদী-নাছারাদের সমাজে নেতৃস্থানীয় লোকদের অপরাধকে যেমন ঢাকা দেওয়া হ'ত, আজকের সমাজে তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অপরাধকে আড়াল করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চালানো হয়। সে যুগের সমাজ নেতারা যেমন সংশোধনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন, আজকের সমাজ নেতারাও তেমনি ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ আইন রচনা ও আইন প্রয়োগ দু'টি ব্যাপারেই সকলে সর্বদা নিজেদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর নিজেদের রচিত আইনের পিস্তল নিজেদের বক্ষ ভেদ করুক, এটা কেউ-ই কামনা করেন না।

আদম (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসূল তাই যুগে যুগে মানব জাতিকে আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। যেহেতু আইন মান্য করার প্রধান শর্ত হ'ল আনুগত্য, সেকারণ আল্লাহ্র নবীগণ সর্বাগ্রে মানবজাতিকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। দুর্ভাগ্য এই যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন এলাহী ধর্মের অনুসারী হবার দাবীদার হ'লেও বলা চলে যে, প্রায় সকলেই বিশেষতঃ মুসলিমগণ ইসলাম ধর্মের সামাজিক ও বৈষয়িক দিককে অগ্রাহ্য করে চলেছেন। ধর্মীয় দিকেও ঘটিয়েছেন কমবেশী বিকৃতি। বৈষয়িক স্বার্থদ্বন্দ্ব

এবং আক্বীদাগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফাঁক-ফোকর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক স্থায়ী ফিক্বহী ও উছূলী ফের্কাবন্দী। কুরআন ও সুন্নাহ্র পবিত্র সলিলে প্রকারান্তরে নিজেদের রায় ও দৃষ্টিভঙ্গিই মিশ্রিত হয়েছে ও তা প্রাধান্য পেয়েছে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

বর্তমান যুগের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামের বৈষয়িক দিকটিকে বাদ দিয়ে সেখানে নিজেদের স্বার্থদুষ্ট সিদ্ধান্ত সমূহ আইনের নামে জনগণের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি ধর্মীয় দিকটিকেও একদল আলেম নিজেদের মনের মত করে তৈরী করে নিয়েছেন। এভাবে ক্রমেই মুসলিম সমাজ এগিয়ে চলেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে যেখানে তিনি বলেছেন যে, 'আমার উম্মতের উপর অবশ্যই অনুরূপ অবস্থা আসবে, যেরূপ এসেছিল বনু ইস্রাঈলের উপর একজোড়া জুতার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ন্যায় ...'।[১৬৮]

১ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম ভাগে তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (২৩-৩৫ হিঃ) ও চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (৩৫-৪১ হিঃ) রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমার সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে মুসলমানদের মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদ'আহ নামে দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়। অতঃপর তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষদিকে এসে 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ স্পষ্টতঃ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যান। আহলুল হাদীছগণ তাদের সকল আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন সরাসরি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণ ভিত্তি রাখেন তাঁদের রচিত বিভিন্ন ফিক্বহী মূলনীতি বা উছূলে ফিক্বহের উপরে। উছূল বা আইনসূত্র সমূহের আলোকে রায়পন্থী ফক্বীহগণ কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। উছূলের প্রতিকূলে কোন ছহীহ হাদীছ প্রাপ্ত হ'লে তাঁরা উক্ত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন বা দূরতম ব্যাখ্যা (তাবীল) করেন, যা মূলতঃ অপব্যাখ্যার শামিল। এভাবে উক্ত দু'দলের ইবাদত ও মু'আমালাত তথা আক্বীদা ও আমলে ঘটে যায় ব্যাপক তারতম্য।

পরিণতি : জান্নাত পিয়াসী একজন মুমিন এই পার্থক্য বুঝতে পেরে যখন নিজ মাযহাবের আলেমদের রচিত ফিক্বহী সিদ্ধান্তের বদলে ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'আহলুল হাদীছ' হয়ে যান, তখনই তার উপরে নেমে আসে অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টীম রোলার। বাপ-মা ভাই-বোন পর্যন্ত তাকে বয়কট

১৬৮. আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৭২, সনদ ছহীহ।

করেন। তিনি হন সমাজচ্যুত। রাষ্ট্রীয়ভাবেও তিনি অঘোষিত বয়কটের শিকার হন। বাংলাদেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মসজিদ ঢাকার বায়তুল মুকাররমে কিংবা বাংলাদেশের বিভিন্ন অফিস-আদালত বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বা হল সমূহের মসজিদে কোন আহলেহাদীছ ইমাম বা খত্বীবকে নিয়োগ দেওয়া হয় না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ধর্মীয় উপদেষ্টা পদে কয়েকজন আহলেহাদীছ তরুণ আলেম নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে পরে তাতে উল্লেখিত বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির দায়িত্ব পালনের শর্ত দেখে অতি সাধের চাকুরী ছেড়ে চলে এসেছেন স্রেফ ঈমান বাঁচানোর তাকীদে এমন দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। কেন এই বয়কট, কেন এই বঞ্চনা? একটাই অপরাধ যে তিনি 'আহলেহাদীছ'। অনাহারক্লিষ্ট পিতা-মাতার একমাত্র নয়নমণি, নববিবাহিতা তরুণী স্ত্রীর প্রেমের পুত্তলী, সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম যুবক স্বামী এত সুন্দর চাকুরী পেয়েও অবলীলাক্রমে তা ছেড়ে এসে বেকারত্বের দহন জ্বালা বরণ করে নেন কোন তাকীদে? তাকীদ তো কেবল একটাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী শান্তির বিনিময়ে তিনি চান কুরআন-হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী পরকালীন মুক্তি হাছিল করতে। এই ঈমানী জাযবাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও অজেয় নৈতিক শক্তি।

দক্ষিণ এশিয়ায় পরিচালিত সোয়াশো বছর ব্যাপী জিহাদ আন্দোলন (১৮১৬-১৯৫১), সৈয়দ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) পৌনে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী (১২৪৬-১৩২০ হিঃ) শিক্ষা আন্দোলন, সৈয়দ ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) ৩৭ বৎসর ব্যাপী (১২৭০-১৩০৭ হিঃ) লেখনী যুদ্ধ ছিল মূলতঃ উক্ত চেতনা থেকেই উৎসারিত। ১৮৯৫ সালে দিল্লীতে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে যে সাংগঠনিক যুগের সূচনা হয় এবং যা বিগত প্রায় এক শতাব্দী কাল যাবত অব্যাহত রয়েছে, তারও অন্তর্নিহিত প্রেরণা একটাই- আমরা মানব রচিত প্রাচীন বা আধুনিক কোন মাযহাব, তরীক্বা, ইজম বা মতবাদের অন্ধ অনুসারী নই বরং ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা হ'তে চাই স্রেফ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ ও একনিষ্ঠ অনুসারী 'আহলুল হাদীছ'। আজও যারা তাদের বাপ-দাদার লালিত মাযহাব ছেড়ে আহলেহাদীছ হচ্ছেন এবং প্রতিনিয়ত পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোন দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য নয়; বরং স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য পরকালীন স্বার্থেই আহলেহাদীছ হচ্ছেন এবং আগামীতেও হবেন ইনশাআল্লাহ।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন : তুলনামূলক আলোচনা

বন্ধুগণ!

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন মূলতঃ একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জিহাদ আন্দোলনের সময়ে এটি সামগ্রিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর ভারতের পাক-আফগান সীমান্ত এলাকা ও পূর্ব ভারতের বিহার ও বাংলা এলাকার মুসলমানেরাই জিহাদ আন্দোলনে অধিকহারে অংশ নেন। ফলে এই এলাকায় আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা অন্যান্য এলাকার তুলনায় অধিক। যার মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলেই আহলেহাদীছের জনসংখ্যা সর্বাধিক। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সাথে সাথে এই অঞ্চলের আহলেহাদীছ মুজাহিদগণ দখলদার ইংরেজ কুফরী শাসনের বিরুদ্ধে জানমাল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে অলস বিদ'আতী আলেম ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলমানেরা যেমন তাদের গৃহশত্রু ছিল, তেমনি বৃটিশের অনুগ্রহপুষ্ট বহু আলেম ও মুসলিম নেতা তাদের রাজনৈতিক শত্রু ছিলেন। ফলে মুষ্টিমেয় জিহাদীদের মাধ্যমে তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হ'লেও তারাই যে ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসেনা, এতে বিদ্বানগণের মধ্যে কারুরই কোন দ্বিমত নেই।

ভারতের এই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী কারা ছিলেন? উইলিয়াম উইলসন হান্টার উপমহাদেশের হিন্দুদেরকে এবং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী ও শী'আদেরকে এ ব্যাপারে চিহ্নিত করেছেন।[১৬৯] ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের নিকটে 'ওয়াহ্হাবী'রা নিশ্চয়ই সুন্নী ছিলেন না। বরং সুন্নী তারাই যারা আজও বাংলাদেশে 'সুন্নী' হিসাবেই পরিচিত। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২১৫-১২৯০/১৮০০-১৮৭৩ খৃঃ) যিনি প্রথম দিকে জিহাদ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ আল্লামা শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)-এর আক্বীদা ও আমলের বিরোধী হওয়ার কারণে পরবর্তীতে জিহাদ বিরোধী ফৎওয়া দিতে শুরু করেন। তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' ফৎওয়া দেন এবং ফাতাওয়া আলমগীরীর বরাত দিয়ে বলেন 'এখন কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি যদি হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের

১৬৯. দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ৮৬।

উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের শাসক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সে যুদ্ধকে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত হবে। মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং .. কেউ যদি অনুরূপ যুদ্ধ শুরু করে, তবে মুসলমান প্রজারা তাদের শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ফতোয়া-ই-আলমগীরীতে স্পষ্টাক্ষারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৭০] উক্ত ফৎওয়ার সারকথা হ'ল, এখন সকলকে ইংরেজদের সঙ্গে মিলে ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিৎ'। তাঁর এই ফৎওয়ায় খুশীতে গদগদ হয়ে হান্টার তাকে প্রশংসা করে বলেন, এটা অতীব আনন্দের বিষয় যে, ... বিদ্রোহ করার ফৎওয়াটি যে যেলা থেকে ঘোষিত হয়েছিল, সেই যেলাতে এখন একজন মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ (মৌলবী কারামত আলী-টীকা) জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে জোরালো সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন'। হান্টার আরও বলেন, 'আইন ও শাস্ত্রকারদের যেমন রাজানুগত্য প্রদর্শনের কাজে তেমনি রাজদ্রোহের প্রয়োজনেও সমানভাবে ব্যবহার করা যায়'।[১৭১]

একইভাবে দিল্লীর খ্যাতনামা আলেম ও মুজাহিদ নেতা মৌলভী মাহবূব আলী দেহলভী সীমান্তের পাঞ্জতার মুজাহিদ ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়ে জিহাদকে বিদ্রুপ করে মুজাহিদগণকে প্ররোচিত করেন ও একদল মুজাহিদকে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, যাতে কেউ আর জিহাদ আন্দোলনে সহযোগিতা না করে, কোন রসদপত্র ও লোকজন সীমান্তে যেতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করেন। তার এই বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা জিহাদ আন্দোলনের যে ক্ষতি হয়েছিল, মৌলবী জাফর থানেশ্বরী ও জীবনীকার মির্যা হায়রাত দেহলভীর মতে ঐ ধরনের মারাত্মক ক্ষতি আর কারও দ্বারা হয়নি। ইসলামী জিহাদের জান্নাতী ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতা তাই একটি চিরন্তন সমস্যা।

শাহ ইসমাঈলের সেনাপতিত্বে সীমান্তে প্রধান যে তেরটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার মধ্যে ৩/৪টি ছাড়া বাকী সবগুলোই ছিল স্থানীয় বিশ্বাসঘাতক পাঠান ও দুররানী বাহিনীর বিরুদ্ধে। এমনকি বালাকোট বিপর্যয়ের জন্যও দায়ী ছিল এইসব কথিত মুসলিম নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা। সর্বশেষ ১৮৬৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সংঘটিত ঐতিহাসিক আম্বেলা যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি চেম্বারলীনের নেতৃত্বে ১০,০০০ অমুসলিম সৈন্য ছাড়াও স্থানীয় বিশ্বাসঘাতক

---

১৭০. ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর, কলিকাতা মোহামেডান ল' সোসাইটির সিদ্ধান্ত; দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স (অনু) পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

১৭১. দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ৯১, ১০৪।

ছয়টি মুসলিম গোত্রের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল ৬৪,২৫০ জন। ঘুষ ও কুটনীতির মাধ্যমে তারা রাতারাতি ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পৌনে এক লক্ষ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্রের অধিকারী ভূখা-নাঙ্গা, গাছের ছাল-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকা বারো থেকে চৌদ্দ শ' মুসাফির মুজাহিদদের এই অসম যুদ্ধে ২৩৮ জন ইংরেজ অফিসার সহ মোট ৩,০০০ শত্রু সৈন্য নিহত হয় এবং ৪০০ মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। এই বারো/চৌদ্দশো মুজাহিদের ১০টি প্লাটুনের ৯টি প্লাটুনই ছিল বাঙালী মুজাহিদদের। খোদ আমীর আব্দুল্লাহ (ইমারত কাল: ১৮৬২-১৯০২) যে 'জামা'আতে আব্দুল গফূর'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা সবাই ছিলেন বাঙ্গালী। অমনিভাবে শাহ ইসমাঈলের নেতৃত্বে সীমান্ত জিহাদের ২য় যুদ্ধে (বাযার যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১৮২৭-এর জানুয়ারীতে) প্রথম শহীদ ছিলেন বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী। বলা অনাবশ্যক যে, স্থানীয় পাঠান সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও লোভী চরিত্রই ছিল জিহাদ আন্দোলনে এই সব বাহ্যিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। গবেষক আব্দুল মওদূদ বলেন, 'কালক্রমে (এই সব) বাঙ্গালী জিহাদীরা আহলেহাদীছ, লা-মাযহাবী, মুওয়াহহেদ, মুহাম্মদী, গায়ের মুক্বাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল। ... আর এর সংগঠন পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল এ যুগের ধিকৃত ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ'।[১৭২]

আব্দুল মওদূদ বর্ণিত শহীদায়েন পরবর্তী সেই আলেম সমাজ ছিলেন বাংলা, বিহার ও সীমান্তে যুদ্ধের ময়দানে বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাঁদের অনুসারী অধিকাংশ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। খানক্বাহ, দরগাহ ও আস্তানার নিরুপদ্রব কক্ষগুলির আরাম-আয়েশ যাদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। তীজাঁ, দস্ওয়াঁ কুলখানি, চেহলাম, ওরস, মীলাদ, ঈছালে ছওয়াব, শবেবরাতের আলোকসজ্জা ও হালুয়া-রুটির লোভনীয় আকর্ষণ যাদেরকে বেঁধে রাখতে পারেনি। জীবন বাজী রেখে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়াবন্ধন ছিন্ন করে তারা হাযার হাযার মাইল দূরে সীমান্তের পাঞ্জতার, সিত্তানা, মুল্কা, আসমাস্ত ও চামারকান্দের মুজাহিদ ঘাঁটিগুলিতে চলে গিয়েছিলেন জনমের মত হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাতের অমিয় সুধা পানের উদগ্র বাসনা নিয়ে। আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ সে যুগেও যেমন একশ্রেণীর আলেম ও তাদের অনুসারীদের নিকটে ধিকৃত ছিলেন, এ যুগের হক্বপন্থী আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামও তেমনি একশ্রেণীর ওলামার নিকটে ধিকৃত হয়েই আছেন।

---

১৭২. আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ১০০, ১০১ ।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল অঞ্চলে কমবেশী আহলেহাদীছ-এর বসবাস থাকলেও বালাকোট পরবর্তী শতবর্ষ ব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি এলাকা হওয়ার কারণে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য সকল এলাকার তুলনায় আজও বেশী। এটা যে জিহাদ আন্দোলনেরই বাস্তব ফল, তা বলা যেতে পারে।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালে ইসলামের নামে স্বাধীন পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার ফলে জিহাদ তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাছিল হয়। এরপর থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' গঠন করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০ খৃঃ) এবং 'পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সভাপতি মাওলানা দাঊদ গযনবী (১৮৯৫-১৯৬৩ খৃঃ) উভয়েই অত্যন্ত যোগ্য আলেম ও রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও দু'টি জমঈয়তকেই তাঁরা রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে দূরে রাখেন। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই হয়তবা তাঁরা আহলেহাদীছদের স্বার্থ রক্ষিত হবে ভেবেছিলেন। তাছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃঃ), মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২ খৃঃ), মাওলানা দাঊদ গযনবী (১৮৯৫-১৯৬৩ খৃঃ), সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগের অত্যন্ত প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় নেতা। তাঁরা আজ সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। মুসলিম লীগও আজ মৃতপ্রায়। দেশে এখন গড়ে উঠেছে আদর্শ ভিত্তিক ডান বাম অসংখ্য রাজনৈতিক দল।

ইসলামী আদর্শের দাবীদার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি দলের সম্মানিত আমীর ইতিপূর্বে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন 'দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী, সে মাযহাব অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিবাহ তালাক...'।[১৭৩] তাঁর এই বক্তব্য তাঁর দলেরই মতামত বলে ধরে নেওয়া চলে। কেননা এর বিরুদ্ধে উক্ত দলের পক্ষ হ'তে গত অর্ধযুগের মধ্যেও কোনরূপ বক্তব্য এসেছে বলে জানা যায়নি।

এক্ষণে **প্রথম প্রশ্ন :** আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ কি? উত্তরে বলব যে, স্বার্থ একটাই দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঢেলে সাজানো।

---

১৭৩. সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : উক্ত স্বার্থ অন্য কোন সেক্যুলার বা ইসলামী রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে হাছিল করা সম্ভব কি? এক কথায় এর উত্তর- না। কারণ সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো ইসলামী শাসন চান না। অন্যদিকে যারা ইসলামী শাসন চান, তারা নিজ মাযহাবী সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে গিয়ে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিধি-বিধান সমূহকে প্রতিনিয়ত এড়িয়ে চলেন। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা আর যাই হোক আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিল হ'তে পারে না। বৃটিশ আমলে আহলেহাদীছদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যালেম শিখ ও ইংরেজ শাসন হটানো এবং সাথে সাথে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। যা তাঁরা করেছিলেন ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে সীমান্তের শিখ দূর্গ ফতহ্গড় জয়ের মাধ্যমে। পরে নামকরণ করা হয় 'ইসলামগড়'। যার সীমান্ত ছিল নওশেরাঁ হ'তে সিকান্দারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে আফগানিস্তানের নূরিস্তান ও কুনাড় প্রদেশে। আজকে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল একটাই যে, আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালিত হৌক।

আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে আহলেহাদীছরা একটি নির্জীব ধর্মীয় ফের্কায় পরিণত হয়েছে। ছালাতে আমীন বলা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করা এবং শিরক ও বিদ'আত বিরোধী একটা মনোভাব ছাড়া যার আর তেমন কিছু বাকী নেই। অথচ দেড়শত বৎসর পূর্বে এই বাংলাদেশে আহলেহাদীছের যে জনসংখ্যা ছিল আজকে তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী। কিন্তু সে যুগের সেই কঠিন বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তাদের ভিতরে যে জিহাদী জাযবা ছিল, আজ তার এক শতাংশ বাকী আছে কি? যদি বলি নেই তবে সেটাও সর্বাংশে ঠিক হবে না। বরং এটাই ঠিক যে, তারা আজ চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়েছে আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যবোধ। তাদের অনেক আলেমের মুখে এখন 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে বক্তব্য শুনতে পাওয়া যায়। একটি তাক্বলীদপন্থী দলকে খাঁটি ইসলামী দল বলে তাদের কাউকে বই লিখতেও দেখা যায়। যে খৃষ্টান শাসকদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছরা একসময় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আজ সেই খৃষ্টান শক্তি বা তাদের অনুসারীদের পাঠানো ইসলামবিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের শ্লোগান আহলেহাদীছ তরুণদের মুখ দিয়েই বের হচ্ছে। ছুঁড়ে ফেলা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামী পরোক্ষভাবে আবার চেপে বসেছে তাদের গর্দানে।

আহলেহাদীছদের এই করুণ অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য কয়েকটি বিষয় দায়ী বলে আমরা মনে করি। (১) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে

আহলেহাদীছ আক্বীদার আলোকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে যোগ্য আহলেহাদীছ আলেমের দুঃখজনক অভাব সৃষ্টি হয়েছে। (২) প্রচলিত মাযহাবী ফিক্বহ অনুযায়ী আলিয়া নেছাবের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী আনুকূল্য লাভের ফলে চাকুরী-বাকুরীর বাস্তব প্রয়োজনে প্রতিভাবান আহলেহাদীছ ছাত্ররা আলিয়া নেছাবের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে নিরপেক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইল্ম থেকে তারা বঞ্চিত হয়। (৩) স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে আহলেহাদীছ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া হয়নি। (৪) আহলেহাদীছ আক্বীদার আলোকে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় লেখনীর অভাব। (৫) জনমত গঠনের জন্য যোগ্য ও যুগোপযোগী বক্তার অভাব। (৬) রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে দূরে অবস্থান করা।

প্রস্তাবনা

এক্ষণে এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সুদূরপ্রসারী ও দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে ময়দানে নামতে হবে। এ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রস্তাব আকারে আপনাদের সামনে পেশ করছি। (১) কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ গবেষণার জন্য আহলেহাদীছদের পরিচালনাধীনে 'বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (২) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে আহলেহাদীছ আক্বীদার বইসমূহ সংযুক্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সহ মাদরাসা সিলেবাস সমূহকে যুগোপযোগী করতে হবে, যেন সাধারণ শিক্ষার জন্য ছাত্রদেরকে পৃথক কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না হয়। মেয়েদের জন্য পৃথক মাদরাসা কায়েম করতে হবে। অথবা একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৩) আহলেহাদীছ পরিচালিত একাধিক দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকপত্র সমূহ বের করতে হবে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য লেখক সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে আহলেহাদীছ পরিচালিত মাদরাসাগুলি তাদের সাময়িক মুখপত্র বের করে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও যোগ্য ইমাম ও খত্বীব এবং বক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে (৪) উদারভাবে ব্যাপক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম চালু করতে হবে ও তার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আক্বীদার প্রতি সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। (৫) রাজনৈতিক অঙ্গনে আহলেহাদীছ-এর সক্রিয় পদচারণা থাকতে হবে এবং 'ইসলামী খেলাফত' কায়েমের লক্ষ্যে জনমত সংগঠিত করতে হবে।

বর্তমান যুগের প্রচলিত দলবাজি রাজনীতির রঙিন চশমা দিয়ে আহলেহাদীছ-এর রাজনীতিকে বিচার করলে ভুল হবে। কেননা ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য হ'ল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া। এজন্য সবার আগে অহি-র বিধানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা আবশ্যক। কেননা সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হয়ে থাকে জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে। নবী-রাসূলগণ সর্বদা সে পরিবর্তনের দিকেই জোর দিয়েছেন। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। সেকারণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রথমে মুমিনের ব্যক্তি জীবনকে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে গড়ে তুলতে চায়। সাথে সাথে তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পরিবর্তন কামনা করে। ছালাত আদায়ের সময়ে তিনি ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করবেন, অথচ রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিগত কোন একজন নির্দিষ্ট ফক্বীহ-ইমাম বা আধুনিক কোন চিন্তাবিদ-দার্শনিকের অন্ধ অনুসরণ করবেন, এটা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নেতৃত্বকে অসম্পূর্ণ মনে করার শামিল।

মানুষের জীবনসত্তা অখণ্ড ও অবিভাজ্য। সেকারণ আহলেহাদীছগণ মুমিনের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের জন্য দু'জন রাসূল কামনা করেন না। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেই মাত্র 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা উত্তম নমুনা বলে তারা বিশ্বাস করে থাকেন। এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ কোন অবস্থাতেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী শাসন কামনা করেন না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হেদায়াত অনুযায়ী মুসলমানদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা সামাজিক শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে তারা আবশ্যিক মনে করেন। কোনরূপ বিদ্রোহ, সন্ত্রাস বা ভাংচুরের রাজনীতি তারা আদৌ সমর্থন করেন না। তারা বিশ্বাস করেন যে, জনগণের চিন্তাধারা তথা আক্বীদায় বিপ্লব আনার মাধ্যমেই প্রকৃত সমাজ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। আর সেই স্থায়ী বিপ্লবের লক্ষ্যেই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ-এর সোচ্চার বক্তব্য ও সক্রিয় পদচারণা থাকতে হবে। বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নয়, বরং বাতিলের মুকাবিলা করেই সেটা করতে হবে।

বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ-এর আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং সাথে সাথে যৌবনের উদ্যমকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতধারায় পরিচালিত করার জন্য ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পদযাত্রা শুরু হয়। যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু পথভোলা তরুণ আজ ঘরে ফিরেছে ও আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

করছে। তাদের মধ্যে জাগরণ এসেছে ও সেই সাথে জেগে উঠেছেন অনেক চিন্তাশীল সুধী ও বিদগ্ধ মুরব্বিয়ান। আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক মানুষের নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

প্রশ্নমালা

১. আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি কি?
২. প্রচলিত মাযহাবের বিপরীতে ছহীহ সুন্নাহ গ্রহণকারীদের কেমন পরিণতি ভোগ করতে হয়?
৩. দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কেমন ছিল?
৪. উপমহাদেশ বিভক্তির পর স্বাধীন পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কেমন ছিল?
৫. আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ কী?
৬. আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অন্য কোন সেক্যুলার বা ইসলামী রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে হাছিল করা কি সম্ভব?
৭. বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের নির্জীবতার কারণ কী?
৮. নির্জীব আহলেহাদীছ সমাজকে পরিবর্তনের জন্য কী করণীয়?

উদাত্ত আহ্বান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম প্রকাশ : ১৯৯৩ খৃ.
৪র্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২২ খৃ.

*[১৯৯৪ সালের ২২ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের 'আমীর' হিসাবে নিয়মিত চতুর্মাসিক সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকালে প্রদত্ত ভাষণ]।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ

সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ!

আহলেহাদীছ আন্দোলনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সে সকল আন্দোলনমুখী সুধী ও বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম আজকের এ সুধী সম্মেলনে তাশরীফ এনেছেন, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের পক্ষ হ'তে আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির স্বার্থে আপনাদের এখানে আগমন, এজন্য ব্যয়িত আপনাদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও আর্থিক কুরবানী, দেহের প্রতি ফোঁটা স্বেদবিন্দু, প্রতিটি নিঃশ্বাস ও প্রতিটি মুহূর্তের বিনিময়ে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে উত্তম জাযা প্রদান করুন, তিনি আমাদের ছোট-বড় সকল গোনাহ মাফ করুন, আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে কবুল করুন, আন্তরিকভাবে এই দো'আ করি- আমীন!

প্রেক্ষিত পর্যালোচনা

বন্ধুগণ!

একই ভাষাভাষী ও একই বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলের শরীক পশ্চিমবঙ্গ হ'তে পূর্ব বঙ্গ পৃথক হয়ে পাকিস্তানের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তায় মিশে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মানচিত্রের উপরে বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার মূল আদর্শিক প্রেরণা ছিল **'ইসলাম'**। বর্ণভেদ প্রথার অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাধারণ হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাজাদের অবর্ণনীয় শোষণ ও নিপীড়নে

জর্জরিত এতদঞ্চলের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণ প্রথমতঃ আরব বণিকদের মাধ্যমে প্রচারিত ইসলামের উদার ও সাম্য নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার ফলে এদেশের মুসলিম জনগণের সংখ্যা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারও বহু পরে আফগান বীর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় ঘটে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের অবসান হয়। সেই থেকে এদেশ আফগান, পাঠান, মোগল, আরবী, ইরানী, সুন্নী, শী'আ প্রভৃতি স্বাধীন মুসলিম সালতানাতের অধীনে শাসিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কী শী'আ অবাংগালী স্বাধীন দেশপ্রেমিক নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯০ বছর বঙ্গদেশ মূলতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা খৃষ্টান ইংরেজ শাসনাধীনে থাকলেও এদেশের ইসলামী চেতনা বিনষ্ট করতে পারেনি। ফলে দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two nation theory) ভিত্তিতে ইসলামের স্বাধীন আবাসভূমি হিসাবে পূর্ব বঙ্গ স্বাধীন পাকিস্তানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়।

সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন পাকিস্তানের অভ্যুদয় আন্তর্জাতিক ইহূদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র প্রথম থেকেই সুনযরে দেখেনি। তাই চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। একখানা আস্ত রুটি একত্রে গিলে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই তাকে ছিঁড়ে দু'টুকরা করার ষড়যন্ত্র শুরু হ'ল। মিঃ গান্ধী এক সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার জন্য বলেছিলেন, We are first Indian, then we are Hindu or Muslim. অর্থাৎ 'আমরা প্রথমে ভারতীয় অতঃপর হিন্দু অথবা মুসলিম'। তার উত্তরে এককালে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত' বলে খ্যাত প্রথমে কংগ্রেস ও পরে মুসলিম লীগ নেতা কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ (জন্ম : ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ ইং, মৃ. ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, We are first Muslim, then we are Indian. 'আমরা প্রথমে মুসলিম অতঃপর ভারতীয়'।

কায়েদে আযমের মুখ দিয়ে উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলিম জনসাধারণের হৃদয়ে মণিকোঠায় লালিত আপোষহীন ইসলামী চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যের কথাই সেদিন বিঘোষিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থেই একটি স্বাধীন দেশের জন্মলাভ আধুনিক পৃথিবীতে সম্ভবতঃ একটি অতুলনীয় ঘটনা ছিল। মুসলিম উম্মাহ তো বটেই, সমগ্র পৃথিবী গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের অগ্রযাত্রার পানে। কিন্তু না। কুচক্রী ইংরেজ এদেশ থেকে

পাততাড়ি গুটানোর সময় তার হাতে গড়া ক্রীড়নক অমুসলিম কাদিয়ানী যাফরুল্লাহ খানকে করে গেল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে আইনমন্ত্রী। ফলে দেশের হৃৎপিণ্ডে ক্যান্সার হ'ল। ওদিকে মুসলিম এলাকা কাশ্মীরকে করে গেল দ্বিধাবিভক্ত; যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরার ব্যবস্থা হয়। তাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা স্বার্থক হয়েছে। পাকিস্তানী শাসনযন্ত্র কখনই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি। সেখানে কুরআন-সুন্নাহ্র শ্লোগান উচ্চারিত হয়েছে। এই নামে জনগণের ভোট আদায় করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহতে পারদর্শী কোন আলেম বা কুরআন-সুন্নাহ্র সনিষ্ঠ অনুসারী কোন যোগ্য ব্যক্তিকে কখনই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি। পরিণাম স্বরূপ পাকিস্তান তার ঐক্য রক্ষায় ব্যর্থ হ'ল।

আজ পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভূখণ্ডগত কোন মিল ছিল না। আড়াই হাযার মাইল দূরত্বের দু'টি ভূখণ্ডকে এক করে রেখেছিল শুধুমাত্র একটি আদর্শ- 'ইসলাম'। আর কিছুই নয়। শাসকরা যখন সেই মূল সূত্রটিকেই দুর্বল করলেন ও সেই সাথে চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করলেন, তখন আর ঐক্য টিকিয়ে রাখার কোন সূত্র বাকী রইল না।

স্বাধীনতার ভিত্তি

আজকে যে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে আমরা গর্ববোধ করছি, এর স্বাধীনতার ভিত্তি কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত? ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ না অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? যদি প্রথমটি হয়, তাহ'লে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের সাথে মিলে প্রাচীন যুগের অবিভক্ত বঙ্গদেশ গড়াতে বাধা কোথায়? যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে তার স্থায়িত্ব অত সময়, যত সময় নিজের শক্তি ও সামর্থ্য বলে এ দেশটি তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখতে পারবে। তিনদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত ও একদিকে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ঘেরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ এই দুর্বল ছোট্ট স্বাধীন দেশটি আয়তনে তার অন্যূন ২২ গুণ বড় বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে মিশে একাকার হয়ে বৃহত্তর ভারতবর্ষ গড়তে আপত্তি কোথায়? মূলতঃ এখানেও কোন পৃথক প্রেরণা নেই। 'বাঙ্গালী' ও 'বাংলাদেশী' উভয় বিবেচনায় ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে থাকার জন্য আমাদের কোন যুক্তি নেই। কেবলমাত্র একটি কারণেই আমরা ভারতবর্ষ

থেকে পূর্বেও পৃথক হয়েছিলাম এবং আজও পৃথক থাকতে পারি, সেটা হ'ল আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম 'ইসলাম'। ইসলামের কারণেই আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড **বাংলাদেশ** লাভ করেছি, ইসলামের কারণেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে এবং ইসলামের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই আমরা আমাদের এ ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি মাটির স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টিত থাকব ইনশাআল্লাহ। ইসলামের জন্যই স্বাধীনতা পেয়েছি- এটি যেমন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য। তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও ইসলাম অপরিহার্য- এটাও তেমনি অকাট্য সত্য। আর একারণেই আন্তর্জাতিক ইহূদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির প্রধান টার্গেট হ'ল 'ইসলাম'।

প্রতিবেশী দেশে মুসলমানদের অবস্থা

ইউরোপের একমাত্র ইসলামী দেশ জাতিসংঘের স্বাধীন সার্বভৌম সদস্য রাষ্ট্র 'বসনিয়া'কে ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য যেভাবে খৃষ্টান ও অমুসলিম বিশ্ব অঘোষিত 'ক্রুসেড' চালিয়ে যাচ্ছে, প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রটি তেমিন তার দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণকে বিতাড়িত ও নিশ্চিহ্ন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেদেশের প্রগতিশীল পত্রিকা Front Line ১৫ই নভেম্বর ১৯৯১-এর হিসাব মতে ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ৩০ বছরে সেখানে ৭৯৪৬টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১৩,৯৫০টি দাঙ্গা। ১৯৭৮ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাদেশিক বিধান সভায় প্রদত্ত তালিকায় বলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত খোদ কলিকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ এবং ৭টি মাযার ও গোরস্থান হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে।[১৭৪] উক্ত হিসাব মতে দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ 'গণতান্ত্রিক' দেশ বলে খ্যাত ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে কথিত ভারতে তার স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছরে গড়ে প্রতি বছরে ৩০৯টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। জান-মাল-ইয্যত হারিয়েছে কত অগণিত মুসলিম ভাই-বোন তার সঠিক হিসাব কে রাখে? ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরে ৪৬৫ বছরের সুপ্রাচীন 'বাবরী মসজিদ' ভেঙ্গে সেখানে তারা 'রামমন্দির' গড়েছে। এখনো প্রতিদিন কাশ্মীরে মুসলিন নিধন চলছে, চলছে আসামে বোড়ো মুসলিম হত্যা ও বিতাড়ন। সারা ভারত থেকে বাংলাভাষী মুসলমানদের হাঁকিয়ে এনে

১৭৪. হারুনুর রশীদ, খোলা চিঠি (ঢাকা : জুন ১৯৯৩), ৪৮-৪৯ পৃ.।

বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার চেষ্টা চলছে হরহামেশা। বি.এস.এফ-এর গুলীতে নিহত হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় প্রতিদিন দু'একজন করে বাংলাদেশী নাগরিক। ফারাক্কা সহ ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে এবং দক্ষিণ তালপট্টি ও মুহুরীর চর দখল করে এই স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে গ্রাস করার সকল রাজনৈতিক পাঁয়তারা ইতিমধ্যেই সে প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। এরপরেও পর্বত প্রমাণ অসম বাণিজ্য ও ব্যাপক চোরাচালানীর মাধ্যমে এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক খরা পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে বছরে সর্বমোট অন্যূন ১৫ হাযার কোটি টাকার সম্পদ ঘরে তুলে নিয়ে তারা এদেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। এভাবে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে তাদের নিকটে করুণার ভিখারী হয়ে থাকার সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। এখন আবার রেল ও নৌ ট্রানজিট সুবিধা আদায়ের পাঁয়তারা করছে। আমাদের এই প্রিয় দেশটির বিরুদ্ধে তাদের এই আক্রোশের মূল কারণ হ'ল **'ইসলাম'**। কেননা একই ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গ হ'তে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার মূল কারণ ছিল 'ইসলাম'। ইসলাম তাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল গ্যারান্টি। ইসলাম আমাদের গর্ব, ইসলাম আমাদের অহংকার।

দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট

বন্ধুগণ! গত দু'তিন মাস থেকে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যেভাবে দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটছে, তাতে যেকোন চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দাঊদ হায়দার ও সালমান রুশদীর পরে তাসলীমা নাসরীনকে মঞ্চে এনে আন্তর্জাতিক ইহূদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এদেশের মুসলমানদের ঈমানী চেতনাকে আরেকবার পরখ করে দেখল। ৮,৫০০ জন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও ৬,৩০০ পাশ্চাত্য সংগঠন এমনকি মানবাধিকারের স্বঘোষিত আন্তর্জাতিক মোড়ল বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের পক্ষ থেকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকটে তাসলীমা নাসরীনের নিরাপত্তার জন্য আবেদন পেশ করা হয়েছে *(দৈনিক সংগ্রাম)*। অথচ আমেরিকার সরকারী হিসাব মতে সেদেশের শতকরা ৬০ জন মহিলা নিহত হচ্ছেন বর্তমানে তাদের স্বামীদের হাতেই *(দৈনিক ইনকিলাব)*। নিজ দেশের মা-বোনদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারে না যে আমেরিকা, সে কোন স্বার্থে ভিনদেশের একজন মহিলার নিরাপত্তার জন্য আবেদন করে? ৩০ লাখ রূপী খরচ করে কলিকাতার সল্ট লেকে তাসলীমার

জন্য বাড়ী নির্মাণ করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআন পরিবর্তন ও সংশোধনের দাবীদার তাসলীমা নাসরীন কেবল একজন নষ্টা চরিত্রের লেখিকা নয়, সে আন্তর্জাতিক ইসলাম বৈরী শক্তির ক্রীড়নকও বটে। একটি জাতিকে কব্জা করতে গেলে সর্বপ্রথম সে জাতির সংস্কৃতি ও সে জাতির আক্বীদা-বিশ্বাসকে কব্জা করতে হয়। তাসলীমা ও তার এদেশীয় দোসরদেরকে দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত লেখনী ও প্রচারণার মাধ্যমে উক্ত আন্তর্জাতিক চক্র জনগণের মধ্যে ইসলামের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিতে চেয়েছিল। কারণ এতে সমর্থ হ'লেই কেবল তাদের পরিকল্পিত নাটকের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা সম্ভব হবে। আর তখনই তাসলীমার এদেশীয় দোসররা রাতারাতি 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'র মহামিলনের অগ্রদূত হিসাবে ইতিহাসে নায়কের মর্যাদা লাভ করবেন। তবে নাটকের সেই দৃশ্যগুলি এখনো বাকী রয়েছে।

আন্দোলনের ধারা

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ!

বাংলাদেশে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের আন্দোলন চলছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'ইসলামী'। প্রত্যেকটিই দু'ভাগে বিভক্ত। **প্রথমতঃ** ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির একভাগ ব্যক্তি জীবনে আস্তিক বা ধর্মভীরু, কিন্তু বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক বা ধর্মহীন। ব্যক্তি জীবনে ধর্মের অনুসারী হ'লেও তারা বৈষয়িক জীবনে ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। ফলে রাজনীতির নামে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বৈরাচার এবং অর্থনীতির নামে সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী, মওজুদদারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী শোষণ-নির্যাতনকে তারা বৈধ ভেবে নেন, এই কারণে যে এগুলি ধর্মীয় বিষয় নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপার। আর তাই হারাম পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনে নিজ নিষ্পাপ সন্তানের মুখে তুলে দিতেও এদের হাত কাঁপেনা। রাজনীতির নামে ধর্মঘট-অবরোধ-হরতাল করে জনগণের ক্ষতি সাধন করতে, সূদ-ঘুষ ও ব্যভিচারের মত প্রকাশ্য হারামকে হালাল করতে, অন্যদলের লোকের বুকে চাকু বসাতে, রগ কাটতে ও বন্দুকের গুলীতে তার বুক ঝাঝরা করে দিতে এইসব রাজনীতিকদের বিবেকে একটুও বাঁধে না। কারণ এসব ধর্ম নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপার। এইভাগে লোকের সংখ্যাই সর্বত্র বেশী।

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির অন্য ভাগটি ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে 'নাস্তিক' অর্থাৎ উভয় জীবনে তারা ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অনুসারী। যদিও তাদের কেউ কেউ ইসলামী নাম নিয়েই ময়দানে চলাফেরা করেন। এদের

জনৈক নেতা কয়েক বৎসর পূর্বে মারা গেলে একজন মৌলবী ছাহেবকে ডেকে নিয়ে জানাযা দেওয়া হয়েছে বটে। তবে এদের নমস্য পার্শ্ববর্তী ভারতের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেদেশের সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি হেদায়াতুল্লাহ বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে মারা গেলে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃতদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সে দেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, করীম চাগলা এবং বিশিষ্ট নেতা হামীদ দেলওয়াঈকেও একইভাবে পোড়ানো হয়। কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড মুযাফফর আহমদকে লাল কাপড়ে জড়িয়ে জানাযা ছাড়াই পুঁতে ফেলা হয়। সেদেশের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিক আব্দুল্লাহ রাসূল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ূন কবীর-এরও জানাযা হয়নি।[১৭৫] অতএব বাংলাদেশের কম্যুনিষ্টদেরও উপরোক্তদের পদাংক অনুসরণ করা উচিত, যাতে জনসাধারণের কাছে তারা খাঁটি 'নাস্তিক' হিসাবে শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ইসলামী দলগুলি। এরা মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগের দলগুলি তাক্বলীদের অনুসরণে এবং অধিকাংশ জনগণের আচরিত মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন চান। এঁরা বাহ্যিকভাবে বিশেষ একজন সম্মানিত ইমামের তাক্বলীদের দাবীদার হ'লেও বাস্তবে পরবর্তী ফক্বীহদের রচিত বিভিন্ন ফিক্বহ এবং পীর-মাশায়েখ, মুরব্বী ও ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির অনুসারী। কুরআন পরিবর্তনের মত একটি মৌলিক প্রতিবাদের ইস্যুতেও এঁরা এক হয়ে কয়েকটি ঘণ্টার জন্য এক মঞ্চে বসতে পারেননি। গত ২৯শে জুলাই ১৯৯৪ শুক্রবার বাদ জুম'আ একই দিনে একই সময়ে রাজধানীর মানিক মিয়াঁ এভেনিউ ও বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে প্রধানতঃ একই মাযহাবের অনুসারী ইসলামী দলগুলির দু'টি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ইসলামী দলগুলির আপোষ বিভক্তির এই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ইসলাম বৈরী শক্তির নিকটে স্বস্তির বিষয় বৈ কি!

আর এক ভাগে রয়েছেন তাঁরাই যারা তাক্বলীদমুক্তভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা কামনা করেন। যারা ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার তাক্বলীদ হ'তে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চান। এরাই হলেন 'আহলেহাদীছ'। যদিও তাদের অনেকের মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন জাহেলী মতবাদ ঢুকে পড়েছে।

---

১৭৫. খোলা চিঠি ৬১ পৃ.।

পবিত্র কুরআন সংশোধন ও পরিবর্তনের উদ্ভট দাবীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ঈমানী তাকীদেই আমরা বিগত ২৯শে জুলাই ১৯৯৪ শুক্রবার মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' আহূত লংমার্চ শেষে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে নিজস্ব উদ্যোগে সাংগঠনিকভাবে যোগদান করেছিলাম। আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাজধানী ঢাকার বুকে জাতীয় পর্যায়ে সকল ইসলামী দলের মধ্যে নিজেদেরকে **'আহলেহাদীছ'** হিসাবে আত্মপরিচয়ের সাথে সাথে এদেশের অন্যূন দেড়কোটি আহলেহাদীছ জনতার পক্ষ থেকে আমাদের মৌলিক বক্তব্য জাতির সামনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছিলাম। দুর্ভাগ্য, অবাধ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী প্রগতিবাদী বা ইসলামপন্থী কোন জাতীয় পত্রিকাই আমাদের মূল বক্তব্যটুকু তুলে ধরেনি। এমনকি ঐ মহাসমাবেশের প্রধান মুখপত্র বলে পরিচিত জাতীয় দৈনিকটি *(দৈনিক ইনকিলাব)* আমাদের অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদানের খবরটুকুও ছাপেনি। যদিও ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক আখতার ফারূক নিজে বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত থেকে আমাদের প্রতি উচ্ছ্বসিত আবেগ দেখিয়েছিলেন ও অনেক আশ্বাস বাক্য শুনিয়েছিলেন।

ঐ মহাসমাবেশ থেকে ফেরার পথে এদেশের একটি চিহ্নিত ধর্মনিরপেক্ষ দলের একটি জমায়েত থেকে আমাদের কর্মীদের বহনকারী ২৬টি বাস ও ট্রাক বহরের এক অংশের উপরে বোমা ছুঁড়ে মারা হয় এবং আরেকটি চিহ্নিত বামদলের (জাসদ) ঢাকা জিপিও-র সম্মুখস্থ সড়কের বিপরীতে তাদের অফিসের দোতলা থেকে চোরাগুপ্তাভাবে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যাতে আমাদের মোট ছয়জন তরুণ কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হয়। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে ঢাকায় কবরপূজারীদের বিরুদ্ধে মিছিল করতে গিয়ে তাদের নিক্ষিপ্ত ইট-পাথরের আঘাতে সর্বপ্রথম আমাদের দু'জন সাথী ভাইয়ের রক্ত ঝরেছিল। আর এবারে ১৯৯৪-এর জুলাইয়ে কুরআন বিরোধী নাস্তিক-মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করতে গিয়ে আমাদের ৬ জন সাথীর রক্ত ঝরলো। হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনের বিজয়ের স্বার্থে আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আত্মত্যাগ কবুল করে নাও এবং আমাদের সময়, শ্রম ও আর্থিক কুরবানী সমূহকে পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে গ্রহণ কর- আমীন!

আমরা সকল জাতীয় ইস্যু ও সামগ্রিক ইসলামী স্বার্থে সকল ইসলামী দলকে যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ও সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আন্দোলনের লক্ষ্য

বন্ধু ও সাথীগণ!

দেশের ও জাতির উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এক্ষণে আহলেহাদীছদের ভূমিকা কি হবে, তা আমাদেরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। কোন আন্দোলন পরিচালিত হ'তে পারে না, যতক্ষণ না তার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। একটি গাড়ী চালানোও সম্ভব নয় যতক্ষণ না তার গন্তব্য ঠিক না করা হয়। এক্ষণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য কি? একটিমাত্র বাক্যে যা আমরা ঘোষণা করেছি তা এই 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। আরও সংক্ষিপ্তভাবে ঢাকার মহাসমাবেশে মাত্র দু'মিনিট ১০ সেকেণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যা আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জাতির সম্মুখে পেশ করেছি, তা হ'ল- **'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'**।[১৭৬]

অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান কায়েম করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। যে লক্ষ্যে জাতীয় বা বিজাতীয় কোন মতাদর্শের মিকশ্চার থাকবে না। যে লক্ষ্য হবে নির্ভেজাল ও নিষ্পংক। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত যে লক্ষ্য অর্জনের বিনিময়ে আর কিছুই চাওয়ার নেই, কিছুই পাওয়ার নেই। এই লক্ষ্যের পথিকদের জন্য দা'ওয়াত ও জিহাদে ব্যয়িত সময়টুকুর মূল্য দুনিয়ার সকল আনন্দঘন মুহূর্তের চাইতে অতীব মূল্যবান। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল পথে উপার্জিত দু'মুঠো চিড়া-মুড়ি, হারাম পথে উপার্জিত লক্ষ টাকার চেয়েও তার নিকটে অধিক বরকতময়। আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনত করতে গিয়ে নিজ দেহ থেকে ঝরে পড়া দু'ফোঁটা ঘর্ম বা এক ফোঁটা রক্তবিন্দু তার নিকটে দুনিয়ার মহামূল্যবান হীরকখণ্ডের চাইতে অমূল্য। এই মহান লক্ষ্যে আগুয়ান মুজাহিদ দুনিয়াতে সকল লোভনীয় পদ ও বস্তুসম্ভারের চেয়ে পরকালে জান্নাতুল ফেরদৌসের এক কোণে স্থান পাওয়াকে সবচাইতে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করে। তার জীবন, তার মরণ, তার ইবাদত, তার কুরবানী সব কিছুই হয় স্রেফ আল্লাহ্র জন্য, স্রেফ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّهِ رَبِّ

১৭৬. 'ঈমান'-এর উপরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বক্তৃতার সিডির শেষাংশে উক্ত ভাষণটি সংযুক্ত করা হয়েছে। -প্রকাশক।

الْعَالَمِيْنَ– ‘তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য’ *(আন‘আম-মাক্কী ৬/১৬২)*।

আমরা এদেশের আহলেহাদীছ জামা‘আতের সকল ভাইবোনকে ও আপামর মুসলিম জনসাধারণকে উক্ত মহান লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ় কদমে এগিয়ে চলার আন্তরিক আহ্বান জানাই।

লক্ষ্যে উত্তরণের উপায়

বন্ধুগণ!

আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ার পর এক্ষণে তা অর্জনের উপায় হিসাবে প্রথম যে বিষয়টি যরূরী, তা হ’ল সচেতন ও নিবেদিতপ্রাণ একদল নেতা ও কর্মী সৃষ্টি করা। যারা অবশ্যই হবেন শারঈ জ্ঞানে অভিজ্ঞ, সমসাময়িক জ্ঞানে পরিপক্ক ও উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শারঈ বিধানের অনুসরণে তারা লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাবেন। গন্তব্য যত ভাল হৌক, গাড়ীটি যত সুন্দর হৌক, যদি তার চালক যোগ্য ও অভিজ্ঞ না হয় এবং চালকের সাথে কিছু নিবেদিতপ্রাণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহযোগী না থাকে, তাহ’লে যেমন একটি ছোট গাড়ীও চালানো সম্ভব নয়। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই জান্নাতী পরিবহন পরিচালনার জন্য তেমনি অবশ্যই প্রয়োজন জান্নাতী গুণাবলী সম্পন্ন কিছু যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ নেতা ও কর্মীর। এই নেতা ও কর্মীদল নিশ্চয়ই আসমান থেকে নেমে আসবেন না বা যমীন থেকে উদ্গত হবেন না। আপনাদের মধ্য থেকেই তাঁদেরকে বেছে বেছে সামনে আনতে হবে। তারা কখনোই দায়িত্ব নিতে চাইবেন না, কখনই সামনে আসতে চাইবেন না, কখনই কোন কিছুর প্রার্থী বা প্রত্যাশী হবেন না। কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব তাদেরকে বাছাই করে সামনে আনার ও যথাযোগ্য স্থানে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়ার। যেমন বসিয়েছিলেন আবুবকর (রাঃ) ওমর ফারূককে। হাসিমুখে তাঁকে বরণ করেছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম ও সকল মুসলিম জনসাধারণ। আসুন! আমরা দো‘আ করি আল্লাহ্র নিকটে আল্লাহ্র ভাষায়-

وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنكَ نَصِيْراً– ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ’তে একজন নেতা দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ কর’ *(নিসা-মাদানী ৪/৭৫)*। -আমীন!!

কর্মীদের গুণাবলী

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যাকে প্রধানতঃ চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে হবে। খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস, সুন্নাতের পূর্ণ ইত্তেবা, সর্বদা জিহাদী জায্বা ও সর্বোপরি আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়া। উক্ত চারটি গুণ একত্রিত হওয়া ব্যতীত জাতির জন্য কল্যাণকর কিছু অর্জিত হওয়া সম্ভবপর নয়। আখেরাতেও তেমন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন দলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে তাওহীদ আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। ইত্তেবায়ে সুন্নাত আছে তো জিহাদের জায্বা নেই। যিক্র-ফিক্র আছে তো সুন্নাতের অনুসরণ নেই। যদি কোথাও তিনটি গুণ একত্রে পাওয়া যায়, তবে হয়ত দেখা যাবে আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়ার গুণ নেই। শ্রবণ করুন রোম সম্রাটের প্রেরিত আরব খৃষ্টান গুপ্তচরের দেওয়া সেই সারগর্ভ রিপোর্টটি- যে রিপোর্ট তিনি ভূখা-নাঙ্গা মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয় লাভের অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে পেশ করেছিলেন **একটি মাত্র বাক্যে-** وَهُمْ فِى اللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَفِى النَّهَارِ فُرْسَانُ، وَاللهِ لَوْ سَرَقَ فِيْهِمْ اِبْنُ مَلِكِهِمْ لَقَطَعُوْهُ، أَوْ زَنَى لَرَجَمُوْهُ– 'তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার। আল্লাহ্র কসম! যদি তাদের বাদশাহ্র ছেলে চুরি করে, তাহ'লে তারা তার হাত কেটে দেয়। আর যদি যেনা করে, তাহ'লে তারা তার মাথা চূর্ণ করে হত্যা করে ফেলে'।[১৭৭] মুসলমানদের এই নিঃস্বার্থ ও প্রবল ঈমানী শক্তির সম্মুখে সে যুগের উন্নত মারণাস্ত্র সমৃদ্ধ পরাশক্তিগুলো যেমন পরাজয় বরণ করেছিল, পুনরায় সেই আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাতে পারলে এযুগের পরাশক্তিগুলিও হার মানতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। ১২ কোটি জনতার বিপুল সম্ভাবনাময় এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা ইসলামী দেশটিতে একদল আল্লাহ্র বান্দা যখন উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলবেন, তখনই আল্লাহ্র বিশেষ রহমত নেমে আসবে। যেমন নেমে এসেছিল বদরের প্রান্তরে, সিন্ধুর দেবল রণভূমিতে, ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর ১৭ জনের ছোট্ট বাহিনীর উপরে বাংলার সবুজ মাটিতে। এদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে উপরোক্ত গুণসম্পন্ন যোগ্য ও ক্ষুদ্র দলের হাতেই দেশের দায়িত্বভার অর্পণ করবেন। যদি অনুরূপ দলের সংখ্যা

১৭৭. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৭ পৃ.।

একাধিক হয়, তবে অবশ্যই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজশক্তিতে পরিণত হবে। এইভাবে 'ইমারতে শারঈ'-র পথ বেয়ে একদিন বৃহত্তর 'ইমারতে মুল্কী' কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ।

বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য

চিরকাল যোগ্য সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগুরুর উপরে জয়লাভ করেছে ও তাদেরকে পরিচালিত করেছে। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী প্রতিভাবান ও নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দার সংখ্যা চিরকালই কম থাকে। ক্লাসে প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য একটা ছেলেরই হয়ে থাকে। এতে অন্যদের হিংসা করলে চলবে না। ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক সমাজের সংখ্যাগুরু জনগণ নিজেদের স্বার্থেই তাদের মধ্যকার যোগ্য ব্যক্তিকে সবসময় সম্মুখে এগিয়ে দিয়েছে ও তার আনুগত্য করেছে। এটাই জগত সংসারের চিরন্তন নিয়ম। আল্লাহ্র ঘোষণা শুনুন-

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'কতই না সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগুরু দলের উপরে জয়লাভ করেছে, আল্লাহ্র হুকুমে। আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৪৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করুন-

بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ- 'ইসলাম এসেছিল গুটিকতক মানুষের মাধ্যমে। আবার অনুরূপ সংখ্যক মানুষের মধ্যেই তা ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ সেই অল্পসংখ্যক মুমিনের জন্যই'।[১৭৮] এই অল্প সংখ্যক উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ- 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? তিনি

১৭৮. মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ-৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

বললেন, যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যারা সংস্কার করে'।[১৭৯] এক্ষণে অল্পসংখ্যক সংস্কারবাদীদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল কি দাঁড়াবে? এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করুন-

ফলাফল

وَعَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلاَمِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَّ ذُلِّ ذَلِيْلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُونَ لَهَا، قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ-

মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না- সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (জিযিয়া কর দানে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে'। আমি বললাম, তাহ'লে তো দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে' (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম জয়লাভ করবে)।[১৮০]

উক্ত হাদীছে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসারের সাথে সাথে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক বিজয়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যা আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীগুলিতে।-

রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা

একদা মা আয়েশা (রাঃ) সূরায়ে ছফ ৯ আয়াতে[১৮১] বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার ধারণা

---

১৭৯. আহমাদ হা/১৬৭৩৬; ছহীহাহ হা/১২৭৩।

১৮০. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; সনদ ছহীহ, মিশকাত-আলবানী হা/৪২ 'ঈমান' অধ্যায়।

১৮১. *هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-* 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও অংশীবাদীরা এটি অপসন্দ করে' (ছফ-মাদানী ৬১/৯)।

মতে আপনার আগমনের ফলে ইসলামের বিজয় পূর্ণতা লাভ করেছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذَالِكَ مَا شَآءَ اللهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'ভবিষ্যতে এটা বাস্তবায়িত হবে যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করবেন'।[১৮২] তিনি আরও বলেন,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُوْدَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَّأَنْهَارًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আরব উপদ্বীপ চারণভূমি ও নদীনালার দেশে রূপান্তরিত হবে'।[১৮৩] অন্য হাদীছে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের কালানুক্রমিক বর্ণনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে (১) নবুঅত থাকবে যতদিন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করবেন, অতঃপর তা উঠিয়ে নিবেন। (২) এরপরে নবুঅতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হবে। যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ পাক সেটা রেখে দিবেন, অতঃপর উঠিয়ে নিবেন'।[১৮৪] অন্য বর্ণনায় এই খেলাফতের মেয়াদকাল স্পষ্টভাবেই চার খলীফার আমলের ৩০ বছরের কথা উল্লেখিত হয়েছে, যা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে'।[১৮৫] (৩) অতঃপর অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ পাক যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন। (৪) এরপর জবরদখলকারী শাসকদের আমল শুরু হবে। আল্লাহপাক যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। (৫) এরপরে নবুঅতের তরীকায় পুনরায় খেলাফত কায়েম হবে। এ পর্যন্ত বলার পরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন'।[১৮৬]

উপরে বর্ণিত হাদীছের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এখন নামে ও বেনামে অধিকাংশ দেশেই ৪র্থ যুগ অর্থাৎ জবরদখলকারী শাসকদের যামানা চলছে। গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে

১৮২. মুসলিম হা/৭২৯৯ 'ফিতান ও ক্বিয়ামতের আলামত' অধ্যায় ১৭ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৫১৯ 'ফিতান' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

১৮৩. মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪০ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ-২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৮৪. আহমাদ হা/১৮৪৩০ 'সনদ হাসান'; মিশকাত হা/৫৩৭৮ রাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ); ছহীহাহ হা/৫।

১৮৫. আহমাদ হা/২১৯৭৮; তিরমিযী হা/২২২৬; আবুদাঊদ হা/৪৬৪৬; মিশকাত হা/৫৩৯৫ 'ফিতান' অধ্যায়, রাবী সাফীনা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৪৫৯।

১৮৬. আহমাদ হা/১৮৪৩০; মিশকাত হা/৫৩৭৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'ভয় প্রদর্শন ও সাবধান করা' অনুচ্ছেদ-৮ রাবী হোযায়ফা (রাঃ); সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫।

ঘরে ও অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার সবকিছুই এ যুগে দলীয় শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্রদ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। বিশ্বের সর্বত্র যালেমদের জয়জয়কার চলছে, মযলূম মানবতা সর্বত্র কেঁদে ফিরছে।

পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে, পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের দিকে, একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সেই আদর্শ আর কিছুই নয়- সে হ'ল **ইসলাম**। আল-হেরা ও আল-মদীনার ইসলাম, আল-কিতাব ও আল-হাদীছের ইসলাম। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক শাশ্বত ইলাহী জীবনবিধান।

সেই জীবন বিধানের অতন্দ্র প্রহরী ও নির্ভেজাল অনুসারী হওয়ার দাবীদার **হে আহলেহাদীছ জামা'আত!** উঠে এসো, জড়তা ঝেড়ে ফেল, অলসতার চাদর ছুঁড়ে ফেল, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সকল অপবাদ ও ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এগিয়ে চল। তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থ ও ভোগবিলাসের মায়া ছাড়। জান্নাত যে তোমায় ডাকছে বারবার হাতছানি দিয়ে, একবার তাকিয়ে দেখ। ঐ শোন তোমার পালনকর্তার স্নেহমাখা অমিয় বাণী-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ- وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ-

'হে চাদরাবৃত! (১) ওঠ! সতর্ক কর, (২) আর তোমার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, (৩) তোমার পোশাক পবিত্র কর (৪) নাপাকী বর্জন কর। (৫) অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে দান করো না। (৬) আর তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ছবর কর' *(মুদ্দাছছির-মাক্কী ৭৪/১-৭)*।

অতএব, হে মুসলিম সমাজ! আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে, আর কতকাল কুটতর্কে সময় কাটাবে। তোমার ঘর-বাহির সব যে বিজাতীয়দের দখলে চলে গেল। তোমার তরুণদের মুখে বিজাতীয় শ্লোগান, তোমার নারীদের সর্বাঙ্গে ও তোমার গৃহের চার দেওয়ালে নগ্নতার হিংস্র ছোবল, তোমার খাদ্যের প্লেটে হারামের ক্রিমিকীট কিলবিল করছে। কোথায় তোমার সেই জিহাদী জাযবা, কোথায় সেই বালাকোট আর নারিকেলবাড়িয়ার তাকবীরের হুংকার, কোথায় বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তোমার তীব্র ঘৃণাবোধ যা আপোষহীন যুদ্ধ ঘোষণা করবে সূদ-ঘূষ-জুয়া-লটারীর হারামী অর্থনীতির বিরুদ্ধে, অহি-র বিধান

বিরোধী যাবতীয় অপতৎপরতার বিরুদ্ধে। তওবা কর, পাপ-পংকিলতা ঝেড়ে ফেল। নবুঅতের তরীকায় খেলাফত কায়েমের চূড়ান্ত লক্ষ্যে জান-মাল বাজি রেখে সম্মুখ পানে এগিয়ে চল।

আসুন! আমরা সমাজ সংস্কারে ব্রতী হই! সাথে সাথে স্ব স্ব চরিত্র সংস্কারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। খেয়ানতকারী ও ফাসেকী চরিত্রের নেতৃত্বে জান্নাতী কাফেলার অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। সমাজে সর্বস্তরের মানুষ আল্লাহভীরু সৎ নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র নিকটে দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিক প্রিয়।[১৮৭] নির্দিষ্ট ইসলামী লক্ষ্যে নির্দিষ্ট 'ইমারতের' অধীনে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী একদল মুমিনকে একটি জামা'আত' বলা হয়। যার উপরে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১৮৮]

তাই আসুন! আমরা আমাদের বিছিন্ন প্রতিভাগুলিকে, বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে একত্রিত করে অধিকতর শক্তিশালী জনশক্তিতে পরিণত হই। সর্বত্র 'শক্তিশালী ও আমানতদার' (الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) নেতৃত্ব[১৮৯] কায়েম করি। কেননা শক্তিশালী নেতৃত্ব যদি খেয়ানতকারী হয়, তাহ'লে সে সবকিছু খেয়ে হযম করে ফেলবে। পক্ষান্তরে আমানতদার নেতৃত্ব যদি দুর্বল হয়, তাহ'লে তার সাথীরাই তাকে ভক্ষণ করবে।

উদাত্ত আহ্বান

পরিশেষে আমরা আমাদের সম্মানিত আলেম সমাজ, সম্ভাবনাময় তরুণ ও যুব সমাজ, মণি-কাঞ্চনের উৎস সম্মানিতা মা-বোনদেরকে উপরে বর্ণিত সার্বিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে অন্যদের সাথে মিশে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা পরিত্যাগ করে নিজস্ব আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

---

১৮৭. মুসলিম হা/২৬৬৪, মিশকাত হা/৫২৯৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র উপরে ভরসা ও ধৈর্য' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৮৮. তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৫।

১৮৯. নমল-মাক্কী ২৭/৩৯, ক্বাছাছ-মাক্কী ২৮/২৬।

فَبَشِّرْ عِبَادِ- الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ-

'অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে-; যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে উত্তমটির অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার-মাক্কী ৩৯/১৭-১৮)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

প্রশ্নমালা

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদর্শিক প্রেরণা কী ছিল?

২. বাংলাদেশে বর্তমানে কয় ধরনের আন্দোলন চলছে?

৩. আহলেহাদীছদের আন্দোলনের লক্ষ্য কী? লক্ষ্যে উত্তরণের উপায় কী?

৪. আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রত্যেক সদস্যকে কয়টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে হবে?

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য কী?

৬. আন্দোলনের কর্মীদের গুণাবলী কয়টি ও কি কি?

৭. রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা কয়টি ও কি কি?

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

সংগঠন :

ক্র.	নাম	যোগাযোগ
১.	আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ www.ahlehadeethbd.org	০১৭৯৭-৯০০১২৩
২.	বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ www.juboshongho.org	০১৭২১-৯১১২২৩
৩.	সোনামণি (শিশু-কিশোর সংগঠন)	০১৭১৫-৭১৫১৪৩
৪.	আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম www.ahpforum.org	০১৩২৭-২৭০৪৫৪
৫.	আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি	
৬.	আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি	
৭.	আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা	০১৯১৬-১২৫৫৮৩

প্রতিষ্ঠান :

১.	প্রকাশনা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ www.hadeethfoundationbd.com	০১৭৭০-৮০০৯০০
২.	গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
৩.	দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
৪.	হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড www.hfeb.net	০১৭৩০-৭৫২০৫০
৫.	হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস	০১৮৩৫-৪২৩৪১১

সমাজকল্যাণ সংস্থা :

১.	ইসলামিক কমপ্লেক্স (মসজিদ ও মাদ্রাসা বিভাগ) islamiccomplexbd@gmail.com	০১৭৯৭-৫০৫১৮২
২.	পথের আলো ফাউণ্ডেশন (ইয়াতীম ও দুস্থ বিভাগ)	০১৭৪০-৮৭৭৪২৯
৩.	আল-'আওন (স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান সংস্থা)	০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩
৪.	তাওহীদ ট্রাস্ট	
৫.	সালাফিইয়াহ ট্রাস্ট	

পত্রিকা :

১.	মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com	০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
২.	তাওহীদের ডাক (দ্বি-মাসিক) www.tawheederdak.com	০১৭৬৬-২০১৩৫৩
৩.	সোনামণি প্রতিভা (দ্বি-মাসিক) www.ahlehadeethbd.org/protiva	০১৭০৯-৭৯৬৪২৪